প্রকাশক :
দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক :
নিশিকান্ত হাটই
তুষার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২৬, বিধান সরণি
কলিকাতা-৬

শ্রাবণ ১৩৬৭, জুলাই ১৯৬০

উৎসর্গ

স্বদেশের প্রতি একান্ত মমতা যাঁকে অভিমানভরে

ত্রিশবৎসরাধিক কাল প্রবাসী করে রেখেছে,

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যিনি কিছুকাল বাংলার

অধ্যাপক ছিলেন,

সাহিত্যবিষয়ে যাঁর গবেষণা বিদেশে বিদ্বজ্জনের প্রকৃত সমাদর পেয়েছে,

সেই ঋজুচিত্ত, স্নেহশীল, জ্ঞানব্রতী

জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ-এর

করকমলে

ভূমিকা

বেশ কিছু কাল আগে "চক্ষুষা কাণঃ" নামে আমার যে প্রবন্ধ-সংকলন প্রকাশ হয়েছিল, তা বহুদিন দুষ্প্রাপ্য বলে পুনর্মুদ্রণের কথা কেউ কেউ ভেবেছিলেন। প্রবন্ধগুলোর অধিকাংশ বিভিন্ন সাময়িকী থেকে সংগৃহীত বলে হয়তো বর্তমানে অচল মনে করে সংকোচ বোধ করলেও আমার প্রাক্তন ছাত্র ডঃ অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আগ্রহাতিশয্যে বইটি আবার বার করাতে রাজি হয়েছি। নতুন করে ছাপাবার অজুহাতকে মজবুত করার জন্য অন্য কয়েকটি লেখাও খুঁজে পেতে অনিলবাবু জুড়ে দিয়েছেন। প্রতিটি রচনার তারিখও দেখানো হয়েছে, যাতে কালানুক্রমিকতা শুধু নয়, সমসাময়িক পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্তিরও একটা সামঞ্জস্য থাকে। ভূমিকা লিখছি সন্তর্পণে, কারণ নিজে এই প্রকাশনের তত্ত্বাবধান করতে পারি নি, সে-ভার অনিলবাবুই নিজগুণে তুলে নিয়েছিলেন। বস্তুত এ-বই প্রকাশিত হচ্ছে অনিলবাবুরই তাগিদে—যদিও অবশ্য রচনার গুণাগুণের জন্য পাঠকদের কাছে দায়িত্ব এককভাবে আমার।

সংকলনের নামকরণ হল 'স্বদেশজিজ্ঞাসা'। একটু কটোমটো হয়তো শোনাবে, কিন্তু ক্ষতি কি? বাক্যটি বন্ধুবর কবি বিষ্ণু দে-র খুবই প্রিয়, বলতে পারি আমারও—অনেকদিন আগে আলোচনাব্যপদেশে বোধহয় এর পুলকিত উদ্ভব ঘটেছিল। আর আজও একে মনে হয় ঘন অথচ স্বচ্ছ, অর্থবহ একটি শব্দ। স্বদেশ, স্ব-ভূমিকে জানবার ইচ্ছা ('জ্ঞাতুম্ ইচ্ছা—জিজ্ঞাসা') এবং প্রয়াস বিনা সমাজ ও সংসারের গতিবিধি আয়ত্তে আসবে কেমন করে? আর সেই জ্ঞান বিনা সার্থক কর্মেরও সন্ধান মিলবে কি ভাবে?

মানুষ যখন ঋষিনেত্রের অধিকারী তখন তার কাছে 'স্বদেশোভুবনত্রয়ম্', ত্রিভুবনের সর্বত্র তার দেশ। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা দিবসে রবীন্দ্রনাথ বেদবাক্য উদ্ধৃতি দিয়ে সর্বজনকে আহ্বান করেছিলেন—'যত্র বিশ্বম্ ভবত্যেকনীড়ম্', যেখানে জগৎ যেন পাখির বাসার মতো জমাটভাবে এক, তেমনি এক ক্ষেত্র গড়তে চেয়েছিলেন। একদেশদর্শিতা দোষ আর যার বেলায় দেখা যাক্ বা না যাক্, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কেউ তা কল্পনাতেও আনতে পারে না। বিদেশকে বিদেশ বলেই হেয় মনে করার মতো ক্ষুদ্রতা কখনও তাঁকে স্পর্শ করেনি। বহুদিন আগে তাই শোনা গিয়েছিল তাঁর কণ্ঠে: "গাছের গোড়ায় বিদেশী সার দিলেই গাছ বিদেশী হয় না। যে মাটি তার স্বদেশী, তার মূলগত প্রাধান্য

থাকলে ভাবনা নেই।" রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেই আমাদের শিক্ষা যে নিজের প্রতিষ্ঠাভূমিতে দাঁড়িয়ে বাইরের সামগ্রী আহরণ করলেই তাকে নিজস্ব করার সম্ভাবনা থাকে, আর যে মাটির সঙ্গে নাড়ির সম্পর্ক তাকে অস্বীকার করলে দুনিয়ার সঙ্গে প্রকৃত মিতালি ঘটতে পারে না। যাদের চিত্তবিলাস হল 'বিশ্ব-বিরাজ' (Cosmopolitanism), প্রকৃত প্রস্তাবে যাদের বিশ্ববীক্ষা (Weltams chauung-world view) নেই, তারাই একথা বুঝতে অনিচ্ছুক বা অপারগ। রবীন্দ্রনাথেরই মধুর গভীর গানে সবাই শুনেছি যে 'পথবাসী' আর 'গৃহহারা' তো 'গতিহীন' না হয়ে পারে না।

বারবার রবীন্দ্রাথের কথা না বলে পারছি না। বহু বৎসর পূর্বে তিনি আক্ষেপ করেছিলেন যে আমাদের দেশে শিক্ষার উদ্ভট গুণে প্রয়াগের বাসিন্দা শিশুর চোখে "নদী বলতে টেম্‌স্ আর রাইন-এর কথা ভেসে উঠল, পাশ দিয়ে যে বয়ে যাচ্ছে গঙ্গা-যমুনার স্রোত তা বিস্মৃত হল।"

তখন তিনি বলেছিলেনযে"বিদেশী ভাষা ও চিন্তার বাহনে যে শিক্ষা তা যতই চাকচিক্যপূর্ণ হোক্ না কেন, প্রকৃত ব্যক্তিত্ব তাতে ক্ষুণ্ণ হয়—যে মাটির নীচে গভীর খাতে বয়ে যায় জীবনের জল, সেই শক্ত মাটির উপর পা রেখে দাঁড়ানো সম্ভব হয় না।" এখনও এই দুরবস্থা চলেছে—তাই খ্যাতনামা ব্যঙ্গচিত্রকর (কেরালা নিবাসী) আবু সম্প্রতি লিখলেন যে তাঁর পাঁচ বছরের মেয়ে শিশু-শিক্ষালয়ে গিয়ে খান দুয়েক হিন্দুস্থানী গান শিখেছে কিনা সন্দেহ, অথচ সব সময় গাইছে, 'Ring-a-ring-a-roses', আর 'London Bridge is falling down'—আর কচি বয়সথেকে মগজ-ধোলাই আরম্ভ হচ্ছে—'A for Apple' দিয়ে। দিল্লীতে না হয় নানা কারণে গজিয়ে উঠেছে এক ধরনের কায়দা, কিন্তু 'আ মরি বাংলা ভাষা, মোদের গরব মোদের আশা', সেই বাঙ্গালীর (পশ্চিম বাংলায়) 'শিক্ষিত' 'বিদগ্ধ' 'অভিজাত' ইত্যাদি অভিহিত এলাকায় ছোট ছেলেমেয়ে 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর, নদেয় এলো বাণ' না শিখে কণ্ঠস্থ করছে, 'Mary had a little lamb'-জাতীয় ছড়া! 'জল পড়ে, পাতা নড়ে' শব্দগুলো রবীন্দ্রনাথের শিশুমনে যে শিহরণ এনেছিল, আজকের ভাগ্যবান পরিবারের বাঙ্গালী শিশু তা জানবেও না। 'একে চন্দ্র, দুইয়ে পক্ষ, তিনে নেত্র, চারে বেদ' ইত্যাদি জানবে না—কোন এক বিজাতীয় পদ্ধতিতে গণিতের সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটবে—বিষয়টি হয়ত শিখবে ভালই, কিন্তু বাঙ্গালী সত্তার সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত থাকবে। শুভঙ্করীকে ভয়ঙ্করী সাব্যস্ত করে হয়ত গুরুজন আশ্বস্ত, কিন্তু ঘটনাটি কি শুভ? শিশু ক্রমে বড়ো হবে, ইংরেজি-'মিডিয়াম' স্কুলে পড়বে, রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী হয়তো খুব দূর থেকে আবছাভাবে

ছাড়া জানবে না, পুরাণের উপাখ্যান তো একেবারে বাতিল। 'খনার বচন' আর 'চাণক্য শ্লোক' কাকে বলে তা অজানা থাকবে, বাজলা ছড়া যে কি বস্তু তা বুঝবে না, 'মুশকিল আশান করে পীর গোরাচাঁদ' ধরনের কথা মনে দাগ কাটবে না। কি অসম্ভব দুর্দৈর ঠেকাবার জন্য আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মত মুক্তমতি মহদাশয় মানুষকে 'বাংলা ভাষা প্রচলন সমিতি' স্থাপন করতে হয়েছিল! হয়ত দেশের ভাবগতিক দেখে সমিতিও ঝাঁপ বন্ধ করে নিশ্চিন্ত হয়েছে!

কয়েক বছর আগে যে মহানুভব বাঙ্গালীর তিরোধান ঘটেছে, 'মহারাজ' বলে বন্দিত সেই বিপ্লবী নায়ক ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী "জেলে ত্রিশ বছর ও পাক-ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম" গ্রন্থের প্রথম ছত্রে লিখে গেছেন: "আমার জীবন সফল হয় নাই।……যে উদ্দেশ্য লইয়া জীবন প্রভাতে ঘরের বাহির হইয়াছিলাম, সেই উদ্দেশ্য সার্থক ও সফল হয় নাই।" 'মহারাজ' আমাদের রাজনীতি-জীবনের বিতর্কের ঊর্ধ্বে অবস্থিত এবং প্রশ্নাতীত যে বিরল সংখ্যক মহাভাগ কয়েকজন আছেন তাঁদেরই অন্যতম। কম দুঃখে তিনি বলেন নি: "আমার স্বপ্ন সফল হয় নাই—আমি সফলকাম বিপ্লবী নই।"

ইতিহাসের পথে অবশ্য আছে অনেক আঁকবাঁক, অনেক বাধা, অনেক অন্ধকারের ধাক্কা, অনেক দৌরাত্ম্যের মোকাবিলা। স্বপ্ন যে সফল হবে-ই, পুরো সান্ত্বনা যে মিলতেই হবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা ইতিহাসের কারও কাছে নেই। তবে আমাদের কালে যারা ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছি তাদের অসাফল্য যে অবশ্যম্ভাবী ছিল এমন কথা বলা কঠিন। বহু প্রত্যবায় আমাদের ঘটেছে, ভবিষ্যৎবংশীয়দের কাছে উত্তর-দায়িত্ব আমাদের কম নয়। তবে বার্নার্ড শ'-র কথা ধার করে বলা না হয় গেল যে নতুন যুগের সবাইকে বেকার রাখবো না, সব সমস্যা যদি আমরাই সমাধান করে ফেলি তো তারা করবে কি? তামাশা থাক্—কিন্তু এ-কথা তো ঠিক যে 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থা' দিয়ে যুগযুগান্তের যাত্রা চলেছে মানুষের, ভারতবর্ষে বর্তমান যুগে তার ব্যতিক্রম অতিরিক্তভাবে ঘটেছে—না-হয় না-ই ভাবা গেল।

রামায়ণে রয়েছে অবিস্মরণীয় শ্লোক যাতে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলছেন যে লঙ্কা স্বর্ণময়ী হলেও তাঁর অভিরুচি নেই, কারণ "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন প্রত্যাদেশ হল: "উত্থাতব্যং জাগৃতব্যং যোক্তব্যং ভূতিকর্মসু"—ওঠো, জাগো, সর্বজনের হিতসাধনে যোগ দাও। ভারতবর্ষের সনাতন প্রার্থনা হল "সর্বে জনাঃ সুখিনো ভবন্তু"—সর্বজন সুখী হোক্। মানুষকে ভাগ্যের পুতুল বলে ভারতবর্ষ মনে করে নি—"নক্ষত্র

বিদ্যা" প্রাচীন সূত্র গ্রন্থে, বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রে, কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে নিন্দিত হয়েছে : যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন যে একচক্রে যেমন রথ চলে না, তেমনই ঘটনাকে টানতে পারে না দৈব, সর্বদা রয়েছে পুরুষকারের ভূমিকা। "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা", একথাই সার নয়, সঙ্গে সঙ্গে ভারতমানসে নিহিত রয়েছে রামায়ণের নির্দেশ : "কর্মভূমিমিমাম্ প্রাপ্য কর্তব্যং কর্ম যৎ শুভং"—এই কর্মভূমি পেয়েছে মানুষ, শুভ কর্ম তার কর্তব্য। চার্বাকের সূত্রে, বৌদ্ধ দোহায়, "বৈদিক ও অবৈদিক ধারায় যুক্ত বেণীতে", ভারতে "হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনায়," অগণিত সাধুসন্তের জীবনে, মহাত্মা কবির-এর 'ভারতপন্থ' প্রভৃতি প্রয়াসে, আর বহু সহস্রাব্দব্যাপী ভারতকাহিনীর অপরাজেয় সত্তার মধ্যে যে-সত্য কখনও অস্পষ্ট আবার কখনও সুদীপ্ত হয়েছে, তারই নমুনা চণ্ডীদাসের পংক্তিতে—"সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।" গত মহাযুদ্ধে প্রাণ দেওয়ার আগে তরুণ ইংরেজ কবি অ্যালন্ লুইস্ দেখেছিলেন : "বিশ্বজনীন যে ক্ষেত্র এদেশে ছড়িয়ে রয়েছে, সেখানে তো অহংকারকে লুপ্ত না করে উপায় নেই।" সকল অহংকার ও ভেদবুদ্ধি স্থাপন করে রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের মর্মকেন্দ্রে অবস্থিত নরদেবতাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন; বিশ্বদেবতার তিনি প্রথম দর্শন পেয়েছিলেন "মোর সনাতন স্বদেশে"; প্রতিভা ও সাধনা বলে আর্ষ উপলব্ধি তাঁর ঘটেছিল : "স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্"। যা হল "সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ", সেই সত্যসন্ধানে প্রবৃত্ত হতে হলে চাই আমাদের স্বদেশ-জিজ্ঞাসা। এই বস্তু হবে সকল যোজনার ভিত্তিভূমি, সকল সংকল্পের প্রেরণা।

'চক্ষুষা কাণঃ' যাঁকে উৎসর্গ করেছিলাম, তিনি আর নেই। সম্পূর্ণ একক এবং অবহেলিত অবস্থায় প্রবাসে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। বলা যেতে পারে প্রায় ইচ্ছামৃত্যু—দেশ-মায়ের ওপর অভিমান করে যেন দেশের বাইরে জীবনাবসানই ছিল তাঁর কাম্য। উৎসর্গ যে ভাষাতে করেছিলাম, তার কোন অদলবদল করলাম না। আত্মার অবিনশ্বরত্বে বিশ্বাস করি না—সুতরাং জানি এতে তাঁর কোনো সান্ত্বনা নেই। তবে আমার মতো ব্যক্তি হয়তো এ থেকে একটু সান্ত্বনা পাব।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

॥ সূচী ॥

॥ অনুবাদ ॥

চক্ষুষা কাণঃ

"চোখ" কথাটার প্রতিশব্দ আমাদের ভাষায় কতগুলো আছে তা জোর করে বলার সাহস নেই, কিন্তু চোখ চেয়ে দেখার অভ্যাস আমরা বোধ হয় গত কয়েক'শ বছর ধরে হারিয়ে আসছি। অকারণে নিজের দেশের নিন্দা করতে চাই না, কিন্তু যখন অন্ধ বাউলের অন্তর্দৃষ্টির কথা শুনি, যখন প্রেমের কবিতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার বাহুল্যে পীড়িত হই, তখন মনে হয়, জবাকুসুমসঙ্কাশ মহাদ্যুতি দিবাকরকে উন্মীলিত চক্ষে প্রণাম করে নিত্যকর্ম সম্পাদনের পদ্ধতি যে দেশে যুগ যুগ ধরে প্রবর্তিত থেকেছে, সে দেশের এ দুর্দশা হল কেমন করে?

কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত জনপ্রিয় এক নাটকের অন্তর্ভূত বহু-আবৃত্তি-বিড়ম্বিত কয়েকটি পঙ্‌ক্তির কথা মনে পড়ছে। "কী বিচিত্র এই দেশ" বলে সেকেন্দর শাহের ভূমিকায় নটযশঃপ্রার্থীদের বহুবিধ ভঙ্গিমা হয়তো অনেকের স্মরণে আসবে। কিন্তু প্রকৃতই আমাদের এই সুবিস্তৃত মাতৃভূমির অনন্তপার বৈচিত্র্য ও মনোহারিত্ব যেন আমাদের কাছে অকিঞ্চিৎকর। শিক্ষিত মনের মধ্যে কী অনপনেয় সংকীর্ণতা যে প্রবেশ করে রয়েছে তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

সম্প্রতি এদেশের বহু সজ্জন বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করে আসার সুযোগ পেয়েছেন। গত দু'বছরের মধ্যে মস্কো থেকে পিকিং আর পূর্ব ইউরোপের অর্ধপরিচিত অঞ্চলের নবরূপ পর্যবেক্ষণ করার অবকাশ নিতান্ত স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তির হয় নি। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন চক্ষুষ্মান যে ছিলেন না তা বলব না—বলা অন্যায় হবে। কিন্তু হয়তো একথা বললে অপরাধ হবে না যে অধিকাংশের পক্ষে মস্কো বা পিকিং যাওয়া কিম্বা মানিলা ও লিস্‌বন্‌ যাওয়ার মধ্যে কোন বিশেষ প্রভেদ লক্ষ্য করা যায় নি। যে দেশে মানুষ অযুতবর্ষব্যাপী দাসত্বের নিগড়কে চূর্ণ করে নূতন জীবনের সন্ধান পেয়ে বিচিত্রবীর্যরূপে দেখা দিয়েছে,

সেখানকার বৃত্তান্তের মধ্যে ভোজনপ্রাচুর্য ও আতিথেয়তার পরাকাষ্ঠা বিনা অন্য বিবরণ যেন একান্ত দুর্লভ হয়ে পড়েছে।

ইয়োরোপে, বিশেষত ইংলণ্ডে, ভারতবাসীর সংখ্যা নগণ্য নয়। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছাত্র, হৃদয়-মনের সংবেদনশীলতা যে বয়সে প্রখর, সে বয়সে তাঁরা ইয়োরোপে থেকেছেন। তবুও মুক্ত জীবনের ব্যাপ্তি ও মাধুর্যের যে আস্বাদ আধুনিক যুগের সর্বাগ্রগণ্য মহাদেশে সহজলভ্য, তা থেকে আমরা যেন বঞ্চিত থেকেছি। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যকে যেমন আমরা জেনেও জানি না, ইয়োরোপের সঙ্গে আমাদের পরিচয় যেন তেমনই অস্পষ্ট ও অসার্থক থেকে গিয়েছে। তাই ইয়োরোপ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের রচনায় পর্যন্ত ফাঁক এবং ফাঁকি লক্ষ্য করে লজ্জিত হতে হয়। এ যে কী অসহনীয় বিড়ম্বনা, তা কথায় বোঝানো অসম্ভব।

যে দেশে একদা চৌষট্টি কলার প্রচলন ছিল, যে দেশে পর্বত-গাত্রকে মানুষ বস্তুনিষ্ঠ শিল্পদক্ষতায় রূপায়িত করেছে, যে দেশে বিশ্বকর্মা শ্রমিকের আদর্শ ও উপাস্য হয়ে এসেছে, সে দেশে কেমন করে এ দুর্গতি ঘটল তা আজ অনুশীলনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমরা গাছের নাম জানি না, ফুলের নাম জানি না, পাখীর নাম জানি না; না জানার দুঃখও আমরা বড় একটা রাখি না। এ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ পরিতাপ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু তবুও শান্তিনিকেতনের পশুপক্ষী সম্বন্ধেও কেউ পড়বার মতো কিছু লিখেছেন বলে জানি না, যে কাঠবিড়ালীগুলো দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত থেকে খাবার নিয়ে যেত, তাদের জীবন-যাত্রা পর্যন্ত কেউ পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করেছেন কিনা জানি না।

মানুষেরই খোঁজ আমরা রাখি না, তখন আর "অন্যে পরে কা কথা।" প্রধানমন্ত্রী মশায়ের কাছে শুনি আসামের আদিবাসী অঞ্চলে কাজ করতে পারে এবং চায় এমন কর্মচারীর সন্ধান পাওয়া শক্ত, সেখানকার ভাষা আর জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আমাদের যেন অপার ঔদাসীন্য। ভারতের ভাষাগত বৃত্তান্ত সংকলন করে বিদেশী, অবশ্য আমাদের অনিচ্ছুক সাহায্য নিয়ে—কিন্তু আমাদের যেন সে বিষয়ে

আগ্রহ নেই। "জ্ঞাতুম্ ইচ্ছা"—জিজ্ঞাসা—যেন আমাদের মন থেকে মুছে গিয়েছে, স্বদেশবাসী সম্বন্ধে কৌতূহলও তাই আমাদের অত্যন্ত স্বল্প।

এই কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা থাকলেই আজ আমরা দেশকে জানতে পারতাম। আর দেশকে না জানলে যে বদলাতে পারা যায় না, মার্কসবাদের এই চূড়ান্ত শিক্ষাকে আয়ত্ত করে কর্মের পথে অগ্রসর হতে পারতাম। কিন্তু আমরা দেশকে জানি না, জানি না বলে বিশেষ যে দুঃখিত তাও নই, বাক্‌চাতুরীর উপরই তাই আমরা এখনও প্রধানত নির্ভর করে থাকছি। ফলাফল যে মর্মান্তিক হতে পারে, এই সহজ বোধও যেন আমাদের নেই।

পশ্চিম বাংলার যিনি বর্তমান রাজ্যপাল, তাঁর কাছে বহুদিন পূর্বে শুনেছিলাম নির্মম দারিদ্র্যের কথা। তিনি বলেছিলেন যে অন্ধ্রদেশের কোন কোন অঞ্চলে কিছুকাল বহুজনকে আহারের জন্যে ফসল-কেটে-নিয়ে-যাওয়া ক্ষেতে ইঁদুরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে মাটি খুঁটে গলাধঃকরণ করার মত কিছু শস্যকণা সংগ্রহের উপর নির্ভর করতে হয়। রয়ালসিমা প্রভৃতি অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দারিদ্র্যের চিরসাথী হয়ে রয়েছে। সেখানকার এবং তুলনীয় বহু অঞ্চলের অধিবাসীদের দৈনন্দিন জীবন-বৃত্তান্ত কোথায় পাওয়া যায় জানি না।

সেদিন একজন বন্ধুর কাছে শুনছিলাম হিমাচল প্রদেশের ক্ষুদ্র, নিভৃত নগর চম্বার কথা। পরিপূর্ণ বিশ্রামের যদি প্রয়োজন হয় তো যাওয়া যায় চম্বায়। সেখানে আছে ছোট্ট নদী, আছে ঝরনার ছড়াছড়ি, আছে পাহাড়, আছে দূরাবস্থিত তুষারশৃঙ্গের হাতছানি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আছে অবর্ণনীয় দারিদ্র্য, যার নিত্য গ্লানি নারীর অপরূপ দেহসৌন্দর্যকেও ম্লান করে রেখেছে। সেখানে আছে সমাজ ও অর্থনীতিতে নিয়তির মত কঠোর শোষণব্যবস্থা, আর আছে শৈলখণ্ডপিষ্ট দুর্বাদলের মত লোক-সংস্কৃতির মৃত্যুঞ্জয় প্রকাশ। চম্বায় কিন্তু আমরা যাই না, আর গেলে শুধু চাই নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম, কিন্তু সেখানে যায় মার্কিন পর্যবেক্ষকের দল, ক্যামেরা কাঁধে ফেলে সারা এলাকার ছবি তারা তুলে নিয়ে যায় নিজেদের স্বার্থে, আর নিজেদের স্বার্থেই স্থানীয় লোকদের সঙ্গে বন্ধুতা পাতাতে চেষ্টা করে।

অন্ধ্রপ্রদেশ গঠন সম্বন্ধে আইন হয়েছে, অনতিবিলম্বে সেখানে স্বতন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠার কথা। অন্ধ্রপ্রদেশের সীমানির্ধারণ নিয়ে বহু প্রশ্ন উঠেছে, যার দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় বেলারী শহরের সমস্যা। তেলেগুভাষী অন্ধ্র এবং কন্নাড়ভাষী কর্নাটকী এই শহরের উপর দখল দাবী করেছে। কিন্তু দেখা গেল যে বেলারী শহরে আছে তিনটি সম্প্রদায়—তেলেগুভাষী অন্ধ্র, কন্নাড়ভাষী কর্নাটকী এবং হিন্দুস্তানীভাষী মুসলমান, আর এই তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে শেষোক্তই হল সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই মুসলমানদের মধ্যে কেউ কেউ তেলেগু জানে, কেউ কেউ কন্নাড় ভাষা জানে; তারা সবাই দো-ভাষী, কিন্তু তাদের মাতৃভাষা তেলেগু নয়, কন্নাড় নয়, তাদের মাতৃভাষা ফারসী হরফে লেখা হিন্দুস্তানী। প্রশ্ন করতে ইচ্ছা যায় এরা কারা, কবে এরা বেলারী ও নিকটবর্তী অঞ্চলে বসবাস শুরু করেছে। আর মুসলমান বলেই কি এরা উর্দুভাষী, না অন্য কোন ব্যাখ্যা আছে? প্রশ্নের অন্ত নেই, কিন্তু কোন চিন্তার প্রয়োজন নেই, কারণ প্রশ্নই কেউ বড় একটা এ সব ব্যাপারে করছে না, "জ্ঞাতুম্ ইচ্ছা" প্রায় কারও নেই।

কেন এমন ঘটবে? দক্ষিণ ভারতের মুসলমান অধিবাসীদের পূর্বপুরুষ কি সকলেই উত্তর ভারত থেকে গিয়েছিল? অন্ধ্রদেশের মুসলমান শিশু মায়ের কোলে শুয়ে কোন্ ভাষা শেখে—তেলেগু না উর্দু না কী? যদি উর্দুতেই তার প্রথম বাক্স্ফোটনা ঘটে, তো অন্ধ্রের জাতীয় গণ্ডী থেকে সে কি বহির্ভূত? কে এ ধরনের প্রশ্ন করে অকারণ নিজেকে ব্যতিব্যস্ত করবে?

স্টালিন একবার বলেছিলেন যে ভারতবর্ষ প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীন হলে দেখা যাবে যে কয়েকশত ভাষাভাষী তখন স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হতে চাইবে। এ কথার তাৎপর্য কি আমরা খোঁজ করে বোঝার চেষ্টা করেছি? ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের জন্য আন্দোলন করছি বলেই আমাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় কি?

নূতন চীন তার প্রাচীন সভ্যতার বহু অনাবিষ্কৃত নিদর্শন সাম্প্রতিক প্রযত্নের ফলে খুঁজে পেয়েছে। আমরা জগন্নাথ মন্দিরে যাই জাগ্রত বিগ্রহকে তুষ্ট করে নিজের সদ্গতিকে নিশ্চিত করার চেষ্টায়, কিন্তু

কিঞ্চিৎ মস্তিষ্ক বিকৃতি না থাকলে আমাদের খুব কম লোকই কোনারকের পরিত্যক্ত সূর্যমন্দিরের মহিমায় দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছে। চন্দ্রভাগা নদীর সাগরসঙ্গম যেখানে ঘটছে, তার কাছে কালাতিপাতের কল্পনাও আমরা করি না। পক্ষিতীর্থে পুণ্যার্থী সংখ্যার শেষ নেই, কিন্তু মহাবলিপুরমে যায় অতি স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তি আর তাদের মধ্যে বিদেশীর অনুপাত কম নয়। আমরা হিমালয় লঙ্ঘনের জন্য ব্যাকুল নই, তিস্তার বহুবর্ণ তটভূমির সন্ধানে যাই না, সমুদ্রের আহ্বান আমাদের কানে প্রবেশ করে না, অন্তর্দৃষ্টির অহিফেন আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রামকে মুদিত করে রেখেছে।

সেদিন পূর্ববাংলার একজন বিশিষ্ট ও বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে কথা হল। শুনলাম তাঁর জন্মস্থান আজ ভিন্ন রাষ্ট্রের অন্তর্গত বলে যাতায়াত পর্যন্ত বন্ধ। জানতে চাইলাম এ বঞ্চনার বেদনা কত গভীর, কত দুঃসহ। তিনি হেসে জবাব দিলেন যে বহুকাল কলকাতায় কাটিয়ে দেশের মায়াকেও প্রায় কাটিয়ে উঠেছেন। অবাক হয়ে গেলাম, মনে পড়ল নিতম্বমাধুর্যের মতো চন্দ্রালোকিত পদ্মাতরঙ্গের অবিস্মরণীয়তা, মনে পড়ল (আমার "In city pent" মনে) দিগন্তবিস্তৃত জলরাশির স্নিগ্ধ শোভা, যার কোন মূল্যই যেন এই প্রখ্যাত পূর্ববঙ্গবাসী আজ পাকিস্তান-বিরোধিতার বশ হয়ে, দিতে অস্বীকৃত হচ্ছেন।

তত্ত্ব নিয়ে আমরা গত কয়েকশ' বছর ব্যস্ত থেকেছি, কিন্তু তথ্যকে বাদ দিলে তত্ত্বের প্রাণ যে অন্তর্হিত হয়ে যায় তা আমরা ভুলে গিয়েছি। শুধু চিন্তার জোরে মানুষ প্রকৃতির কোন বিধানকে পরিবর্তন করতে পারে না, জ্ঞান তখনই প্রকৃত জ্ঞান যখন তা হয় শক্তি, নব নব উন্মেষসাধনের অধিকারী। সেই জ্ঞানের প্রকরণ চোখ বুজে ধ্যান নয়, চোখ খুলে দেখা এবং বোঝা। কিন্তু চোখ বুজে ধ্যান সম্বন্ধে এখনও আমাদের এত মোহ কেন ?

আমরা ক্লান্ত, ভারত সভ্যতার প্রাচীনত্ব আমাদের অবসন্ন করে রেখেছে, সংসারপ্রপঞ্চ আমাদের মনকে বৈরাগ্যের পথে যেন উদ্যত করে রেখেছে, দ্বিধাবিভক্ত চৈতন্য আমাদের জাড্যের পথে ঠেলে দিয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের মধ্যে প্রাণশক্তির যে প্রকাশ

আছে, তাকে অস্বীকার করবে কে? ভারতবর্ষের কৃতিত্বের মধ্যে বস্তু-নিষ্ঠার যে নিদর্শন আছে, তাকে অস্বীকার করবে কে? ভারতবর্ষের ইতিহাসে কর্মবিগর্হিত চিন্তা যে বারবার সর্বাঙ্গীণ অবনতি এনেছে তা অস্বীকার করবে কে?

অন্ধ্রদেশে বিতর্ক চলছে, নন্দিকোণ্ডা পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে হলে নাগার্জুনকোণ্ডার বহুবিধ প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন ধ্বংস হয়ে যায়—সুতরাং কিং কর্তব্যম্? নন্দিকোণ্ডা পরিকল্পনাকে এখনই কাজে লাগাতে হবে, সুতরাং নাগার্জুনাচার্যের সমসাময়িক সভ্যতার নিদর্শন চুলোয় যাক—এই হল অনেকের মত। আর কেউ কেউ বলছেন যে কিছুতেই নাগার্জুনকোণ্ডার ধ্বংস করা যাবে না, আমরা বহুকাল ধরে দুঃখ পাচ্ছি, না হয় আরও কিছুকাল কষ্ট পেয়ে চলি, পরিকল্পনা পিছিয়ে যাক কিম্বা বদলানো হোক। খুব কম লোকই বলছে যে আজকের জীবনকে সমৃদ্ধ করার জন্য নন্দিকোণ্ডা পরিকল্পনাও চলুক সঙ্গে সঙ্গে নাগার্জুনকোণ্ডাকেও বাঁচিয়ে রাখা হোক, এটা বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক কৌশলের পক্ষে এমন কিছু অসম্ভব কাজ নয়।

জাতি হিসাবে জন্মান্ধ আমরা নই, শুধু কয়েকশ' বছরের বিড়ম্বনা আমাদের চোখ বুজে সহজ স্বস্তির সন্ধানে পাঠিয়ে দিয়েছে। সে স্বস্তির দাম যে অতি অল্প, তা বোধ হয় আমরা বুঝছি। তাই অন্ধতা বর্জন করে দীপ্ত, দৃপ্ত পদক্ষেপে অগ্রসর হওয়ার সময় আমাদের এসেছে। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস আর জগতের বর্তমান বিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখলে জানবো যে চোখ খুলে দেশের মানুষকে চিনে জেনে, তবেই আমরা এগোতে পারব। তত্ত্ব ও কর্মের সমন্বয়জাত যে জ্ঞান তারই অঞ্জনশলাকা দ্বারা আমাদের চক্ষু উন্মীলিত হোক, সর্বব্যাপী রৌদ্রের মত আমাদের শক্তি সর্বত্র সঞ্চারিত হোক, পুরাতন ভারতবর্ষের নূতন জীবন প্রতিষ্ঠিত হোক।

স্বপ্ন থেকে বাস্তব

শুধু মাত্র অন্তরের উদ্দীপনায় সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়, শোষণের শিকল ভাঙতে গেলে শুধু মনের একান্ত কামনাই যথেষ্ট নয়। যদি তাই হত তো বহুকাল পূর্বেই মানুষ শ্রেণীশাসনের যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেতে পারত। অতি প্রাচীন যুগ থেকেই বহুজনের কণ্ঠে দারিদ্র্যের দুঃখ, গ্লানি ও লজ্জার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শোনা গেছে। কিন্তু অত্যাচার, অনাচারকে হাজার নীতিকথা বন্ধ করতে পারে নি; অসাম্যের বিড়ম্বনা সমাজজীবনে যে দুঃখ এনেছে, গৌতম বুদ্ধের মতো মহাপুরুষের অপরিসীম মমতা সে দুঃখ মোচনে সমর্থ হয় নি। সাম্যবাদ তাই কবিকল্পনাই থেকে গিয়েছিল—কল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার সম্ভাবনা শুধু এসেছে অতি আধুনিক যুগে, যখন যন্ত্রের প্রচলন হওয়ায়, বড় বড় কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাদের মেহনতে দুনিয়া চলে তারা একজোট হতে শিখেছে, নিজেদের মধ্যে সন্ধান পেয়েছে সেই শক্তির যে শক্তি নূতন শ্রেণীহীন সমাজ গড়তে পারে।

অনেকে বলে যে কমিউনিজম্ হল বিদেশ থেকে ধার করা জিনিস, এদেশের মাটির সঙ্গে তার নাকি কোন সংযোগ নেই। একথা যদি সত্য হত তো কমিউনিজম্ যাদের চক্ষুশূল, তারা নিশ্চয়ই খোস মেজাজে বহাল তবিয়তে দিন কাটাত। বাস্তবিকই যদি কমিউনিজম্ এমন এক বস্তু হয় যার শিকড় এদেশের মাটিতে গজাতে পারে না, তাহলে কমিউনিজম্ অসার বাগাড়ম্বর মাত্র, তাকে ভয় করার কোন কারণ নেই। কিন্তু সবাই জানে কমিউনিজমের ভয়ে সারা দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদী ও শোষকের দল থরহরি কম্পমান। কমিউনিজম্‌কে যে বাক্স-প্যাঁটরায় পুরে দেশ থেকে দেশান্তরে আমদানি-রপ্তানি করা যায় না, একথা লেনিন-স্টালিনের মুখে আমরা বারবার শুনেছি। প্রত্যেক দেশেই তার নিজস্ব পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে কমিউনিজমের আবির্ভাব ঘটেছে

এবং ঘটছে। কোথাও আগে আর কোথাও পরে, ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অবসান অনিবার্য হয়ে উঠছে। কংস যেমন শুনেছিল, "তোমাকে মারিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে"—তেমনই আজ দুনিয়ার ধনিকেরা ক্রমশ জানছে যে মেহনতী জনতার বিজয় অভিযানকে রোধ করা আর বেশি দিন সম্ভব নয়, এবং জানে বলেই মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে নিজেদের পরমায়ু বাড়াবার জন্য। এদেশে তাদের একটা অস্ত্র হল এই কুৎসা রটনা করা যে কমিউনিজম্ হল বাইরে থেকে আমদানি করা ব্যাপার, যার সঙ্গে ভারতবর্ষের কোন সামঞ্জস্য নেই।

ভারতবর্ষ কিছু একটা সৃষ্টিছাড়া, আজব দেশ নয়—সাধারণ মানুষের মনের কামনা ভারতবর্ষে বদলে যাবে এমন কথা ভাবা বাতুলতা বই কিছু হতে পারে না। দুঃখের বন্ধনকে আমরা যুগ যুগ ধরে অভ্যর্থনা করে নিয়েছি, এ কি কখনও সম্ভব? আমাদের দেশের মহাপুরুষরা এ জীবন সম্বন্ধে ভাবেন নি, শুধু পরমার্থের কথা ভেবেছেন এ-কথা প্রায় শোনা যায় বটে, কিন্তু তা সত্য নয় একেবারে।

যারা বলে যে "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মায়া", ভারতবর্ষের প্রাচীন চিন্তার সার কথা হল এই, তারা আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটা বিরাট অংশকে অস্বীকার করতে চায়। মহেঞ্জোদাড়ো, হরপ্পা প্রভৃতি স্থানে এদেশের সবচেয়ে পুরোনো সভ্যতার যে বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে, তার মধ্যে তদানীন্তন জীবনের বস্তুনিষ্ঠা অত্যন্ত স্পষ্ট। বৈদিক যুগে যাগযজ্ঞ, হোম ইত্যাদির উদ্দেশ্য পারলৌকিক সদ্গতির চেয়ে ইহ-জীবনে সাফল্যই ছিল ঢের বেশী। দর্শনের বিকাশ যখন ঘটল, তখন প্রচণ্ড প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাস্তববাদী লোকায়ত দর্শন কিছুতেই নিষ্পিষ্ট হল না, চার্বাকপন্থীদের অস্তিত্ব পর্যন্ত অস্বীকার করার হাজার চেষ্টা ব্যর্থ হল। সাংখ্যকার বলতে কুণ্ঠিত হলেন না যে প্রমাণের অভাবে ঈশ্বর হলেন অসিদ্ধ, আর গৌতম বুদ্ধ কোন এক কল্পনা-সৃষ্ট জগৎকর্তার নাম উচ্চারণ না করেই তাঁর নব ধর্ম প্রচার করলেন। যে দেশের নগর-সভ্যতা চৌষট্টি কলার ছটায় সমৃদ্ধ ছিল সে দেশ কখনও জীবনকে, বাস্তবকে তুচ্ছ করে নি। শুধু যখন আমাদের ইতিহাসে নিদারুণ দুর্দিন ঘনিয়ে এসে বাসা বেঁধেছে, তখনই আমাদের চিন্তায় তার ছায়া

পড়েছে—বাস্তব যখন নির্মম, তখন তার দিকে চোখ বুজে অবাস্তবের ধ্যানে সান্ত্বনার অন্বেষণ আরম্ভ হয়েছে। এ শুধু আমাদের দেশের বৈশিষ্ট্য নয়। সব দেশেই অল্লাধিক পরিমাণে এ ঘটনা ঘটেছে।

আদিম স্তর পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের সমাজজীবনে শ্রেণী-শাসনের গ্লানি দেখা দিয়েছে, কিন্তু সে গ্লানিকে কখনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন যারা তারা মেনে নিতে পারে নি। বৈদিক ঋষি কল্পনা করেছিলেন প্রশান্ত, মধুময় পরিবেশ—"মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।" মহাভারতের উদ্যোগপর্বে ঋষি শম্বর বলছেন—

পতিপুত্রবধাদেতৎ পরমং দুঃখমব্রবীৎ।

দারিদ্র্যমিতি যৎ প্রোক্তং পর্য্যায়মরণং হি তৎ॥

"বিবাহিত স্ত্রীলোকের পক্ষে পতি বা পুত্রের মৃত্যুর চেয়ে দারিদ্র্য আরও অসহনীয় দুঃখ, কারণ দারিদ্র্য পর্যায়মরণ নিয়ে আসে, তিলে তিলে পুড়িয়ে মারে।" চিরজীবী বলে বর্ণিত বক ঋষিকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন যে তাঁর অতি দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর ধারণা হয়েছে যে সবচেয়ে বড় দুঃখ হল গর্বিত ধনীর হাতে দরিদ্রের লাঞ্ছনা। ধ্রুব-উপাখ্যানে কথিত আছে যে বালক ধ্রুব যখন কঠোর তপস্যায় লিপ্ত ছিলেন তখন দেবরাজের মর্যাদা হারাবার আশংকায় ইন্দ্র গিয়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের কাছে ধরনা দেন এবং ধ্রুবকে তপস্যা থেকে নিরস্ত করতে বলেন। ব্রহ্মা যখন ধ্রুবের কাছে গিয়ে বর দিতে চান, তখন ধ্রুব যে উত্তর দিয়েছিলেন তা অবিস্মরণীয়। "স্বস্ত্যস্তু বিশ্বস্য, বরং না যাচে"—"বিশ্বের স্বস্তি হোক, আমি বর যাচ্ঞা করি না", এ-কথাই বলেছিলেন ধ্রুব।

গৌতম বুদ্ধ গৃহত্যাগ করেছিলেন জীবের দুঃখ দূর করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে। রাজপ্রাসাদের নিখুঁত তত্ত্বাবধান সত্ত্বেও জীবনের যন্ত্রণাকে তাঁর দৃষ্টিবহির্ভূত রাখা সম্ভব হয় নি। মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণনা আছে যে শিবিরাজা সামান্য পাপক্ষালনের মানসে কিছুক্ষণের জন্য যখন নরকে যান, তখন তাঁর দেহনির্গত সৌরভে আকৃষ্ট হয়ে পাপীরা সবাই তাঁর সান্নিধ্য চাইতে থাকে, আর নরক ত্যাগের সময় উপস্থিত হলে তিনি অস্বীকৃত হয়ে বলেন—

ন ত্বহং কাময়ে রাজ্যং, ন স্বর্গং ন পুনর্ভবং।
কাময়ে দুঃখতপ্তানাং প্রাণিনামার্তিনাশনম্।

"আমি রাজ্য চাই না, স্বর্গ চাই না, পুনর্জন্ম চাই না—আমি চাই শুধু এই যে, দুঃখতপ্ত প্রাণীদের যন্ত্রণার অবসান হোক।" আরও কত আখ্যানের উল্লেখ করা যায়, যার মধ্য দিয়ে মানুষের দুঃখ মোচনের কামনাই ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে প্রকট হয়ে রয়েছে।

কিন্তু "বসুধৈব কুটুম্বকং"—নীতিশাস্ত্রের এই শিক্ষা আজও আমাদের জীবনে বাস্তব হয়ে ওঠে নি। ১৯৫১ সালে নূতন চীন দেখে এসে উত্তরপ্রদেশের স্বনামধন্য জননেতা পণ্ডিত সুন্দরলাল বলেছিলেন যে সে দেশে সত্যই নূতন সমাজ সকলের প্রকৃত কুটুম্ব-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইসলামের প্রখর গণতান্ত্রিকতা ও "জ কৎ" প্রথা মারফত পরস্পরের সাহায্যের নির্দেশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু মধ্য-প্রাচ্যের মুসলমান দেশগুলিতে অসাম্য ও দারিদ্র্যের অবধি নেই; মুসলিম জগতে বলা যায় যে, সোবিয়েত উজ্‌বেকিস্তান, তাজিকিস্তান, আজেরবাইজান, দাঘেস্তান প্রভৃতিতেই সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শ বাস্তবে পরিণত হচ্ছে। খ্রীস্টান ধর্মশাস্ত্রে বলেছে প্রতিবেশীকে আপনার মতো ভালবাসতে, কিন্তু যেখানে সাম্যবাদী আন্দোলনের জোরে নূতন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় নি সেখানে ধর্মের নির্দেশ অবলীলাক্রমে অবহেলিত হয়েছে। ধর্মপ্রচার ও নীতিশিক্ষা যুগ যুগ ধরে চলে আসা সত্ত্বেও সমাজের যে পরিবর্তন সাধারণ মানবিকতা দাবি করে, সে পরিবর্তন ঘটতে পারে নি। সাম্যবাদী আন্দোলনই গত একশ বৎসরের মধ্যে যুগান্তকারী পরিবর্তন প্রবর্তন করতে পেরেছে —আজ পৃথিবীর জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি সোশালিস্ট সমাজ গড়েছে কিংবা গড়ে তুলছে।

মার্ক্‌স্‌বাদ ধর্মকে হেসে উড়িয়ে দেয় না, শ্রদ্ধা ও অভিনিবেশ সহকারে সে-বিষয়ে মার্ক্‌স্‌বাদ আলোচনা করে। কিন্তু ইতিহাস থেকে একটা কথা খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হল এই যে, ধর্ম যে-সমাজকে "ধারণ" করে রেখেছে, সে-সমাজ হল শ্রেণীসমাজ, সে-সমাজে অধিকার ও সুযোগের বৈষম্য স্বীকৃত, সে-সমাজে "কারও পৌষমাস, কারও

সর্বনাশ" যেন একটা প্রাকৃতিক নিয়মেরই মতো অমোঘ ও অকাট্য বলে মেনে আসা হয়েছে। এইজন্য দেখি, বলা হয়েছে যে ধর্মের তত্ত্ব গুহামধ্যে নিহিত রয়েছে, তাকে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আনা যায় না, আর তাই "মহাজনা যেন গতঃ স পন্থা"—মহাজনেরা যে পথে গেছেন সেটাই হল সকলের পক্ষে প্রকৃষ্ট রাস্তা। ধর্মের প্রভাব এইভাবে মানুষকে গতানুগতিকতায় অভ্যস্ত করিয়েছে, যা কিছু চলে এসেছে তাকেই মান্য করার প্রয়োজনকে বড় করে তুলে ধরেছে, নিজের চেষ্টায় পুরুষকারগুণে ব্যক্তির ও সমষ্টির ভাগ্য পরিবর্তনের কল্পনা যে বৃথা তা বুঝিয়েছে, বিধিনির্ধারিত রীতিতে সমাজ চলতে থাকবে, যে ঋষিরা সামাজিক জীবনে নিত্যকর্মপদ্ধতি স্থির করে দিয়েছেন, তাঁরা মন্ত্রদ্রষ্টা ঈশ্বর-অনুপ্রেরিত বলে তাঁদের নির্দেশ অমান্য করা মহাপাপ, এ-ধরনের মনোভাব সাধারণ মানুষের মনে ছড়িয়ে দিয়েছে। প্রবাদ-বাক্যের মধ্যে বহুজনের মনোভাব প্রকাশ পায়, যেমন ইংরেজী প্রবাদ বলে : "The poor shall be with us always", "গরীব এবং গরীবানা সমাজে চিরকাল থাকবে"—অর্থাৎ এ ব্যবস্থাকে বদলানোর কথা ভাবা বা সেই কাজে এগিয়ে যাওয়া হল বাতুলতা।

তাই সব দেশে ধর্মব্যবস্থার মধ্যে যাঁরা কর্তৃপক্ষীয় হয়ে বসেন, তাঁদের কায়েমী স্বার্থও সমাজে প্রখর হয়ে ওঠে। খ্রীস্টান ধর্মের আদি ভক্তেরা কমিউনিজমের কথা ভেবেছিলেন, সবাইয়ের সমান সুযোগ থাকবে এই ভিত্তিতে জীবন পরিচালিত করার চেষ্টায় নেমেছিলেন। কিন্তু তদানীন্তন সমাজ ও রাষ্ট্র সে চেষ্টাকে নিষ্পেষিত করে দেয়। আর তারপর "Render unto Caesar the things that are Caesar's" ("রাজার প্রাপ্য রাজাকে দাও") প্রভৃতি যীশুখ্রীস্টের যে সব কথা ছিল সেগুলোকে সামনে টেনে এনে তখনকার যারা সমাজপতি তাদের সঙ্গে ধর্মযাজকদের মিতালি ঘটে, খ্রীস্টান পাদরীরা মঠে ও গির্জায় ক্রমশ বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হয়ে বসে। ইয়োরোপের মধ্যযুগে টাকা লেনদেন ব্যাপারে পর্যন্ত এই ধর্মযাজকের দল একটা বড় অংশ গ্রহণ করে এবং বহু উত্থানপতনের মধ্যেও রাষ্ট্র-শক্তির প্রতি আনুগত্য রেখে চলে, আর সাধারণ, বঞ্চিত মানুষের

অত্যাচার নিরসন করার যে সমস্ত উদ্যম হয় তাকে নষ্ট করে দেয়। ৮ ইয়োরোপের ইতিহাসে এর ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে—যখনই ধর্ম-বিশ্বাসী মানুষ নীতিকথাকে জীবনের বাস্তবে রূপায়িত করতে গেছে উইনস্ট্যান্লির মতো যখন তারা বলেছে যে ঈশ্বর নিশ্চয়ই চান যে মাটি যারা চাষ করে তারাই হবে মাটির মালিক, তখন হোমরা-চোমরা পাদরীরা শুধু যে ধমক দিয়ে উঠেছে তা নয়, একেবারে রাষ্ট্রশক্তির সাহায্য নিয়ে অত্যন্ত নির্মমভাবে তাদের পিষে মেরেছে। এ-ব্যাপারে ক্যাথলিক-প্রটেষ্টাণ্ট ভেদাভেদ থাকে নি। রোমান ক্যাথলিকদের ধর্মগুরু পোপের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে যে খ্যাতনামা মার্টিন লুথার জার্মানিতে ধ্বজা তুলে লড়েছিলেন তিনিই আবার দেশের চাষীরা জায়গীদারের অত্যাচার হজম না করে বিদ্রোহ করেছিল বলে তাদের পিষে মারার জন্য অকথ্য ভাষায় প্রচার চালিয়েছিলেন। ধর্মধ্বজীদের সঙ্গে সমাজে যারা কর্তৃপক্ষীয় তাদের ঘনিষ্ঠতা সব দেশে সব সময় দেখা গেছে। ওয়াহাবি (কিম্বা ফরাজি) নেতৃত্বে সাধারণ মুসলমান কৃষক যখন মোল্লা আর ওয়াকিফদের বিরুদ্ধে লড়েছে, কিম্বা হিন্দু জনতা যখন তারকেশ্বরের মত বিপুল সম্পত্তির অধিকারী মোহন্তের বিরুদ্ধে লড়েছে তখন সেই একই ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়।

সমাজের উপর ধর্মের প্রভাব বিচার করতে গিয়ে আরও দেখা যায় যে, সাধারণ মানুষের জীবনে যে অজস্র বিড়ম্বনা, তাকে দূর করার চেষ্টার বদলে স্বীকার করে নিয়ে এবং মৃত্যুর পর স্বর্গরাজ্যে কিংবা পরজন্মে সেই দুঃখ, লজ্জা, অপমানের ক্ষতিপূরণ হিসাবে শান্তি ও সুখের আশ্বাস দিয়ে ধর্ম মানুষকে সান্ত্বনা দিয়ে এসেছে। যীশুখ্রীস্টের ধর্মসমাচারের যে বিবরণ তাঁর প্রধান শিষ্যেরা লিপিবদ্ধ করে গেছেন, তা থেকে জানা যায় যে তখনকার অর্থব্যবস্থায় যারা ধনী, তাদের সম্পর্কে বারবার কশাঘাত করে কথা বললেও তিনি সকলকে সমাজ ও রাষ্ট্রের নির্দেশ মেনে চলতে বলেছেন, আর গরীবকে এই বলে প্রবোধ দিয়েছেন যে স্বর্গরাজ্যের উত্তরাধিকারী হল তারা, ভগবানের আশীর্বাদ তাদেরই উপর পড়ছে!

ইসলামের ঐক্য ও সাম্যমন্ত্র জনজীবনের দারিদ্র্য ও গ্লানি মোচনে

করতে পারে নি বলে বেহেস্ত-এর প্রলোভন দেখিয়ে গরীবকে আমীর-ওমরাহদের হুকুম-বরদারী করানোর ব্যবস্থা সমাজ করে রেখেছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে অভাব ও বঞ্চনার মধ্যে হিন্দু জনতা বাস করে এসেছে, সেই অভাব ও বঞ্চনার জ্বালা উপশমের কাজে জন্মান্তরবাদকে লাগানো হয়েছে—হয় পুণ্যবলে পুনর্জন্মের শিকল থেকে মুক্তি মিলবে, কিংবা ইহজন্মে কর্মফলের অনুপাতে আবার জন্মাতে হবে জীবরূপে, এবং হয়তো শতকোটি জন্মের পর মুক্তি আসবে, মোটা-মুটিভাবে এই হল কথা। এর পরিষ্কার অর্থ হল : ইহজীবনে যা কিছু ঘটে তা সহ্য করে যাও; যে নিত্যকর্মপদ্ধতি শাস্ত্রকারেরা স্থির করে দিয়েছেন তা অনুসরণ করে চলো; বিধিনির্দিষ্ট ভবিতব্য যা, তা অনিবার্য; সুতরাং যা ঘটছে তার বিরুদ্ধাচরণ কোরো না; মনে আশ্বাস রেখো যে মায়াময় জীবনে সুখ আর দুঃখ চক্রের মত বদলে চলেছে; ভুলো না যে সংসারে যা কিছু দেখছ তা হল আসলে অলীক, এই মায়ার জাল কাটিয়ে মোক্ষলাভের চেষ্টাই হল একমাত্র কর্তব্য; তাই দেবদ্বিজে ভক্তি রেখো, রাজাকে মান্য কোরো; জাতিধর্ম পালন কোরো এবং শেষ অবধি জেনো, ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্য, আর "বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর।" সমাজের ইতিহাসের দিক থেকে বিচার করলে সকল ধর্মই এইভাবে সাধারণ মানুষের অবশ্যম্ভাবী অসন্তোষকে প্রশমিত করে রেখেছে, বলে এসেছে পরমকারুণিক পরমেশ্বরের কথা, আর যখন সেই পরমেশ্বরের বিধান অন্যায় ও অনাচারের সমর্থকরূপে লোকচক্ষুর সামনে ফুটে উঠেছে তখন এই বলে সবাইকে বুঝিয়েছে যে মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতার লীলা হ'ল রহস্যময়, তার গূঢ়ার্থ তো আমরা সবাই বোঝবার আশা করতে পারি না! তাই দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখি যে কোম্পানীর আমলে দুঃখী বাঙালীর মনের কথা বলেছিলেন রামপ্রসাদ সেন তাঁর উপাস্য কালীকে উদ্দেশ করে :

করুণাময়ি, কে বলে তোরে দয়াময়ী?
কারও দুগ্ধেতে বাতাসা,
আমার এমনই দশা,
শাকে অন্ন মেলে কই?

কিন্তু তিনি সান্ত্বনা পেয়েছিলেন এবং অপরকেও দিয়েছিলেন কালী-ভক্তির রসে ডুবে আর সব কিছু দুঃখ-কষ্টের কথা ভুলে। কার্ল মার্ক্স বলেছিলেন যে ধর্মের মধ্যে মিলিয়ে রয়েছে দলিত মানুষের দীর্ঘশ্বাস, তিনি বলেছিলেন যে, ধর্মের আফিম গিলিয়ে মানুষকে ঝিমিয়ে রাখা হয়ে এসেছে যুগ যুগ ধরে ; তাঁর একথা সমাজের ইতিহাসের দিক থেকে একেবারে অকাট্য।

রবীন্দ্রনাথের সুবিখ্যাত কবিতা "এবার ফিরাও মোরে" অনেকেরই স্মরণে আসবে। তাতে তিনি বলেছিলেন তাঁর অনবদ্য ভঙ্গীতে—

বড় দুঃখ, বড় ব্যথা, সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়ই দরিদ্র, শূন্য, বড় ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার।—
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্য-মাঝারে, কবি,
একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।

স্বর্গ থেকে বিশ্বাসের ছবি এনে যে দৈন্যের কালিমা ঘোচানো সম্ভব, এই যে ধারণা—"এবার ফিরাও মোরে"-র রচনাকাল ১৩৩০ সালে—রবীন্দ্রনাথের মনে নিশ্চয়ই ছিল, তা যেন ১৩৩৮ সালে লেখা তাঁর "প্রশ্ন" কবিতায় নির্মূল হতে চলেছিল—

কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশী সঙ্গীতহারা,
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে,
তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো ?

শ্রেণীসমাজের ইতিহাসে ক্রমাগত এই ব্যাপারই লক্ষ্য করা যায় যে, মুষ্টিমেয় যারা তারা সমাজপতি সেজে শুধু নিজেদের স্বার্থে দুনিয়ার খোলা হাওয়াকে বিষিয়ে দিচ্ছে, আলোকে পর্যন্ত নিবিয়ে দিচ্ছে, আর তাদের বিরুদ্ধে যাতে অভ্যুত্থান না ঘটে তাই সাধারণ মানুষকে ধর্মের বুলি শুনিয়ে, নীতিকথা আউড়ে, আর হাজার ফন্দিফিকির খাটিয়ে

মোহমুগ্ধ করে রাখছে। যুগে যুগে মানুষ এ অনাচার মানতে অস্বীকৃত হয়েছে, যুগে যুগে শোনা গেছে বিভিন্ন স্বরে, বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্ন ভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথেরই কথা :

যার ভয়ে তুমি ভীত, সে-অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি, তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।

প্রাচীন ভারতের ঋষিকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে : "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত" —ওঠো, জাগো। উপনিষদে বলা হয়েছে, এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো, গতিবেগকে স্তিমিত কোরো না, পথচারি, এগিয়ে চলো। দুঃখের শৃংখল ভাঙতে বেরিয়েছিলেন সিদ্ধার্থ, আর বহু তপশ্চর্যার পর বললেন, পথ আছে মাত্র এক, মুক্তি যদি পেতে হয়, নির্বাণের মধ্যে সকল গ্লানির অবসান যদি ঘটাতে হয় তো অষ্টমার্গ অনুসরণ করতে হবে, পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহারে সত্যসন্ধ হতে হবে, অন্যায়কে বর্জন করতে হবে, লোভ-জটিল সংসারবন্ধনকে পরিহার করতে হবে। কত মহাজন এলেন গেলেন, জগতের সর্বত্র তাঁদের কণ্ঠ উত্তোলিত হল—তাঁদের বিবরণ দেওয়া এ রচনার উদ্দেশ্য নয়, সে বিবরণ সংক্ষেপে দেওয়া সম্ভবও নয়। কিন্তু যে দারিদ্র্যকে "পর্যায়মরণ" বলে মহাভারতকার ধিক্কৃত করেছিলেন, সেই দারিদ্র্য দূর হল না, সমাজ রয়ে গেল মুষ্টিমেয়ের কর্তৃত্বে, দেশের দৌলতে মেহনতী মানুষ ভাগ পেল না, "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই"—এই মহিমামণ্ডিত ঘোষণা কবিকল্পনাই থেকে গেল। দাসপ্রথা গিয়ে এল জায়গীরদারী ব্যবস্থা, সামন্ততন্ত্র নানারূপে ইয়োরোপে ও এশিয়ায় দেখা দিল, তারপর যন্ত্রযুগের প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘটল—কিন্তু ইতিহাসের পাতা উল্‌টিয়ে মানুষ এগিয়ে চলতে থাকলেও শ্রেণীশাসনের অবসান ঘটল না, বহুজনকে শোষণ করে সংখ্যাল্প প্রভুশ্রেণীর কর্তৃত্ব শেষ হল না।

যন্ত্রযুগ প্রবর্তিত হওয়ার পর আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, দুঃখ-দৈন্য, অভাব-অনটন বিধি-নির্দিষ্ট ভবিতব্য নয়, মানুষ উৎপাদন কৌশলে বাস্তব জীবনের ক্লেশ ও গ্লানি নিরসন করতে পারে। তাই উনিশ শতকের প্রথমে ইয়োরোপে সমাজবাদ ("সোশালিজম্") প্রচারে কয়েকজন মহামতি অগ্রণী হলেন। ইংলণ্ডে রবার্ট ওয়েন, ফ্রান্সে ফুরিয়ে,

স্যাঁ-সিমঁ প্রভৃতি বলতে থাকলেন—ধনিক ব্যবস্থার গলদ এত বেশি ও এত অসহ্য যে সোশালিজমের উৎকর্ষ প্রচার করলেই সবাই বুঝবে যে সোশালিজম্ ছাড়া গত্যন্তর নেই। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা আদর্শ কারখানা প্রতিষ্ঠিত করে, কিংবা ফুরিয়ে ও স্যাঁ-সিমঁ-র বহু শিষ্যের মত আমেরিকায় অনেকটা জমি নিয়ে নিজেদের আস্তানা গড়ে বাকি সবাইকে সোশালিজমের শ্রেষ্ঠত্ব বোঝাতে চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁদের ধারণা ছিল যে যুক্তির দিক থেকে সোশালিজম্‌কে খণ্ডন করা যখন সম্ভব নয় এবং দারিদ্র্যসমস্যা সমাধানে ধনতন্ত্রের অক্ষমতা যারা সুবুদ্ধি ও বিবেচক তাদের কাছে যখন স্পষ্ট, তখন শুধু যুক্তির জোরে আর কয়েকটা সোশালিস্ট কায়দায় পরিচালিত আস্তানার উদাহরণ দেখিয়েই সোশালিজম্ প্রতিষ্ঠা করা চলবে। শ্রেণীসমাজের প্রকৃতি সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন বলে সেই সমাজের রূপান্তর কেমন করে ঘটানো যায় তা তাঁরা জানতেন না। মানুষের বুদ্ধিবিবেচনার উপরই তাঁরা নির্ভর করেছিলেন, কিন্তু ইতিহাস তাঁদের শেখায় নি যে শ্রেণীশাসনকে দূর করতে হলে তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমস্ত মেহনতী মানুষকে সংহত করা ভিন্ন পথ নেই।

তত্ত্বের ছটা যতই উজ্জ্বল হোক না কেন, কর্মের সঙ্গে তার সমন্বয় বিনা যুগান্তর আসতে পারে না। তত্ত্ব হিসাবে সোশালিজম্ যতই অকাট্য হোক, চিন্তার দিক থেকে সোশালিজমের উৎকর্ষ যতই অনস্বীকার্য হোক, মানবতার সঙ্গে সোশালিজমের সামঞ্জস্য যতই সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক হোক, সমাজে যারা কর্তৃত্ব করছে তারা যে কখনও প্রচণ্ড প্রতিরোধ না করে একতিল জায়গা ছাড়বে না, তাদের গদি থেকে টেনে নামাতে হলে যে শ্রমিকশ্রেণীর পরিচালনায় সমগ্র বঞ্চিত জনতাকে সুদীর্ঘ সংগ্রাম করতে হবে, শুধু অর্থনীতি ও রাষ্ট্রব্যাপারে নয়, চিন্তার ক্ষেত্রেও তেমনই অনলস সংগ্রাম করে যেতে হবে—একথা আকাশচারী (Utopian), স্বপ্ন-বিলাসী সোশালিস্টরা বোঝেন নি। একথা বুঝেছিলেন এবং অমিত তেজে প্রচার করেছিলেন মহামতি কার্ল মার্ক্‌স্ (১৮১৮-৮৩) এবং তাঁর আজীবন সহচর ও সহকর্মী ফ্রেড্‌রিক এঙ্গেল্‌স্ (১৮২০-৯৪)।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা শিক্ষা দিলেন যে বিপ্লব সংঘটনের জন্য শ্রমিক-শ্রেণীর যে পার্টি একান্ত প্রয়োজন, তার কাজ নূতন সমাজের পরিকল্পনা খাড়া করা কিংবা ধনিক ও তাদের অনুচরদের কাছে শ্রমিকের দুঃখ দূর করার জন্য অনুনয় বিনয় করা আর নীতিকথা শোনানো নয়, গোপন ষড়যন্ত্র করে যাওয়াও তার কাজ নয়; আসল কাজ হল শ্রমিকের শ্রেণীসংগ্রামকে সংগঠিত ও পরিচালিত করা, এবং আসল উদ্দেশ্য হল শ্রমিকশ্রেণীর জোরে রাষ্ট্রশক্তি অধিকার করে সোশালিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

মার্ক্সের এই শিক্ষা মানুষের ইতিহাসে যুগান্তর এনে দিয়েছে। সমাজের বিকাশ কি ভাবে ঘটে তার সন্ধান হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ পায় নি। মার্কস্ প্রথম সেই বিকাশের বিধান আবিষ্কার করলেন। তিনি শেখালেন যে প্রাকৃতিক নিয়মের সঙ্গে সমাজ-বিকাশের বিধানের তফাত হল এই যে প্রাকৃতিক নিয়ম মানুষের ইচ্ছা বা কর্মের উপর নির্ভর করে না কিন্তু সমাজের বিকাশ ঘটে বিশাল জনতার কাজের মধ্য দিয়ে—যুগ থেকে যুগান্তর আসে যখন সমাজের ভিতরকার অসঙ্গতিকে আর কিছুতেই চাপা দিয়ে রাখা যায় না। তাই মার্ক্স দেখলেন যে ধনতন্ত্রের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শক্তিশালী শ্রমিকশ্রেণীর অভ্যুদয় অনিবার্য এবং এর ফলে সমাজের মধ্যে পরস্পর সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্য অবশ্যম্ভাবীরূপে সঞ্জাত হচ্ছে, তার পরিণতি হল সোশালিস্ট বিপ্লবে।

তিনি আরও দেখালেন যে ধনতন্ত্রের অবসান সমাজবিবর্তনের বিধান অনুযায়ী একেবারে অবধারিত হলেও অন্ধ নিয়তির মত তা ঘটবে না—সেজন্য চাই কঠোর প্রস্তুতি ও সংগ্রাম, চাই অতীতের গ্লানি দূর করে প্রদীপ্ত ভবিষ্যৎকে আবাহনের আয়োজন।

সেই আয়োজন আজ দেশে-দেশে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে, শ্রেণী-শাসনের অন্ধকার সরিয়ে দিয়ে শ্রেণীহীন সমাজের আলো দুনিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। আজ "কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার"-এর বজ্রবাণী চারদিকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে: "কমিউনিস্ট বিপ্লবের আতঙ্কে শাসকশ্রেণী কাঁপতে থাকুক। যারা শ্রেণী হিসাবে নিঃস্ব, সর্বহারা, তাদের শৃঙ্খল ছাড়া হারাবার কিছু নেই, জয় করবার জন্য রয়েছে সারা জগৎ। সব দেশের মেহনতী মানুষ এক হও।"

আধুনিক বাংলা কবিতা

এ সঙ্কলনের সার্থকতা সম্বন্ধে হয়তো বহু প্রশ্ন উঠবে, আর বিশেষ করে প্রশ্ন তুলবেন তাঁরা, যাঁরা আধুনিক বাংলা কবিতাকে কবিতা বলে মানতেই রাজী নন। যে ধরনের কবিতা কিছুকাল থেকে লেখা হচ্ছে আর যার পরিচয় দেওয়াই এ সঙ্কলনের উদ্দেশ্য, তাকে বিদ্রূপ করবার লোকের অভাব এ দেশে নেই। এমনও হয়তো অনেকে আছেন, যাঁরা অধিকাংশ আধুনিক কবির লেখাকে বেয়াড়া মনের বেয়াদবি মনে করে থাকেন, আর ভাবেন যে এই কুপথ্য দিয়ে মুখ বদলাবার নেশা বেশি দিন টিঁকতে পারে না। আর আমাদের এই মান্ধাতাগন্ধী দেশে নতুন কিছু দেখলেই অনেকে খড়গহস্ত হয়ে ওঠেন, ত্রিকালদর্শী ঋষিদের কৃপায় সমাজ ব্যবস্থার রজ্জুতে আমাদের সমাজ-চৈতন্যকে সংকীর্ণতম পরিধির মধ্যে বেঁধে রাখা হয়েছে বলে বর্তমান যুগের অস্থির, অশান্ত, পথান্বেষী সমাজের ছায়া সাহিত্যে দেখলে অভিশাপ তাঁদের জিহ্বাগ্রে এসে পড়ে। কাব্যের স্বাধিকার প্রত্যর্পণের জন্য রবীন্দ্রনাথ যখন প্রচলিত প্রথার অন্ধকূপ থেকে তাকে আলোকে টেনে আনছিলেন—তখন তাঁকে অর্বাচীন অপোগণ্ড বলে যাঁরা উপহাস করেছিলেন, অপমান করেছিলেন, তাঁদের উত্তরাধিকারীদের সংখ্যা নগণ্য নয়। দুরূহতার দোহাই দিয়ে বা নিছক নিন্দাবাদের জোরে তাঁরাই আজকের কবিতা দেখে নাসিকাকুঞ্চন করছেন, সহজ তাচ্ছিল্যের সরস ব্যাখ্যান দিয়ে সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জন করছেন। অবশ্য আধুনিক কবিতাকে আসামীর কাঠগড়ায় খাড়া করলে নানান দফায় অভিযোগ পেশ করা চলে। কিন্তু কাব্যবিচারের কানুনে জবরদস্তির ভাগ যে অনেকটা কম, তা ভুললে চলে না, আর আধুনিক কবিতার বহু অপকর্ষ সত্ত্বেও যুগাবর্তের উৎকণ্ঠিত লক্ষণ এবং কাব্য-সিদ্ধির সম্ভাবনা আছে বলেই এ সঙ্কলনের সার্থকতা রয়েছে।

বাংলার কবিকাহিনী নিয়ে বাঙালীর আত্মপ্রসন্ন অহঙ্কার সমীচীন কি না সে আলোচনার এখানে প্রয়োজন নেই। আমাদের সৌভাগ্য

যে রবীন্দ্রনাথের অমিত প্রতিভা আজও অপরিম্লান ; তিনি শুধু জ্যেষ্ঠ নন, তিনি শ্রেষ্ঠ, তাই বিনয়রহিত কনিষ্ঠদের আশীর্বাদ করতে তিনি কুণ্ঠিত হন নি, স্বসৃষ্ট ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে যে দুঃসাহসীরা বিদ্রোহ করতে চেয়েছিল, তাদেরই দলে যোগ দিতে সঙ্কোচ করেন নি। রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে অল্পবিস্তর যাঁরা মুক্ত হয়েছেন বা হতে চেষ্টা করেছেন, তাঁদেরই লেখা থেকে এ সঙ্কলন, অথচ এখানে সর্বাগ্রে পাওয়া যাবে সর্বাগ্রগণ্য রবীন্দ্রনাথকে।

রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে মুক্তির প্রয়াস মাত্রই যে শ্রদ্ধেয়, তার কোন অর্থ নেই। আর সে প্রভাবকে সম্পূর্ণ বর্জন করার চেষ্টা হচ্ছে হাস্যকর ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথের ভাষা আজ সকল বাঙালীর সম্পত্তি ; রবীন্দ্রনাথ পড়ি নি বা ভুলে গেছি বলে বড়াই করা হয় অনৃতবাদন, নয় দুঃশীলতা। যে সাহিত্যিক ঐতিহ্যে রবীন্দ্রনাথের অবদান অপরিমিত সে ঐতিহ্যের সঙ্গে অপরিচয় হচ্ছে সাহিত্যসৃষ্টির পথে মারাত্মক প্রতিবন্ধক। কিন্তু আজ এ কথাও স্বীকার না করে চলে না যে সে ঐতিহ্যের ছত্রচ্ছায়ায় কাব্যরচনায় এখন বিড়ম্বনা ঘটছে, যে বৃহৎ বিচিত্র বাধাহীন লীলাজগতে নানা আস্বাদনে নিজেকে উপলব্ধি করতে চেয়ে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য সৃষ্টি করতে পেরেছেন, সে জগতের দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেছে। সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত আর আকাশ থেকে ধরণী পর্যন্ত সৌন্দর্যের যে প্লাবন, তার মধ্যে কোন জবরদস্ত পাহারাওয়ালার তকমার চিহ্ন রবীন্দ্রনাথ আগে দেখেন নি, কিন্তু আজ সে তকমা যেন দৃষ্টির পথে অন্তরায় হয়ে পড়েছে। তাই গত বিশ বছরের কবিতায় এত গ্লানি, এত জিজ্ঞাসা ; তাই লীলাসঙ্গিনীর কঙ্কণঝঙ্কার অলীক পূর্বস্মৃতি মাত্র হয়ে পড়েছে ; তাই গানের ধুয়োর মত নানা দেশের কবির লেখায় নানা ছদ্মবেশে এলিয়টের প্রশ্ন শোনা যাচ্ছে ;

"...Please, will you
Give us a light ?
Light
Light." (Triumphal March)

তাই আলোর সন্ধানে বেরিয়ে বাঙালী কবিরাও দেখছেন যে

"অগ্রজের অটল বিশ্বাস" না ফেরাতে পারলে কিম্বা অনুরূপ কোন চিন্তাধারাকে মনের পটভূমিকাতে বসাতে না পারা গেলে কবিতার ভবিষ্যৎ নেই। প্রকৃত সাহিত্যকে "ব্রহ্মাস্বাদসহোদর" মনে করার মত তুরীয় ভাব আধুনিক কবির পক্ষে সম্ভব নয়। "যেন শুক্লীকৃতা হংসাঃ, শুকাশ্চ হরিতীকৃতাঃ, ময়ূরাশ্চিত্রিতা যেন"—বলে যে পরম রূপদক্ষের বর্ণনা করা হয়েছে তার প্রেরণা আর তাকে স্পর্শ করে না। তা ছাড়া পশ্চিমের যে সংস্কৃতির প্রতিফলিত ভাতি দেখে আমরা মুগ্ধ, যা অনুকরণ ও আমাদের সমাজে, সাহিত্যে সংযোজনের জন্য আমরা ব্যস্ত, সেই সংস্কৃতি এখন ব্যাধিগ্রস্ত। যে মহাযুদ্ধ সভ্যতার সমাধি হবে বলে বহুবার শোনা গিয়েছিল, সে যুদ্ধ আজ হাজির হয়ে গেছে। বর্বরদের হাতে রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংসের পর অবশ্য কয়েকজন পুরোহিত প্রাচীন সভ্যতার ভগ্নাংশকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। এ যুদ্ধের পরও হয়তো সেরকম কিছু ঘটতে পারে; কিন্তু দেশের মাটির সঙ্গে সংস্কৃতির যোগ না থাকলে তার প্রাণশক্তি লুপ্ত হতে বাধ্য। সে যোগ ছিল না বলেই নাৎসিরা জার্মান সাহিত্যিকদের উপর অবলীলাক্রমে নির্যাতন করতে পেরেছিল, "নিছক আর্টিস্ট"-এর বোরখাও তাঁদের বাঁচাতে পারে নি। সমসাময়িক ইতিহাসকে অবজ্ঞা করে নিজেদের মুক্ত পুরুষ ভেবে আত্মতুষ্টি নিয়ে আর কতদিন চলবে—এ প্রশ্ন তাই কবিরাও তুলতে সুরু করেছেন। অস্থির, অশান্ত, জিজ্ঞাসু জীবন থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়লে রূপসৃষ্টিও যে প্রাণহীন হবে, তা তাঁরা বুঝছেন।

All the poet can do today is to warn
That is why the true poet must be truthful.

ওয়েনের এ-কথা তাঁদের কানে আর এখন অর্থহীন ঠেকতে পারে না। বর্তমানকে বর্জন করলে, যুগধর্মকে প্রত্যাখ্যান করলে একমাত্র উপায় হচ্ছে প্রাচীনের মহিমা পুনঃপ্রচার করা আর নিজেকেই জ্ঞাতসারে মায়ামুগ্ধ করা—

Because these wings are no longer wings to fly
But merely vans to beat the air

The air which is now thoroughly small and dry
Smaller and dryer than the will
Teach us to care and not to care
Teach us to sit still. (Ash Wednesday.)

এলিয়ট আমাদের অতীতজ অনুভূতির উপর মোহজাল বিস্তার করতে পারেন বটে, কিন্তু আমাদের মনকে ভোলাতে পারেন না যে তাঁর সাম্প্রতিক পলায়নীবৃত্তি সূর্যাস্তের বর্ণচ্ছটায় রূপায়িত হলেও সমাপ্তপ্রায় যুগেরই প্রকাশ, ভোলাতে পারেন না যে বর্তমান সংস্কৃতির বাস্তব ভিত্তি নানা ঐতিহাসিক কারণে শিথিল হয়ে আসার প্রধান সাক্ষ্য দিচ্ছে তাঁর কবিতা।

পশ্চিম থেকে বহু সম্ভার এনে মাইকেল আর রবীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতাকে সমৃদ্ধ করেছেন। আজও পশ্চিম থেকে আমদানি চলেছে —আমাদের কাছে তা ভাল লাগুক বা না লাগুক। তাই দেখি বাঙালী কবি উনিশ শতকের বিখ্যাত খেয়ালীদের "ঐশী অতৃপ্তি"-র নামকরণে আত্মগ্লানি ছাড়া কথা খুঁজে পান না। আধুনিক কবি বৈদগ্ধ্যের ভক্ত, প্রেরণা বলতে তিনি বোঝেন পরিশ্রমের পুরস্কার, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায় "বিশ্বের যে আদিম উর্বতার কল্যাণে গাছ এক দিন বাড়ার আনন্দেই আকাশের দিকে হাত বাড়াতো, সে উর্বরতা আজ আর নেই, সারা ব্রহ্মাণ্ড খুঁজে বীজ সংগ্রহ না করলে কাব্যের কল্পতরু আর জন্মায় না।" আধুনিক কবিতার দুরূহতার পশ্চিমী প্রতিরূপ রয়েছে, আর পশ্চিমেরই মত তার আবহওয়াতে আছে শূন্যতার, অবসাদের ভাব—সবই যেন অনিশ্চিত, সবই নিরর্থক, আশা আর ছলনায় প্রভেদ নেই, উদ্যম—অহমিকারই রূপান্তর। আধুনিক কবিতায় আছে একদিকে ছন্দের যন্ত্রকৌশল বর্জন, অন্যদিকে ছন্দের বৈচিত্র্য নিয়ে দুঃসাহসী পরীক্ষা। তা ছাড়া আছে সাম্যবাদের ধুয়ো —ভালো মন্দ-মাঝারি গলায় আধুনিক কবিরা বিপ্লবের আগমনী গেয়েছেন।

এ পশ্চিমী প্রভাব অনেকের মনোমত নয়, কিন্তু আমাদের বর্তমান অবস্থায় এ প্রভাব যে স্বাভাবিক, তা অকাট্য, আর এ প্রভাব গৃহীত

হয়েছে এই কারণে যে সকল দেশের কবি আজ স্বীকার করছেন, হয়তো অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বীকার করেছেন যে, শিল্প ও সাহিত্যকে অভেদ্য বেড়া দিয়ে জীবন থেকে নিঃসম্পর্কিত করে রাখা আর চলছে না। অবশ্য ভালেরির মত শ্রদ্ধেয় কবি বলেছেন যে ইতিহাসের বালাই মন থেকে মুছে ফেলে নিজেদের "Ivory tower" থেকে রূপসৃষ্টিই একমাত্র উপায়। কিন্তু এ কথার মধ্যে যেন একটা অস্বস্তির স্বীকৃতি রয়েছে যে ইতিহাস নিয়ে খেলা চলে না, আর কবিশেখরের নির্জন দুর্গও "আকাশস্থ বায়ুভূতো নিরালম্ব নিরাশ্রয়ঃ" কিছু হতে পারে না। কবিজীবনের প্রথম দিকে কবি য়েটস্ বলেছিলেন—

> Come away, O human Child !
> To the waters and the wild
> With a faery, hand in hand,
> For the world's more full of weeping than
> You can understand.

শেষ জীবনে "The Herne's Egg"-এ আবার তিনি বাস্তবস্পর্শ-শূন্য উদ্ভট কল্পনার চূড়ান্ত করেছিলেন। কিন্তু এ-দুই পর্যায়ের মধ্যে নিজের সঙ্গে অনেক ঝগড়া করে তিনি বস্তুজগত আর কল্পজগতের ব্যবধান দূর করার চেষ্টায় ছিলেন, আর সেই চেষ্টা তাঁকে অনবদ্য কবিতা লিখিয়েছিল। Parnassian, Symbolist, Naturalist—সকলেই চেয়েছিল আর্টিস্টের স্বয়ম্বশ স্বাতন্ত্র্য, চেয়েছিল কবিতাকে দৈনন্দিন জীবনের মালিন্য ও অশুদ্ধি থেকে সরিয়ে অধিষ্ঠিত করতে এক সুরম্য শূন্যদেশে যেখানে বস্তবতা একেবারেই অস্পৃশ্য। কিন্তু যাকে রেণাঁ বহুদিন আগে বলেছিলেন ছায়ার ছায়া আর খালি শিশির উবে যাওয়া গন্ধ, তা নিয়ে আত্মরতি যে অসহ্য তার সাক্ষ্য আমাদের কবিরা দিচ্ছেন। কিন্তু এ আবিষ্কার আবিষ্কারমাত্র থেকে গেছে বলে সুধীন্দ্রনাথের মত নিঃসন্দিগ্ধ কবিও অনুভব করছেন যে তাঁর পরিচিত বিশ্বকে দৈব ছাড়া আর কেউ বাঁচাতে পারে না। তিনি শুধু দেখছেন যে সভ্যতার স্টীম রোলার যেন চিরকালের কীর্তি-স্তম্ভগুলোকে ভেঙে-চুরে দানবীয় গতিতে এগিয়ে চলেছে, আর দুঃসাহসী কবি রয়েছেন

সৌন্দর্যের দরজা আগলে। “তার কণ্ঠ হয়তো ক্রোধে ও ক্ষোভে কর্কশ। ভয় ভুলতেই সে হয়তো চেঁচিয়ে সারা। কিন্তু আসন্ন প্রলয়ের প্রখর কোলাহল ছাপিয়ে উঠেছে একা তারই বাণী। অতএব সে আমাদের নমস্য, রাহুগ্রস্ত হলেও সে আমাদের নমস্য” (স্বগত)। কবির বিবেককে তুষ্ট করতে হলে যদি এই সিদ্ধান্তে নোঙর ফেলতে হয় তা হলে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, বর্তমান বিশ্বের সংক্রামক ব্যাধির তাড়নায় মন অনড় হয়ে পড়ে, চাঞ্চল্য পরিণত হয় শুধু নিষ্ফল ক্ষোভে, সে ক্ষোভকে জ্বলন্ত খড়েগর মতো ব্যবহার করবার স্পৃহা পর্যন্ত জাগ্রত হয় না, প্রলয়ের কোলাহল ছাপিয়ে নতুন যুগের নবসৃষ্টির পদধ্বনির বদলে শুনতে হয় কবির নিজের হতাশ ক্ষীণ বাণী, বলতে হয়—

মৃত্যু, কেবল মৃত্যুই ধ্রুব, সখা,
বেদনা, শুধুই বেদনা সুচির সাথী। (অর্কেষ্ট্রা)

যুগধর্মকে প্রত্যাখ্যান করে এলিয়ট আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয় নিয়েছেন এক বাতাহত শৈলের ছায়ায়, “rock” এর ওপর বীজ পড়লে সূর্যরশ্মিও তাকে প্রাণ দিতে পারে না জেনেও ক্যাথলিক চার্চকে বরণ করেছেন, তাই কবিতার কাছে প্রায় বিদায় নিতে গিয়েও তিনি বলতে পেরেছেন—

Consequently; I rejoice having to construct somethin
Upon which to rejoice

সুধীন্দ্রনাথ যুগধর্মকে অস্বীকার করতে পারেন নি, বিশ্বাসবলে কৃষ্ণপ্রাপ্তি তাঁর মনঃপূত নয়, সাধ্যায়ত্ত নয়, তাই তাঁর কাছে—

মানুষের মর্মে মর্মে করিছে বিরাজ
সংক্রমিত মড়কের কীট ;
শুকায়েছে কালস্রোত, কর্দমে মিলে না পাদপীঠ।

“Heartbreak House” তাঁর আবাস—“This strangely happy house, this agonising house, this house without foundations”—আর মৃত্যুর সুরে তাঁর কবিতা অনুরণিত—সে মৃত্যু যেন মড্ বডকিনের ভাষায় “Death without moral, legal and social implications !” সমাজস্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানের

যাঁর অভাব নেই, সেই ছন্দস্বচ্ছন্দ, সংস্কৃতিসমৃদ্ধ কবি কি এভাবে নিজেকে ব্যাহত করেই চলবেন?

আজ যাঁরা আমাদের শ্রেষ্ঠ কবি তাঁদের লেখার পিছনে নানা সুরে, নানা ভঙ্গিতে, নেতিবাদের ঔদ্ধত্যের মধ্যেও রয়েছে হপ্‌কিনসের প্রার্থনা—"Mine—O thou lord of life, send my roots rain !" এলিয়টের The Waste Land এর ধুয়াও হচ্ছে তাই। আর সেই সঙ্গে রয়েছে ওয়েনের যুদ্ধক্ষত মনের বেদনা—

Was it for this the clay grew tall ?
—O what made fatuous sunbeams toil
To break earth's sleep at all ?

আধুনিক কবিতা যে দুরূহ, তাতে কোন সন্দেহ নেই, আর তার প্রধান কারণ আধুনিক মনের অপ্রকৃতিস্থ জটিলতা। কিন্তু কবি নিশ্চয়ই আশা করতে পারেন যে পাঠক আসবেন সহানুভূতি নিয়ে, বৈরিতার লগুড় নিয়ে নয়। আর যে প্রাক্তন কবিতার মহত্ত্ব এখন অনস্বীকার্য, তা যে সর্বদা সহজে বোধগম্য তা একেবারেই নয়। ধ্বনি-মাধুর্য—শুধু শব্দার্থ নয়, শব্দের আবেগ ও সমাবেশ—কাব্যরূপের অপরিহার্য অঙ্গ বলে হয়তো কোলরিজের কথায় অনেকটা সত্য আছে যে—"Poetry gives most pleasure when only generally and not perfectly understood." আজকের কবিতার প্রসঙ্গ প্রায়ই বিভ্রান্ত বলে তার রূপেও যে প্রসঙ্গের প্রতিফলন পড়বে, তা স্বাভাবিক।

সকলে মিলে যখন গান করেছে, নৃত্য করেছে, উৎসব করেছে, তখনই কবিতার সৃষ্টি—প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে, নয় সহযোগিতার ক্ষেত্রে, "The cadence of consenting feet"-এর মধ্য দিয়ে। বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজ সে সহযোগিতার প্রতিকূল। উনিশ শতকের শিল্পবিপ্লবের পর থেকে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ হয়েছে নির্লজ্জ স্বার্থের সম্বন্ধ। তাই কবি ক্রমে সমাজ-জীবন থেকে সরে গেছেন, স্কাইলার্ক বা নাইটিংগেল সেজে গোপন গহ্বর থেকে গান গেয়েছেন, আর বোধহয় শুধু কাব্যের ঐতিহ্য ভুলতে না পেরে নিজেদের

"Unacknowledged legislators" আখ্যা দিয়েছেন—স্মরণ করেন নি যে জীবননিরপেক্ষ সজ্জাই তাঁদের legislation-কে "Unacknowledged" অবস্থায় রেখেছে। ভিক্টোরীয় যুগে কবি জীবন থেকে সাময়িক অবসর গ্রহণ করে "The meditative lucidity of a waking dream"-এ আশ্রয় খুঁজছেন। আজ আর কবির সে আশ্রয়ও নেই, ক্ষুব্ধ ক্ষুধিত পৃথিবীতে থেকে নিরালায় ভজন পূজন সাধন আরাধনা পর্যন্ত অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তাই কবিদের বক্তব্য হয়েছে অরাজক, কামনার অনল নির্বাপিতপ্রায় হয়েছে, আর ক্ষতিপূরণ হিসাবে তাঁরা বিষ্ণু দে-র মত কবিতার সূক্ষ্মাংশকে অনবদ্য করার চেষ্টায় লেগেছেন, প্রত্যেক রন্ধ্র পূরণ করেছেন কবিতার অষ্টধাতু দিয়ে। অর্থঘনত্বের প্রয়াস আর সংযমের আতিশয্য বিষ্ণু দে-র কবিতায় বিশেষ লক্ষ্য করা যায়; সে প্রয়াসে তিনি আশ্চর্য সাফল্যও লাভ করেছেন। কিন্তু আজকের ক্রূর পৃথিবীতে মনীষা ও প্রজ্ঞার যোগ্যস্থানের অভাব দেখে আত্মসমাহিতিক্লান্ত মন বিচলিত বলে তাঁর কবিতা যেন জীবনকে খণ্ড, ক্ষুদ্র করে দেখছে, তাঁর ব্যাঙ্গোক্তি পর্যন্ত যেন তিক্ততাকেও মোহনীয় করতে চায়, সমাজব্যাধি উন্মূল করা সম্বন্ধে মন স্থির করে নি। এলিয়ট-পাউণ্ডের তিনি ভক্ত, কিন্তু তাঁর স্মরণ রাখা উচিত যে পাণ্ডিত্য কবিতাকে গুরুত্ব দেয়, মহত্ত্ব দিতে পারে কিনা সন্দেহ। তবে এ আশা হয়তো সমীচীন যে "ঘোড়সওয়ার" ও "পদধ্বনি"-র লেখক একক অতৃপ্তির দৃষ্টিকোণ ছেড়ে আসছেন। সম্প্রতি যে অবিকল্প ভঙ্গী ও প্রসঙ্গ তাঁর লেখায় দেখা দিয়েছে তাতে ভরসা হয় যে মাত্র কয়েক-জনের জন্য ইঙ্গিতবহুল ভাষা বর্জন করতে তাঁর কবি বিবেক আর বাধা দেবে না।

সাম্যবাদী কবিতা আজকাল বাংলাদেশে অনেকে লিখতে শুরু করেছেন, কিন্তু তাঁরা যদি সকলেই কবি না হন, তো আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তাঁরা "যে কর্তব্যবোধের প্রবর্তনায় গোলদিঘি থেকে সুদূর পল্লীগ্রাম পর্যন্ত সভাসমিতি করে বেড়ান, দৈনিক সাপ্তাহিক কাগজে প্রবন্ধ লেখেন, জেল খাটেন", সেই প্রবর্তনায় যে কবিতা লিখতে পারবেন না, এমন কথা কেউ জোর গলায় বললে অন্যায়

করবেন। সমাজতত্ত্বজ্ঞান সরেশ না হলে কবির কবিতাও যে নিরেশ হবে এমন কথা কেউ বলছে না; বুদ্ধিমান মার্কস্‌পন্থী না হলে যে কেউ কবি হতে পারে না, তা বলার মানে বুদ্ধিভ্রংশ; মার্ক্‌স্‌পন্থা যে কাব্যরাজ্যেরও পাসপোর্ট, তাও বলা হচ্ছে না। কিন্তু এ কথা স্বতঃসিদ্ধ হওয়া উচিত যে বর্তমান যুগে ধনতন্ত্রের মুমূর্ষু অবস্থায় পুরোনো রাস্তায় সংস্কৃতিবিকাশের আশা নেই বুঝলে—যে অভিজ্ঞতা হচ্ছে আর্টিস্টের উপকরণ, সে অভিজ্ঞতার রং আর প্রকৃতিও বদলাতে বাধ্য। আর্টিস্ট কর্মিষ্ঠ না হতে পারেন, কিন্তু অভিজ্ঞতার অনুভূত আর প্রকাশ তাঁর ব্যবসা। তাই বোঝা শক্ত যে—

যব্‌ গোধুলি সময় বেলি ধনি মন্দির বাহির ভেলি
নব জলধরে বিজুরি রেহা দ্বন্দ্ব পসারিয়া গেলি।

—হচ্ছে নিঃসংশয় কাব্যানুভূতি, আর আজকের বিক্ষুব্ধ সমাজে চটকলমজুরদের ধর্মঘট বা কিষাণ জমায়েতের কোন বিশেষ ভঙ্গিমা, কবিক্ষমতা যাঁর আছে, তাঁর কাব্যানুভূতির সরঞ্জাম নয়। অবশ্য "Mine be the dirt and the dross, the dust and the scum of the earth." বলে পতিতের বন্দনা প্রচার করলেই সাম্যবাদী কবিতা লেখা হবে, তা আশা করাই অন্যায়। কারও হুকুমে রাতারাতি প্রলেটেরিয়ন আর্ট এদেশে দেখা দেবে ভাবা হচ্ছে বাতুলতা। ঐতিহ্যের শক্তি যেখানে বেশী, সেইখানে কাব্যরূপান্তরে বিলম্ব ঘটতে বাধ্য। তাই Proletcult আন্দোলনকে লেনিন বলেছিলেন "bunk" আর ১৯২৫ সালে রুশদেশের সাম্যবাদী দল প্রস্তাব করেছিল: The party must fight against all thoughtless and contemptuous treatment of the old cultutal heritage as well as of literary specialists........It must also fight against a purely hot-house proletarian literature." সাম্যবাদী আন্দোলন যতই এ দেশে দৃঢ়মূল হবে, ততই দেখা যাবে যে কবিদের অভিজ্ঞতা প্রেমের প্রয়াস আর দখিন হাওয়া আর অসামাজিক ব্যবহারের মধ্যে কবিতার মালমসলা সংগ্রহ করার ব্যর্থ চেষ্টাকে অতিক্রম করবে।

সার আর্থার কুইলার-কুচ্‌ একবার হিসেব করে বলেছিলেন যে গত শতাব্দীর প্রধান ইংরেজ কবিরা প্রায় সকলেই ধনীবংশে জন্মে-ছিলেন ; একমাত্র কীট্‌সের অবস্থা খুব ভাল ছিল না। মহৎ লেখকের যে পরিবেশ প্রয়োজন, তা সাধারণ ইংরেজের অনধিগম্য ; আড়াই হাজার বছর আগের এথীনিয়ন ক্রীতদাসের এ বিষয়ে যতটুকু স্বাধীনতা ছিল, উনিশ শতকের ইংরেজেরও তার বেশী ছিল না। আজও নেই। আমাদের দেশের কবিরা যে ঐ দিক থেকে এখানকার বহুগুণ অপকৃষ্ট অবস্থার কথা ভাববেন না, তা অসম্ভব। বর্তমান সমাজের মেরুদণ্ড-হীনতা আর শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বিড়ম্বনা দেখে কবিরা বিচলিত বলেই তাঁরা দেশের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহিত্যের আশা খুঁজে পাবেন, এ কথা মনে করা নিশ্চয়ই অন্যায় নয়। এ কথাকে যদি কেউ সাহিত্যের অপতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বলে উপহাস করেন, তো উপায় নেই।

আধুনিক বাংলা কবিতায় এক এক সময় দেখা যায় যে কবির সমাজচৈতন্য বেড়েছে, দৃষ্টিভঙ্গি বদলেছে, কিন্তু ভাষায় ও ভাবের ঐতিহ্য অনস্বীকার্য বলে কবিতায় স্পষ্টতা নেই, কঠোরতা আছে। এ হচ্ছে অবশ্যম্ভাবী ; কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রেও জ্ঞান হচ্ছে শক্তি, আর সমাজবোধের স্বচ্ছন্দে বহন করার ভাষাকে কবিরাই তৈরী করবেন। জীবনের নূতন পর্যায়ের সঙ্গে প্রাক্তন প্রকাশভঙ্গির মিলন তখনই সম্ভব হবে যখন কবিচিত্তে সমাজবোধ অনুভূতির স্তরে উপনীত হবে। তাই এখনও ভাববিলাসী ধারায় ভাল কবিতা লেখা অসম্ভব নয়। এখনও রবীন্দ্রনাথ যখন হঠাৎ দেখে ফেলেন যে সৌন্দর্যের কল্পরাজ্যে আকবর বাদশা আর হরিপদ কেরানীর মধ্যে কোন প্রভেদ নেই, তখন মনে হয় যে শুধু ভাষায় নয় ভাবেও আর্ষপ্রয়োগের অধিকার তাঁর আছে। তাই বুদ্ধদেব বসুর গদ্য প্রবন্ধে আত্মজিজ্ঞাসা প্রকট হলেও তিনি (এবং পাঠক সমাজে অপেক্ষাকৃত অল্প পরিচিত কয়েক-জন কবিও) এখনও এমন আত্ম-অচেতন খেয়ালী কবিতা লিখতে পারছেন, যাকে সমাজবুদ্ধ আধুনিক মনও অস্বীকার করতে পারে না।

নিষ্কপট ভাববিলাসকে অশ্রদ্ধেয় বলার লোভ সম্বরণই করা উচিত, আর স্বভাবজ ভাববিলাসের দ্রুত বিপর্যয়ের ফলে ভূরি ভূরি সাম্যবাদী

রূপক ব্যবহারের প্রতি নির্মম ঔদাসীন্যও অহেতুক। কিন্তু সমর সেন বা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতো সাম্যবাদী কবি হিসাবে যাঁদের পরিচিতি, তাঁদের কবিযশ এখনই ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে বলে তাঁরা যেন প্রতি সাম্যবাদীর প্রতিপাদ্য—অনুশাসন কবিতার ক্ষেত্রে অচল মনে না করেন। সমর সেনের কাছে অভিযোগ করলে অন্যায় হবে না যে তাঁর লেখায় এক এক সময় সত্যই নৈরাশ্যের একটা বিকৃত সুর বেজে ওঠে, আর তাঁর অনুরাগীদের মনে সন্দেহ হয় যে হয়তো তিনি প্রায় আড়চোখে আর্তসমাজের দিকে তাকিয়ে শুধু বহুজনের ব্যক্তিগত বিপত্তির ভিত্তিতে কাব্য রচনা করছেন, মার্কস্-পন্থীর পক্ষে যা অকর্তব্য। ('অকর্তব্য' কথাটিতে তিনি অন্ততঃ গুরুমশায়ী সুর পেয়ে বিরক্ত হবেন না, আশা করি)। পুরানো পৃথিবীর ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ার আগে সে পৃথিবীকে গণশক্তিবলে ধ্বংস করার ঔচিত্য সম্বন্ধে নিশ্চিতি তাঁর বা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখায় যেন পাওয়া যায় না। বিপ্লবী মনোভাবকে আত্মস্থ না করাতে তাঁদের কবিক্ষমতা কি ত্রিশঙ্কু-রাজ্যেরই প্রতিভূ হয়ে থাকবে? সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখার নানা গুণ সত্ত্বেও দেখা যায় যে অনেক সময় তাঁদের কাব্য-প্রসঙ্গ ও প্রকরণের সঙ্গে বিপ্লবী সিদ্ধান্তের সঙ্গতি নেই, সে সিদ্ধান্তকে যেন ক্রোড়পত্র করে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। অরুণ মিত্রের "লাল ইস্তাহারের" ক্ষুদ্র পরিধিতে যে অবৈকল্য আছে, তার সন্ধান ঐ দুই কৃতী কবির লেখাতেও দুর্লভ।

আধুনিক বাঙালী কবিরা যদি সমাজজীবনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন, জগতের মৌলিক পরিস্থিতির বহু পর্যায় থেকে অনুভূতি সংগ্রহ করে কবিলিপিতে প্রকাশ করতে পারেন, তাহলেই তাঁদের চেষ্টা সার্থক হবে। বিদগ্ধজনের মনোরঞ্জন যে তাঁদের উদ্দেশ্য হতে পারে না, তা তাঁরা বুঝেছেন। কিন্তু এ যুগের অগ্রগতির ও উৎকর্ষের সব পথ আপাতদৃষ্টিতে বন্ধ মনে হয় বলে এ পরিস্থিতির অসহনীয়তা মাত্র নিয়ে কাব্যসৃষ্টিতে যদি তাঁরা তুষ্ট হন তো তা একরকম আত্ম-ঘাতই হবে।

অনেকে হয়তো ভাবেন যে সাহিত্যক্ষেত্রে সমাজতাত্ত্বিকের

অনধিকার প্রবেশকে বরদাস্ত করা উচিত নয়, বিশেষতঃ যখন আর্থনীতিক সমস্যার সমাধান হলেও মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্বন্ধ নিয়ে যে সমস্যা তার সমাধান হবে না, সে সমস্যা সনাতন, অচঞ্চল, অভেদ্য। কিন্তু আসলে মানুষ ও মানুষের সম্পর্কের চেয়ে বিজ্ঞান তাড়াতাড়ি বদল করে দিচ্ছে মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক। অবশ্য ফ্রয়েড্ যাকে বলেছেন "সভ্যতার বোঝা", তা সর্বযুগেই মানুষকে বহন করতে হয়েছে; সাম্যবাদ এলে সে বোঝা যে এখনই সরে যাবে, তা মনে করা ঠিক হবে না। কিন্তু সে বোঝা আজ অসহ্য বলেই, নতুন সমাজের কথা কবিকে ভাবতে হয়েছে। তাই কবির কাছে আহ্বান যাচ্ছে আর্ট্‌কে ব্যবহার করতে অস্ত্ররূপে, যে অস্ত্র হবে সর্বব্যাপ্ত রৌদ্রের নির্বিশেষ আভরণে দীপ্ত। কবি বুঝছেন যে বিপ্লব যখন আগত বা আসন্ন, তখন আর্টের চেহারা বদলাবে। সে চেহারা হয়তো মনোরম নয়। কিন্তু সামাজিক সমস্যার নির্বন্ধ লঘু না হওয়া পর্যন্ত কবিতার নতুন মূর্তি আমাদের কাছে প্রকট হবে না। আধুনিক কবিতার অসমান কৃতিত্ব আর সংশয়ী অতৃপ্তি দেখে নিরাশ হবার প্রয়োজন নেই: "All is well; it must be worse before it is better."

আধুনিক বাংলা কবিতার এই সঙ্কলন আমরা দু-জনে মিলে করেছি। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে বহু পার্থক্য আছে বলে সস্তা বাহাদুরীর অভিযোগ অসম্ভব নয় জেনেও আমরা আলাদা ভূমিকা লিখেছি।

কয়েকজন খ্যাতনামা কবিকে আমরা বাদ দিয়েছি; তাঁদের লেখায় আধুনিক ভাব বা ভঙ্গির সন্ধান পাই নি বলে। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতা যে অবজ্ঞেয় নয়, আর অন্ততঃ কয়েকজন নিঃসন্দিগ্ধ কবি যে আসন্ন সমাজবিপ্লবের কথা ভেবে কবি ও নাগরিকের মধ্যে কৃত্রিম ব্যবধান দূর করার দুস্তর প্রয়াসে লেগেছেন, আশা করি এ সঙ্কলনে তার পরিচয় মিলবে; কীর্তনানন্দে মাতোয়ারা আর অন্ধ বাউলের অন্ধদৃষ্টিতে মুগ্ধ এই দেশে সাহিত্য যে গ্রাম্যতা ও কৃত্রিমতার উভয় সঙ্কটকে বর্জন করতে অক্ষম হবে না, সে ভরসার কিছু হেতুও পাওয়া যাবে।

বাংলা কবিতা ও বিষ্ণু দে

প্রধানত রবীন্দ্রনাথের প্রসাদে বাংলা কবিতা কয়েক দশক ধরে প্রকৃত পরিণতির স্তরে উপনীত হয়েছে। সেই পরিণতিকে নব নব উন্মেষে যাঁরা সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের মধ্যে বিষ্ণু দে একজন অগ্রণী। তাঁর "শ্রেষ্ঠ কবিতা" যে সংকলিত হয়েছে, এটা আমাদের সাহিত্যে একটা রীতিমতো ঘটনা।

বাংলা সাহিত্যের আদিযুগে যখন কবিতার আবির্ভাব হয়েছিল, তখন তাতে ছিল এদেশের মাটির স্নিগ্ধ স্বাদ—যে স্বাদের তারিফ বহুকাল পরে এমার্সন করেছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গে। তারপর বৈষ্ণব কবিদের রচনায় গূঢ়ার্থবাদকে অনায়াসে ভেদ করে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ কবিতাকে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করল। মুকুন্দরাম, কাশীরাম, কৃত্তিবাস, ভারতচন্দ্র পর্যন্ত দেশজ আবেগ ও সহজ বুদ্ধির সুঠাম ছাপ সুস্পষ্ট, কিন্তু যে ঔজ্জ্বল্য ছিল নগরসভ্যতার আনুষঙ্গিক ও সুশোভন সজ্জা, তখনও তার লক্ষণ দুর্লভ। পাশ্চাত্ত্য শক্তির ধাক্কায় আমাদের জীবনে যে নতুন ব্যাঘাত এসে হাজির হল তার দ্বিমুখ প্রকোপে সাহিত্যে এল অজ্ঞাতপূর্ব বিচলিতি, যার ইঙ্গিত ঈশ্বর গুপ্ত কিম্বা এমনকি দাশু রায়েও লক্ষ্য করা যায়। প্রভূত প্রতিভার সম্ভাবনা অথচ প্রকৃত প্রতিভার অভাবের ভার বইতে হয়েছিল বলে ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় থেকে গেল একপ্রকার বঞ্চনা। নতুন জীবন অগ্রাহ্য আর প্রাচীন জীবন ছিন্নমূল—এই উভয়সংকটে পড়ে বাঙালীর প্রাণান্ত হল। সাহিত্যে যেন একটা ছেদ পড়ে গেল—পথের নিশানা প্রাচীনপন্থীরা দেখতে পারলেন না, কিন্তু নবীনপন্থীদের অভ্যুদয় তখনও হয় নি।

বিলিতী মদের নেশার মত ইংরেজ প্রভাব কিছুকাল শিক্ষিত বাঙালীর মাথায় চড়ে গিয়েছিল। তার পুরো ঝোঁক যখন কাটল, তখন এক ধরনের স্থৈর্য তাদের মনে আসে। এই স্থৈর্য কিন্তু ছিল অনিশ্চিত—কথাটা হেঁয়ালি, কিন্তু তা স্পষ্ট হবে যদি আমরা মনে রাখি যে মাইকেল মধুসূদনের মতো যাঁর প্রতিভা ছিল বিরাট তাঁকে এই

টানাপোড়েনে ভুগতে হল সবচেয়ে বেশি। নিজের সত্যপথ তিনি নির্মাণ করতে পারলেন না, কিন্তু করার জন্য প্রাণান্ত প্রচেষ্টায় ত্রুটি তাঁর হয় নি। আর সেই প্রচেষ্টারই ব্যপদেশে বাংলাকাব্যে তিনি আনলেন বিপুল বদল। তাঁর আগে প্রায় সব বাঙালী কবি নিজেদের "মেটে ঘরে শ্রীবৃন্দাবন" কল্পনা করেই শ্রীহরির আগমনে রোমাঞ্চিত হতেন, কিন্তু মাইকেল প্রথম সেই "মেটে ঘর" বর্জন করে বিদগ্ধ রাজকীয়তাকে বাংলাকাব্যে আসন দিলেন, গতানুগতিকতা পরিহার করে ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ আর তার দশানন জনকের অনস্বীকার্য মহিমায় মুগ্ধ হলেন, কৃষ্ণের লীলা যে বৃন্দাবনের চেয়ে দ্বারকা ও কুরুক্ষেত্রে অনেক বেশি, তারই আভাস দিলেন। বাংলা কবিতায় এল ভাস্বর, উদাত্ত তেজ—মমতার সিঞ্চনেও তার দার্ঢ্য খণ্ডিত হল না।

তার পর এলেন রবীন্দ্রনাথ, দিগন্ত উদ্ভাসিত করে তাঁর অজর লেখনীর কিরণ বিচ্ছুরিত হল—প্রাচীন ও অর্বাচীন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, সর্ববিধ রসভাণ্ড থেকে মধু আহরণ করে গৌড়জনকে তিনি পরিবেশন করলেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তিনি প্রজাপতি ব্রহ্মা—সর্বোপরি তাঁরই বর্ণাঢ্য পক্ষবিস্তারে বাংলা রচনার সুবিচিত্র সৌন্দর্য সূচিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণভার এতই বিপুল যে তাঁকে আমরা দান বলেই আত্মসাৎ করেছি, ঋণ পরিশোধের দম্ভ রাখি নি। কিন্তু রূপাঞ্জন শলাকা দিয়ে আমাদের মনশ্চক্ষুকে উন্মীলিত করেছেন বলে রবীন্দ্রনাথ যেমন আমাদের গুরু, তেমনি আবার অমিত প্রতিভার ছটায় মোহাবিষ্ট করেছিলেন বলে মোহভঙ্গেরও আমাদের প্রয়োজন ছিল। একদা তাই রবীন্দ্রনাথের প্রদর্শিত পথ বর্জনের ব্যগ্রতা নিয়ে যে কথঞ্চিৎ অবিমৃষ্যকারী প্রচেষ্টা হয়েছিল আমাদের কাব্যক্ষেত্রে তা একেবারেই অসার্থক হয় নি। মনীষীশ্রেষ্ঠ কার্ল মার্ক্‌স্‌ একবার বলেছিলেন: Thank God I am no Marxist!" শিষ্যদের গরুড়সুলভ ভজনপ্রবৃত্তি বোধ হয় রবীন্দ্রনাথেরও মনে অনুরূপ বিরক্তি সঞ্চার করেছিল। যথার্থ শ্রদ্ধা নিয়ে তাঁর অপরিমেয় অবদান সম্বন্ধে সজাগ থেকেই স্বতন্ত্র পথে বাঙলা কবিতাকে প্রবাহিত করার

কামনা অপরাধ নয়, বরঞ্চ কর্তব্য বলেই প্রকৃত লেখকের মনে হওয়া অনিবার্য।

কিন্তু "স্বতন্ত্র" বলতে সম্পূর্ণ নিজস্ব ভাব ও ভঙ্গির কল্পনা যাঁরা করেছিলেন, তাঁদের ব্যর্থতা ঘটেছে নিতান্ত সঙ্গত কারণেই। ইতিহাস-বোধ যদি না থাকে তো তার মূল্য কবিকেও দিতে হয়। বায়ুভূত ও সুরভিত নৈঃসঙ্গ্য সত্য নয়, সার্থকও হতে পারে না। বাংলার কবিকাহিনী যে পরম্পরা সৃষ্টি করেছে, যে পরম্পরাকে রবীন্দ্রনাথ ষড়ৈশ্বর্যে ভূষিত করেছেন, তাকে অস্বীকার করার চেয়ে সাহিত্যিক প্রত্যবায় আর নেই।

দীর্ঘ হলেও এ ভূমিকার প্রয়োজন রয়েছে, কারণ বহু সতীর্থের তুলনায় এই পরম্পরা সম্বন্ধে সমধিক জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি বিষ্ণু দে-র কবিচেতনাকে সমুজ্জ্বল করেছে, আর তাঁর কবিতা এই পরম্পরাকে পশ্চাৎপটরূপে রেখেই বিচার করা চাই। ইতিহাসবোধের দিক থেকে কোন লেখকেরই চেয়ে তিনি ন্যূন নন। বাংলা কবিতার ঐতিহ্য বিষয়ে তাঁর অনুশীলন ব্যাপক ও গভীর। ইংরেজী—এবং কিয়ৎপরিমাণে ফরাসী—কবিতার আস্বাদ তাঁর কাছে শুধু সুপরিচিত নয়, অন্তরঙ্গ। তাঁর সম্বন্ধে বাংলা কবিতার পাঠকদের তাই প্রত্যাশা প্রচুর।

প্রত্যাশাকে তিনি অপরিতুষ্ট রেখেছেন কেউ বলবে না। মনের যে আপাতমধুর তরলতাকে আমরা সহজে অভ্যর্থনা করে এসেছি তার পরিবর্তে ভাবঘনত্ব কবিতায় প্রতিষ্ঠিত করে তিনি অনেকের কাছে দুর্নাম পেয়েও প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। আবেগকে প্রকাশ করতে হলে তাকে স্বচ্ছ প্রস্রবণ বা চকিত বিস্ফোরণের আকার দেওয়া কবিযশঃপ্রার্থীদের পক্ষে দুরূহ নয়। কিন্তু গভীর কথা বলতে গেলে যে গভীর সুরেরই প্রয়োজন আর সঙ্গীত-তরঙ্গের মধ্যে শ্রুতের চেয়ে অশ্রুতের মহিমা ও মাধুর্য যে কম নয়, এই বোধ সহজ জনপ্রিয়তাকে তুচ্ছ করে বাংলা কবিতায় সঞ্চার করার কাজে রবীন্দ্রোত্তর যুগে বিষ্ণু দে-র অবদান সর্বাগ্রে স্মরণীয়।

দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী ইংরেজী কবিতায় অশান্ত জিজ্ঞাসার যে অর্ধনিগূঢ় বাতাবরণ দেখা দিয়েছিল, তাকে বাংলা কবিতার বাচনপদ্ধতির

মধ্যে রূপায়িত করার প্রায় একক সাফল্য বিষ্ণু দে-র। সমসাময়িক ঘটনার সত্য মূল্যকে কাব্যরীতির সঙ্গে সুসমঞ্জস রেখে প্রকাশ করার বিশিষ্ট ও মোহন ভঙ্গি তিনি অর্জন করেছেন। লেখনী তাঁর অক্লান্ত; কোন কোন শক্তিমান কবি ঝোড়ো হাওয়ায় বালিতে-মুখ-গোঁজা উটপাখির মতো মাঝে মাঝে কর্ম থেকে অবসর নিয়েছেন। কিন্তু বিষ্ণু দে পরাজয় স্বীকার করেন নি। মহৎ কবির বহুগুণ সম্বলিত হয়ে তিনি কাব্যক্ষেত্রে বিরাজ করছেন; তাঁর কাছে কাব্যামোদীজনের ঋণ প্রভূত।

কারও শ্রেষ্ঠ কবিতা সঞ্চয়ন সম্পর্কে পাঠকদের মতদ্বৈধ অনিবার্য, কিন্তু কবি যখন স্বয়ং সঞ্চয়নের দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃত নন, তখন আপত্তি সম্পূর্ণ নিরর্থক। বিংশ বর্ষ ধরে যে সম্ভারের তিনি স্রষ্টা, তার পরিচয় এই কাব্যগ্রন্থে স্পষ্ট।

কিন্তু একথাও বলতে সংকুচিত নই যে প্রতিভার যে দ্যুতি তাঁর রচনায় বহুদিন থেকে লক্ষ্য করা গিয়েছে, তার অখণ্ড বিকাশে যেন কোথাও বাধা পড়েছে। এজন্য হয়তো কবিকে ততটা দায়ী করা ঠিক নয় যতটা দায়ী হল আমাদের বর্তমান জীবনব্যবস্থা। যেখানে সামাজিক পরিবেশ বহু ভিন্নধর্মী ধারার অস্বস্তিকর সহ-অবস্থানের ফলে জটিলতা ও নৈরাশ্যব্যঞ্জনায় দূষিত হয়ে রয়েছে, সেখানে কবির সংবেদনশীল মনে জর্জরতার পরিমাণ এত অধিক হওয়া প্রায় অনিবার্য যে মুক্তকণ্ঠে স্বচ্ছচিত্তে যুগবাণীকে কাব্যরূপ দেওয়ার চেয়ে সুকঠিন কর্ম কিছু নেই।

যে-সাহিত্যে কবিতার ঐতিহ্য স্বল্প ও শৈলীর বিকাশ নগণ্য, সেখানে বরং কৃতী কবির পথ সুগম, কিন্তু বাঙালী কবির সৌভাগ্য (ও দুর্ভাগ্য) এই যে আমাদের কবিতার পরিপ্রেক্ষিত বিচিত্র ও বর্ণাঢ্য —সার্থক রচনা সেখানে দাবি করে প্রগাঢ় অনুভূতির এমন ব্যঞ্জনা যা বাকবহুল নয়, যা অতি উচ্চ বা অতি অনুচ্চ তারে বাঁধা নয়, যা প্রকট বা প্রচ্ছন্ন পুনরুক্তিদুষ্ট নয়, যা মূলগতভাবে সর্বজনবোধ্য বলেই রুচি ও মূল্যজ্ঞানকে বিকৃত করার সম্ভাবনা রাখে না, যা সমসাময়িক বাঙালী মনের প্রকৃত কিন্তু হয়তো অচেতন স্বপ্নকেই প্রকাশ করে।

আমাদের পূর্বপুরুষেরা কাব্যরস সম্ভোগকে "ব্রহ্মাস্বাদসহোদর" বলে কল্পনা করেছিলেন; তার চেয়ে বড় দাবি তাঁদের পক্ষে সম্ভব

ছিল না। আমাদের আধুনিক দাবির সংজ্ঞা ও আধেয় অন্য হলেও মূলত অভিন্ন। সে-দাবি পূরণ করতে এখনও আমাদের কবিকুল অপারগ। বিষ্ণু দে-কেও এই অসামর্থ্যের দায়িত্বে অংশগ্রহণ করতে হবে।

সাম্প্রতিক বাঙালী কবিদের মধ্যে যাঁদের কাছে প্রত্যাশা ছিল বেশি, তাঁরা অল্পাধিক হতাশই করে আসছেন। মনে হয় যে প্রেমেন্দ্র মিত্র বুঝি স্বেচ্ছায় আর সুভাষ মুখোপাধ্যায় অনিচ্ছায় পথ হারিয়ে ফেলেছেন, আর ফেলে যে অন্তর্দাহে পীড়িত হচ্ছেন তার লক্ষণও দেখাচ্ছেন না। অবাধ্য নিয়তি সুকান্তকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, তাই উচ্চৈঃস্বরে যা সে বলতে চেয়েছিল, সে কথাকেই অবিকল কাব্যের চিত্তজয়ী ঐশ্বর্যে মণ্ডিত করার অবসর পর্যন্ত তার মিলল না। প্রথম থেকেই সর্বজন হতে অনপনেয় পার্থক্যবোধ সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে যেন প্রকৃত কাব্যসিদ্ধি থেকে বঞ্চিত করেছে। একদা খ্যাত বুদ্ধদেব বসু অপরিণতির জালে উর্ণনাভবৃত্তিতে সজ্ঞানেই সন্তুষ্ট থেকেছেন। গুণগ্রাহিতার অভাবে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের সুরপ্রধান কবিশক্তির স্ফূরণে অবিরাম প্রতিবন্ধক ঘটেছে। গণচেতনার প্রতিভূত্ব দাবি করে কয়েকজন কৃতী কবি দেখা দিয়েছেন বটে, মধ্যে মধ্যে মুগ্ধও হয়তো করেছেন, কিন্তু তাঁদের কণ্ঠে যাদু নেই, বাক্যচ্ছটায় সংযমের মহিমা নেই, পর্যবেক্ষণে গভীরতা নেই বলে অনুভূতিতে বঞ্চনা ও বিকৃতি প্রতীয়মান।

বিষ্ণু দে সম্বন্ধেও বলব যে তাঁর ক্রমান্বিত রচনাগৌরব আমার কাছে শ্রদ্ধেয় হলেও তাঁরই নিজের একান্ত অন্বিষ্ট সিদ্ধির নিঃসংকোচ লক্ষণ দেখি না বলে আমি ক্লিষ্ট।

প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে তিনি "ঘোড়সওয়ার"-এর মতো কবিতা লিখেছেন। "উর্বশী ও আর্টেমিস্" তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ; পরিচ্ছন্ন হাত, মার্জিত মন আর ঈষৎ পুলকিত আত্মশ্লাঘা ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। কিন্তু অচিরে "চোরাবালি" বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে এক নিঃসন্দিগ্ধ প্রতিভার আবির্ভাব সূচিত করল। তারপর "পূর্বলেখ" ও "সাত ভাই চম্পা" থেকে "নাম রেখেছি কোমল গান্ধার" পর্যন্ত তাঁর অশ্রান্ত পরিক্রমা চলেছে—নিদিধ্যাসনগুণে কবি যেন প্রাক্তন দ্বিধাবিভক্তিকে অতিক্রম করেছেন :

স্বপ্নে আজ চেতন অবচেতন
মুক্তপাণি, মনে জীবনে দ্বন্দ্ব
রক্তে তবু নীল গোলাপ বন।
স্বপ্ন আর মানে না কারাবন্ধ
বাগানে আর বাদায় বোনে ক্রান্তি
ত্রিকালে নাচে মুহূর্তের ছন্দ
মুঠিতে বাঁধে ঝঞ্ঝাময় শান্তি। ("অন্বিষ্ট" পৃঃ ৪৫)

বিষ্ণু দে-এর শ্রেষ্ঠ কবিতা বাংলা সাহিত্যে সৌম্য, সৎ, সচেতন গভীরতার অতি ক্ষীণ ধারাকে পুষ্ট করেছে, সন্দেহ নেই। বহু পাঠক অবশ্য অনুযোগ করবেন স্নিগ্ধতার অভাব সম্বন্ধে; কিন্তু বাঙালী রচনায় স্নিগ্ধতা প্রায়শই কাল হয়েছে। বহুতর অভিযোগ আসবে যে তাঁর রচনা-শৈলী স্বচ্ছ নয়, কিন্তু যে স্বচ্ছতা সুপ্রচুর আয়াসসাধ্য নয় তা অন্তত বাংলার কবিকুলের পক্ষে বর্জনীয়—অনায়াস কল্পনার রোমন্থনে আমাদের কাব্য কলঙ্কিত না হলেও ভারাক্রান্ত।

কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলে এমন হ্রদ দুরধিগম্য নয় যার জল গভীর অথচ সম্পূর্ণ স্বচ্ছ, পাতাল পর্যন্ত তার মৃদু তরঙ্গায়িত মধুরিমা সর্বজনের দৃষ্টি ও মানসের গোচর। কবিতা যখন সিদ্ধির সেই শৃঙ্গে আরোহণ করে, তখন গভীরতা ও স্বচ্ছতা পরস্পরের অনুসঙ্গ নিয়ে থাকে। সে কৃতিত্ব দুষ্কর ও দুর্লভ; তার উদাহরণ একান্ত অবশ্যম্ভাবীরূপে স্বল্প। এখনও বিষ্ণু দে-র রচনায় তার আবির্ভাব ঘটে নি। এখনও তাঁর কণ্ঠ স্বকীয় অনুভূতির গর্বেই যেন কথঞ্চিত স্তিমিত; এখনও তাঁর মুখ থেকে 'শৃন্বন্তু বিশ্বে'-র অমিত শ্লাঘা নিয়ে চলমান জীবনের মর্মবাণী নিঃসৃত হওয়ার লক্ষণ নেই; এখনও যেন তাঁর বিচরণপথে আছে শঙ্কা; এখনও পর্যন্ত অখণ্ড অনুভূতির অজর আনন্দ তাঁর লেখনী বিকিরণ করতে পারে নি।

কবি হিসাবে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছেই আমাদের সকল কামনা পূর্ণ হয় নি। অন্যে পরে কা কথা! কিন্তু তিনি ছিলেন বিচিত্রবীর্য, আর তাঁর অবদানের পরিমাণ ও গুণ মিলে এক অপরূপ সম্ভারের সৃষ্টি করেছে। তাঁরই উত্তরসাধকরূপে যাঁরা আজ লিখছেন, তাঁদের সম্বন্ধে

প্রত্যাশা ঊর্ধ্বমুখী হওয়া অনুচিত নয়। কিন্তু যে-প্রত্যাশার সংকেত ইতিপূর্বে দিয়েছি, তার পরিতুষ্টি বহু ভাগ্য বিনা সম্ভব নয়। আমাদের সে-ভাগ্য হবে কি না, এ-প্রশ্নের উত্তর না খোঁজাই বোধ হয় শ্রেয়।

অত্যন্ত সভয়ে একটি কথা বলে শেষ করব। ভারতবর্ষের বিদগ্ধ চিন্তায় নিরাসক্তির ঐতিহ্য এতই দীর্ঘ ও দৃঢ় যে তার ফলেই বোধ হয় আমাদের কবিতার স্বকীয় মাহাত্ম্যে কিঞ্চিৎ হানি ঘটেছে। সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্যের স্থান গরীয়ান বটে, কিন্তু চীনে কয়েক সহস্র বৎসর ধরে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে পরম-আসক্তি-জাত যে কবিতা লেখা হয়েছে তার তুলনা আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে নেই। ইয়োরোপের কবিকুলের কাছে তাই চীনা কবিতা মহামূল্য কিন্তু ভারতবর্ষের কবিতা প্রায় অপ্রাসঙ্গিক। অবশ্য কালিদাস-প্রমুখ মহাকবির প্রতিভা অস্বীকার করার চেয়ে বাতুলতা নেই। বেদ, উপনিষৎ, পুরাণে প্রোজ্জ্বল, স্বতঃস্ফূর্ত কবিতার উদাহরণ স্বল্প নয়। মহাভারত-রামায়ণে অগণিত শ্লোক আছে যা কবিতার অষ্টধাতুতে ভরা। কিন্তু পুষ্করিণীর জলে একটি পত্রের পতনে যে রোমাঞ্চ কবিমনকে সৃজনব্যাকুল করে তোলে, তার প্রতি কথঞ্চিত তাচ্ছিল্য আমাদের চিন্তায় বহুকাল হতে বাসা বেঁধে এসেছে। বিশ্ববীক্ষার জন্য একান্ত অধীরতা আমাদের দেশের বিদগ্ধ মনকে জীবনের বহু সামান্য অথচ সুগভীর ব্যঞ্জনা সম্পর্কে অনীহাগ্রস্ত করেছে, কবিতাকে প্রায় শুধু মনীষার সগোত্র করে রেখেছে। যারা সমসাময়িক অথচ পশ্চাৎমুখী ধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চেয়েছে, যারা প্রকৃতপক্ষে সমাজে অন্তেবাসী হয়ে থেকেছে, যারা আয়াসলব্ধ আধ্যাত্মিকতার চেয়ে মানবীয় অনুভূতিকেই পরমার্থ বলে মনে করেছে, প্রধানত তাদেরই কাছ থেকে আমরা পেয়েছি নিছক কবিতা। বর্তমান যুগের জটিলতা দাবি করে—কবির কাছেও দাবি করে—চিন্তার মুক্তি, অনুভূতির ঐশ্বর্য ও জ্ঞানের ঔজ্জ্বল্য, যে ত্রিধারায় পুষ্ট না হলে কাব্য-মন্দাকিনীর লাবণ্যও ম্লান হয়ে যায়। আমাদের কবিজনকে এবিষয়ে সম্যক সচেতন করার কাজে বিষ্ণু দে-র শ্রদ্ধেয় ভূমিকা এই সংকলনে সুস্পষ্ট। বাঙালী পাঠক এ-গ্রন্থের সমাদর করবে সন্দেহ নেই।

আমাদের ইতিহাস

হাইকোর্ট পাড়ায় একবার পরিহাস শুনেছিলাম দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিখ্যাত গান "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি" সম্বন্ধে। টেবিলের পাশে যে ক'জন বসেছিলেন তাঁরা সবাই বললেন নিশ্চয়ই, "ভাইয়ের, মায়ের এত স্নেহ, কোথায় গেলে পাবে কেহ" পদ দুটো তো অকাট্য। পার্টিশন মামলার সংখ্যা থেকেই প্রমাণ হচ্ছে "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি!"

কিন্তু পরিহাসের কথা থাক, জাতিগর্বে দিশাহারা বিপদ ও নির্বুদ্ধিতা সম্বন্ধে সচেতন থেকেই আমরা বলতে পারি, সত্য এদেশ অতুল, কত বৈভব এর সর্বত্র, কত বৈচিত্র্য এর নিসর্গ লীলায়, কত গৌরবোজ্জ্বল এর ইতিহাস।

প্রথমেই অবশ্য স্বীকার্য যে আমাদের ইতিহাসে বার বার পড়েছে কলঙ্কের ছায়া, বার বার এসেছে এমন যুগ যখন বিড়ম্বনা ও লাঞ্ছনার অবধি আমাদের ছিল না। আরও সর্বদা স্মরণীয় যে শ্রেণীভেদ কণ্টকিত পৃথিবীর সর্বত্র যেমন মেহনতী মানুষকে সভ্যতার পিলসুজ সাজার যন্ত্রণা সইতে হয়েছে, আমাদের এদেশেও তেমনই যুগ যুগ ধরে গণ-দেবতার অবমাননা চলে এসেছে, ধর্মের নামে অধর্ম আমাদের জীবনকে কলুষিত করেছে, "সম্ভবামি যুগে যুগে"-র আশ্বাস স্বল্পসংখ্যক ভাগ্যবানের জন্যই অভিপ্রেত থেকেছে।

কিন্তু এখনও যখন পর্বতগাত্রে খোদিত ভাস্কর্যের সম্মোহন মনের উপর পড়ে, এখনও যখন প্রাচীন ভারতীয়ের রূপদক্ষতায় গুহাভ্যন্তর পর্যন্ত উদ্ভাসিত দেখতে পাই, এখনও যখন দক্ষিণ ভারতের ধ্যানগম্ভীর ভূধরশ্রেণী হতে সংগৃহীত প্রস্তরের পুনর্জন্ম অভ্রচূড় মন্দিরের আকৃতিতে দেখা যায়, এখনও যখন কোণার্কের অপরূপ মন্দির প্রাকার থেকে চন্দ্রভাগা নদীর সমুদ্রসঙ্গম দেখা যায়, এখনও যখন বুলন্দ দরওয়াজা কি মোতি মসজিদ কি হুমায়ুনের কবর কি চিতোরের জয়স্তম্ভে বহুজাতিক ভারতবর্ষের বিচিত্রবীর্য সভ্যতার পরিচয় পাই, তখন গর্বে মন উদ্ধত না

হয়ে প্রশান্তির স্পর্শে যেন প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে, ভারতভূমির বহুযুগ-ব্যাপী গ্লানি তখন অপহৃত হয়ে আত্মগোপন করে।

এই ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনায় আজও আমাদের ঔদাসীন্য ও অকর্মণ্যতার চেয়ে বেদনাদায়ক ব্যাপার আর কি হতে পারে? এখনও ভারতবর্ষের ইতিহাসের অনুশীলন ও ব্যাখ্যা বিষয়ে বিদেশীর মুখাপেক্ষিতা আমরা করে চলেছি। ইতিহাস পর্যালোচনা যাঁদের বৃত্তি, তাঁরা প্রায় সকলেই গতানুগতিকতার অনুরাগী, বিদ্যার ক্ষেত্রে যে সব কায়েমী স্বার্থের উদ্ভব ঘটেছে, তাদের কোন বিঘ্ন না ঘটিয়ে নিরাপদ ইতিহাস চর্চা করে দিনগত পাপক্ষয়ই যেন তাঁদের কাম্য। তাই ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্প্রতি ভারতীয় উদ্যোগে যা লিখিত ও প্রকাশিত হচ্ছে, তার কোন গুণগত প্রভেদ নেই গতানুগতিক ইতিহাস থেকে। যে সব প্রশ্ন বিদেশী গবেষককে পর্যন্ত বিচলিত করেছে, সেগুলিও এঁদের মনকে যেন নাড়া দেয় না। বহু প্রশংসিত এক ইতিহাসে পণ্ডিত-পরিচিতি-সম্পন্ন ভারতীয়ের রচনা থেকে দেখা যায় যে মৌর্যযুগে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে বিপুল কৃতিত্ব সম্বন্ধে একান্ত গতানুগতিকভাবে বলা হল যে, তার আগে এ দেশে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের চর্চা ছিল না (অর্থাৎ হঠাৎ ব্যাঙের ছাতার মত মৌর্যযুগে ঘটল শিল্পের একটা বিরাট আবির্ভাব) আর খুব সম্ভবত পারসীক এবং গ্রীক প্রভৃতির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের ফলেই মৌর্যযুগের শিল্পসমৃদ্ধি আমরা দেখতে পেয়েছি। এখনও যে শিল্পসিদ্ধি ছিল প্রাচীন ভারতেই সর্বগরিষ্ঠ অবদান, সে সম্বন্ধে সার্থক কিছু জানতে হলে বিদেশীদেরই শরণ নিতে হয়। আর ভারতীয়দের মধ্যে যিনি ছিলেন এক্ষেত্রে সর্বাগ্রগণ্য, সেই আনন্দ কুমারস্বামীকে জীবনের অধিকাংশ সময় কাটাতে হয়েছিল বিদেশে, শিল্প-আলোচনার যে ধারা ও তৎসম্পর্কে যে ইতিহাসবোধ তিনি প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন, তা যেন আজ এদেশে বিস্মৃত।

আমরা যারা মার্ক্স্‌বাদী বলে পরিচয় দিই, তাঁদের মধ্যে ইতিহাসের ছাত্রসংখ্যা নগণ্য নয়। মার্ক্স্‌বাদী হতে হলে ইতিহাসের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান একান্তভাবে অপরিহার্য। অথচ আমরাই

অন্য দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে যতটা তৎপর, নিজের দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে একেবারেই ততটা নই। এটা মার্ক্‌স্‌বাদ এবং ভারতবর্ষ উভয়েরই ক্ষতিকর, সন্দেহ নেই। আমাদের এই একান্ত স্বকীয় কলংক অপনোদন কত দিনে করতে পারব জানি না, কিন্তু এ বিষয়ে যদি এখনও সচেতন না হই তবে পরে অনুতাপ করতে হবে।

গবেষণার পক্ষে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস দুরূহ, সন্দেহ নেই। কিন্তু ঠিক সেই কারণেই যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাবে বিশ্লেষণের দিকে অগ্রসর না হওয়া অর্থহীন। মার্ক্‌স্‌বাদ এমন এক তত্ত্ব যা জীবনে সর্ববিধ প্রকাশকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করতে পারে। অখণ্ড জীবনবোধ বিনা প্রকৃত মার্ক্‌স্‌বাদী কেউ হতে পারে না। তাই যেখানে যথেষ্ট তথ্যের অভাব আছে, সেখানে মার্ক্‌স্‌বাদের জ্ঞানাঞ্জন শলাকায় চক্ষু উন্মীলিত করে নিয়ে প্রতিভাদীপ্ত অনুমান নিশ্চয়ই অবাস্তর নয়, অসঙ্গত নয়। কিন্তু প্রতিভাদীপ্ত অনুমানের কথা অসংকোচে বলতে হলে যে পাণ্ডিত্য ও মনের যে ব্যাপ্তি ও প্রখরতার প্রয়োজন, তার অভাবই আমাদের ম্রিয়মান করে রেখেছে। ভারতীয় মার্ক্‌স্‌বাদী ভারতের ইতিহাস পুনর্গঠনে এখনও উল্লেখযোগ্য অবদান দিতে পারে নি।

অন্যূন পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে তথাকথিত সিন্ধু-সভ্যতার অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের যেন এক নবরূপ আবির্ভূত হয়েছে। প্রাক-বৈদিক যুগের এই সভ্যতার সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের গৌরবোজ্জ্বল অতীতের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রয়েছে, এর বিস্তৃতি যে কত বিপুল তার পরিচয় আমরা পেয়েছি; রাজস্থানে, পাঞ্জাবে, উত্তর প্রদেশে এর নিদর্শন পাওয়া গেছে। কিন্তু আমাদের মনে এ-ব্যাপারে আগ্রহের এমনই অভাব যে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে একযোগে খনন কার্যের পরিকল্পনা বিষয়ে জনমতের কোন চাপই কর্তৃপক্ষের উপর পড়ে না। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা দুই-ই আজ পাকিস্তানের অন্তর্গত; কিন্তু ভারত ও পাকিস্তান বিভিন্ন রাষ্ট্র হলেও ভারত-ভূখণ্ডে সভ্যতার ইতিহাস অখণ্ড আর সে ইতিহাসের সন্ধানও চাই অখণ্ড উদ্যমের মধ্যস্থতায়। এ বিষয়ে কোথাও কোন সাড়াশব্দ

পর্যন্ত শোনা যায় না; যাঁরা পণ্ডিত তাঁরা নিরাপদ বিভাচর্চায় আগ্রহান্বিত হতে পারেন, কিন্তু যে বিষয়ের উত্থাপনে রাজনীতিক সমস্যা জড়িত, সে বিষয়ে তাঁরা নীরব থাকাই সুবিবেচকের কাজ মনে করেন। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে আমাদেরও যে কর্তব্য আছে, তা আমরা বিস্মৃত হয়েছি।

বৈদিক যুগের সভ্যতার তুলনায় সিন্ধুসভ্যতা ছিল উৎকৃষ্ট, এ বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে না। প্রাক-বৈদিক যুগে এ দেশে নগর ছিল, যার সমৃদ্ধির বহু পরিচয় মিলেছে, যার নাগরিক শাসনের জটিলতা ও সাফল্য বহু আধুনিকের বিস্ময় উদ্রেক করবে। বেদের ইন্দ্র হলেন "পুরন্দর", পুর ধ্বংস তিনি করেছিলেন, বেদের অরণ্য ও গ্রামভিত্তিক সভ্যতার তিনি ছিলেন হোতা, দেবগণ ছিলেন তাঁর সশস্ত্র উদ্‌গাতা। এই ঘটনার সঙ্গে তুলনা করা চলে ঈজিয়ন সভ্যতাকে বিপর্যস্ত করে গ্রীকদের ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব। দুই ঘটনারই হেতু সন্ধান করলে দেখা যাবে যে প্রাচীনতর সভ্যতা নানা দিক থেকে উৎকৃষ্ট হলেও লৌহের ব্যবহার তখনও অজ্ঞাত ছিল, আর অশ্বকে যুদ্ধকার্যে প্রয়োগ করতে সেই প্রাচীনরা জানতো না, অশ্ব তাদের অঞ্চলে অপরিচিত বলে। তাই যখন লৌহাস্ত্র নিয়ে এবং বেগবান, অদৃষ্টপূর্ব অশ্বসমারোহণে আক্রমণকারীরা এসে উপস্থিত হল, তখন সভ্যতাগর্বী সমাজ পরাভূত হল, যারা নিকৃষ্ট তাদের জয় হল, ইতিহাসকে পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা দিয়ে চলতে হল। এমন ঘটনা জগতের ইতিহাসে বারবার হয়েছে, কিন্তু তার প্রকৃত হেতু অনুসন্ধান করলেই বাস্তব পরিস্থিতি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, মার্কস্‌বাদ সেখানে বিপুল সহায়ক হবে, মার্কস্‌বাদী ঐতিহাসিকের সামনে যেন সোনার খনি খুলে যাবে।

ভারতীয় সংস্কৃতি বলে যে ব্যাপারের সঙ্গে আমরা পরিচিত, তার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হয়েছে স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, চিত্রাঙ্কণে, শিল্পায়নে, চৌষট্টি কলার চর্চায়, অপরদিকে প্রকাশ হয়েছে ধর্মে, সাহিত্যে, দর্শনে। বাস্তব জীবনের পরিস্থিতির সঙ্গে তৎকালীন চিন্তাধারার সম্পর্ক সন্ধানে আমরা যদি অগ্রসর না হই তো আমাদের ইতিহাস কত-

গুলো ঘটনার সমষ্টিমাত্র হয়ে থাকবে, তার সার্থক অনুশীলন ঘটবে না। লোকায়ত দর্শন কীভাবে কর্তৃপক্ষীয়দের হাতে নিষ্পিষ্ট হয়েছে, তার জীবনীশক্তি যে কত দুর্জয়, তার বহু লক্ষণ ছড়িয়ে রয়েছে সাহিত্যে, জনসাধারণের প্রিয় কাহিনীতে, রাষ্ট্রব্যবস্থার আকস্মিক বিপর্যয়ের রহস্যের মধ্যে। এদিকে আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট যে-ভাবে হওয়া উচিত, তা এখনও একেবারে হয় নি। লোকায়ত দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা এ পর্যন্ত যাঁরা করেছেন, তাঁরা মার্কস্‌বাদী নন।

সহস্র সমস্যায় আমাদের ইতিহাস কণ্টকিত হয়ে রয়েছে, কিন্তু এখানে অন্তত একটা সমস্যার কথা উল্লেখ করা যায়—এমন একটা সমস্যা যা ঐতিহাসিকের মন মাতাতে পারে। পুরুষপুর (বর্তমান পেশোয়ার) ও পাটলিপুত্র থেকে আগ্রা ও মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত আমাদের ইতিহাসে শহরের অভাব ছিল না। গ্রাক পর্যটক মেগাস্থিনিসের বর্ণনা থেকে দেখি যে রোমের সমৃদ্ধি যখন চরমে, তখনকার তুলনাতেও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজধানী পাটলিপুত্র ছিল আয়তনে রোমের দ্বিগুণেরও বেশি, আর পাটলিপুত্রের পৌরশাসন ছিল এত সুমাজত যে সেখানে জন্মমৃত্যুর হিসাবরক্ষার ব্যবস্থা করত পৌরসভা। চীনা এবং অন্যান্য বিদেশী পর্যটকের বিবরণ মারফৎ আমরা ভারতীয় নগরজীবনের চমৎকারিতার বহু পরিচয় পেয়েছি। দক্ষিণ-ভারতের মন্দির-নগরের কথা বাদ দিয়েও বলা যায় পঞ্চদশ শতাব্দীর বিজয়নগর দেখে বিদেশীরা বিমুগ্ধ হয়েছিল, তার ধ্বংস যখন ঘটে তখন সেই ধ্বংসের রূপ পর্যন্ত ছিল মনোহারী। তাম্রলিপ্তি থেকে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত বাংলাদেশে নগরের যে ঐতিহ্য, তারই পরিচয় আমরা পাই যখন পলাশীর যুদ্ধের সময়কার মুর্শিদাবাদ সম্বন্ধে ক্লাইভ বলেন যে মুর্শিদাবাদ সমসাময়িক লণ্ডন থেকে কোন অংশে ন্যূন ছিল না, বরঞ্চ কোন কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল। কিন্তু এদেশে নগর-সভ্যতার এত দীর্ঘ ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও ইয়োরোপের মত এখানে বুর্জোয়া (নাগরিক) শ্রেণীর উদ্ভব ঘটল না কেন? এ-প্রশ্নের উত্তর আমাদের অনুসন্ধান করতেই হবে। নচেৎ আমাদের বর্তমানকেও আমরা বুঝতে পারব না।

শিল্পবাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি আমাদের পুরাকালে হয়েছে, শিল্পীসংঘ ও ব্যবসায়ী শ্রেষ্ঠী সম্প্রদায়ের বিকাশেরও সংবাদ আমরা পেয়েছি। কিন্তু মার্কসের ভারতবিষয়ক অতুলনীয় প্রবন্ধাবলী থেকে আমরা অতি সুস্পষ্টভাবে জেনেছি যে পল্লীসমাজই এদেশের জীবনের কাঠামো থেকে গেছে, আর সেই কারণেই আমরা এখানে ইয়োরোপের মত কুটীর শিল্পেরই বৃহৎ, সংঘবদ্ধ রূপ দেখতে পেলাম না। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত শিল্পকৌশলের দিক থেকে আমরা ইয়োরোপের তুলনায় কম যেতাম না, কিন্তু পুরাকাল থেকে একেবারে মোগল আমালের শেষ পর্যন্ত পল্লীসমাজের প্রাধান্যই এদেশে রয়ে গেল বলে বুর্জোয়ার আবির্ভাব এখানে হল বিলম্বে, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের ছত্রচ্ছায়ায়।

অনুসন্ধান করে দেখা দরকার যে সম্ভবত আমাদের অর্থনীতিতে স্থাণু ভাবের কারণ হল এই যে, যেটুকু বাণিজ্য ও শিল্পীসংঘ এখানে গড়ে উঠেছিল, তা বিলাস-ব্যসনের দ্রব্য ও অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণেই নিবদ্ধ রইল। শহরগুলি ইয়োরোপের মত নবজাত, সামন্ততন্ত্র বিরোধী বুর্জোয়া শ্রেণীর বাসভূমি হয়ে উঠল না। ভারতবর্ষের জীবন আত্ম-নির্ভর গ্রাম্যসমাজেই আটকে থাকল, শহরগুলো হয়ে রইল পরগাছা অন্তঃসারশূন্য। রাজা-বাদশার দরবারে বণিক-মহাজন বলে যারা খাতির পেয়েছিল, তারা যদি শহরে অনেক কারিগরকে একত্র করে শিল্প সংগঠন করত, তা হলে ইয়োরোপে যেমন 'স্বাধীন শহর' গড়ে উঠেছিল, বুর্জোয়ারা যেমন সেখানে একজোট হয়ে নিজেদেরই স্বার্থসিদ্ধির জন্য সমাজবিপ্লবে অগ্রণী হয়েছিল, তেমনই ঘটনার পুনরাবৃত্তি এদেশে হত। কিন্তু গ্রাম্য ব্যবস্থাই ভারতের মূল সমাজরূপ হয়ে রইল। বৎসরের পর বৎসর গ্রামের উৎপাদনপ্রথা নিশ্চল হয়ে থাকত, উৎপাদনের চাকা পুরুষানুক্রমে একভাবে ঘুরে চলত, উৎপাদন ব্যবস্থায় কোন উন্নতি দেখা দিত না। গ্রাম্য সমাজে যতটুকু বাড়তি উৎপাদন হত, তা শোষকশ্রেণীর ভোগে যেত। তখন কর্তৃপক্ষের কাজ প্রধানত ছিল জলসেচ ও অন্যান্য কিছু জনহিতকর কাজে সামান্য খরচ করে বাকি রাজস্ব শাসনের কলকব্জা বজায় রাখতে

ও আমীর-ওমরাহ জাতীয় লোকের ভোগবিলাসে ব্যয় করতে; যুদ্ধের জন্য অস্ত্রশস্ত্রাদি নির্মাণ এবং ফৌজ মজুদ রাখার খরচ অবশ্য চালাতে হত। পল্লীসমাজ ব্যবস্থার কল্যাণে ভারতের অধিকাংশ মানুষ শিল্প-ব্যাপারে নৈপুণ্য সত্ত্বেও গ্রামের সংকীর্ণ পরিধিতে আদিম জীবন যাপন করতে বাধ্য হত আর সমাজের বিধান এই নিশ্চল, স্থবির ব্যবস্থাকে কায়েম করল। শহরগুলো আত্মনির্ভর না হয়ে রাজারাজড়ার মর্জিকে অবলম্বন করে তাদেরই হুকুম তামিল করে অর্থার্জন করত, নূতন সমাজ সৃষ্টির বাস্তব সম্ভাবনাকে তারা এই ভাবে খর্ব করেছিল। রাজ্যের উত্থান-পতনের সঙ্গে তাই নগরের অবলুপ্তি পর্যন্ত ঘটল; নগরের স্বতন্ত্র, স্বাধীন অস্তিত্ব ভারতের বাস্তব পরিস্থিতিতেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল; নগর হয়ে রইল পল্লীসমাজেরই "অন্তেবাসী"।

এখানে সমস্যার অবতারণা মাত্র হল, সমাধান দেবার দুঃসাহস যথেষ্ট অনুশীলন বিনা সম্ভব নয়। কিন্তু সমস্যা সম্বন্ধে এবং চোখে তার মনোহারিত্ব সম্বন্ধে ভারতীয় মার্ক্স্‌বাদীদের চেতনা কবে প্রকৃতই জাগ্রত হবে?

সম্প্রতি তিব্বত বিষয়ে ভারত ও চীনের মধ্যে চুক্তি হয়েছে। সেদিন ছোটদের একটা বইয়ে পড়ছিলাম দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের কথা। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা হয়তো কারও কারও মনে পড়বে—

বাঙালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে
ভয়ঙ্কর,
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙালী
দীপঙ্কর।

বাংলাদেশের এই প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত সম্বন্ধে মার্ক্স্‌বাদী আলোচনা কি আজ আমাদের মনকে উদ্বুদ্ধ করছে? তিব্বত সম্বন্ধে কথা বলতে গেলেই বাংলার সঙ্গে তার সুপ্রাচীন সম্পর্কের কথা উঠবে—স্মরণে আসবে নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী প্রভৃতি মহাবিদ্যালয়। তিব্বতের সঙ্গে হাঙ্গেরীর সম্পর্ক অনুমান করে হাঙ্গেরিয়ান পণ্ডিত সমা-ডি-করস্‌ গেছলেন সেই তুষার দেশে, আজও তাঁর দেহাবশেষ প্রোথিত রয়েছে বাংলারই অন্তর্ভুক্ত দার্জিলিঙে।

আমাদের মনে কি সেই "জ্ঞাতুম্ ইচ্ছা"—সেই জিজ্ঞাসার উদ্রেক লক্ষ্য করছি?

মার্ক্‌স্‌বাদ আমাদের এই শিক্ষা দিচ্ছে, জ্ঞান ও কর্ম একই সূত্রে গ্রথিত—জ্ঞান বিনা কর্ম ব্যর্থ, কর্ম বিনা জ্ঞান অসার্থক। বিপ্লবী কর্মকাণ্ড নিয়ে যথোচিত ব্যস্ত নই বলেই কি আমরা জ্ঞান সম্বন্ধে নিঃস্পৃহ? কিন্তু উত্তর যাই হোক না কেন, জ্ঞান ও কর্মের এই গ্রন্থি-বন্ধন জীবনের মধ্যে রূপায়িত না করলে মার্ক্‌স্‌বাদী হিসাবেই আমরা বিড়ম্বিত হব। সেই অনিবার্য বিড়ম্বনার বিপদ থেকে রক্ষা পাবার মনোবৃত্তি ও অধ্যবসায় যেন আমাদের আসে।

প্যারিস ১৯৪৪

ছেলেবেলায় কয়েকবার কথকতা শুনেছিলাম। বিশেষ করে একজন কথকের কথা এখনও পরিষ্কার মনে আছে। বোধ হয় খানিকটা আধুনিক কায়দা ছিল তাঁর বলবার ধরনে। প্রথমেই তিনি তাই কোন দেবদেবীর শরণ না নিয়ে একটা গান গাইতেন, "অযুত ঋষির পদরজঃপূত, পুরাণ প্রচারে ধন্য", মহাতীর্থ নৈমিষারণ্যকে স্মরণ করে প্রণতি জানাতেন।

রাজপুতানার কোন চারণ কিম্বা মধ্যযুগীয় ইয়োরোপের কোন "ত্রুবাদুর" যদি আজ বিপ্লবের গাথা শুনিয়ে বেড়াতেন, তো বোধ হয় প্রথমেই গাইতেন প্যারিসের কথা, বহু বিপ্লবের গৌরবকাহিনী যে শহরকে বিশ্বমানবের পীঠস্থানে পরিণত করেছে, তার বীরকুলের মহিমা কীর্তন করতেন।

পশ্চিমী পুরাণে এন্‌সিলেডস্‌ নামে এক দৈত্যের আখ্যান আছে। এই দৈত্যকে দেবতারা যখন কিছুতেই দাবিয়ে রাখতে পারেন নি, দেবরাজ জুপিটার যখন একেবারে নাস্তানাবুদ, তখন মিনার্ভা নাকি বুদ্ধি খাটিয়ে এট্‌না পাহাড়টা দিয়ে এন্‌সিলেডস্‌কে চেপে ফেলেন, যুদ্ধে দেবতাদেরই জয় হয়। দৈত্য কিন্তু মরেও মরবার পাত্র ছিল না, তাই বুঝি যখনই সে ক্লান্ত হয়ে একটু হাত-পা ছড়াবার চেষ্টা করে, তখনই এট্‌না পাহাড়ের মুখ দিয়ে অগ্ন্যুৎপাত হয় আর সারা সিসিলি দ্বীপটা তোলপাড় করতে থাকে।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইয়োরোপের একটা কিম্বদন্তী ছিল যে ফ্রান্স হল ইয়োরোপের এন্‌সিলেডস্‌। ভগবানের হুকুম-নামা নিয়ে প্রভুত্ব করছি বলে যারা বড়াই করত, সেই বুর্‌বঁ রাজবংশের বিরুদ্ধে ফ্রান্স লড়েছিল। কিন্তু ঘটনার অনেক হেরফেরের পরে দেখা গেল যে সেই বুর্‌বঁ রাজতন্ত্রের জগদ্দল পাথর চাপিয়ে ফ্রান্সকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু ফ্রান্স কিছুতেই সে-বন্দোবস্ত মেনে নেয় নি।

আর যখনই ফ্রান্স তার হাত-পা ছাড়াবার চেষ্টা করেছে, তখনই একটা অগ্ন্যুৎপাত হয়েছে, সারা ইয়োরোপে বিপ্লবের ডঙ্কা বেজে উঠেছে।

এই কিম্বদন্তীরই লোকায়ত সংস্করণ একটা ছিল। সাধারণ লোক বলত যে ফ্রান্সের হাঁচি পেলে ইয়োরোপের সব দেশেরই যেন সর্দি ধরে যায়!

১৯১৭ সাল থেকে দুনিয়ার বিপ্লবীদের কাছে লেনিনগ্রাদ, মস্কোর কদর প্যারিসের চেয়ে বেড়ে গেছে। কিন্তু ফরাসীদের বিপ্লব-পরম্পরার মহিমা তাদের কাছে একটুও ম্লান হয় নি। বিপ্লবের ঐতিহ্যগৌরবে প্যারিস পৃথিবীর পুরোধা।

এই বছরের ২৩শে আগষ্ট তারিখটা তাই ইতিহাসে একটা স্মরণীয় ব্যাপার। হিটলারী বুটের চাপে যে ফ্রান্স জীবন্মৃত হয়েছিল, দেশের মধ্যে বিভীষণ-বাহিনীর চক্রান্ত যে ফ্রান্সের স্বাধীন সত্তাকে নিঃশেষ করার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করছিল, সেই ফ্রান্সই সুপ্তোত্থিত সিংহের মত জেগে উঠেছে, কেশর আন্দোলিত করেছে। আর পূর্বের মতই ফ্রান্সের নবজাগরণে প্রথমে সতেজ দুন্দুভিনিনাদ করেছিল বিপ্লব-স্মৃতিপূত মহানগরী প্যারিস।

দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার পর থেকে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ফ্রান্স থেকে ফ্যাশিষ্ট দুঃশাসন উৎপাটিত করার লড়াইয়ে লেগেছিল। কিন্তু শুধু বিদেশী মিত্রের উদ্যমে ও বিক্রমে স্বাধীনতা ফিরে পাওয়া ফ্রান্সের মনঃপূত ছিল না। তাই দেশের যেটা হল মর্মস্থল, সেই প্যারিসে ঘটল বিপুল জন-অভ্যুত্থান। পূর্বপুরুষেরা রাস্তায় ব্যারিকেড্ বানিয়ে স্বাধীনতার জন্য লড়েছিলেন ; তাদেরই বংশধরেরা কোথাও ব্যারিকেড্ খাড়া করে, আর কোথাও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র চালিয়ে শত্রুনিপাতে লাগল। পঞ্চাশ হাজার সশস্ত্র আর কয়েক লাখ নিরস্ত্র দেশভক্ত মিলে প্যারিসের পূর্বগৌরব পুনঃস্থাপনের সংগ্রামে নামল।

বার বার ফরাসীদের ইতিহাসে দেশভক্তদের মনের কথা ফুটে উঠেছে আমাদের কবির ভাষায়—

হায় সে কি সুখ, এ গহন ত্যজি'
হাতে লয়ে জয়তূরী,

জনতার মাঝে ছুটিয়া পড়িতে,
রাজ্য ও রাজা ভাঙিতে গড়িতে,
অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া
হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি।

প্যারিসের মুক্তি হল ফ্রান্সের সর্বত্র অপরাজেয় জনজাগরণের সঙ্কেত। হঠাৎ যেন ফ্রান্সে বিপুল দেশপ্রেমের উল্লাস বয়ে গেল, আর তারই স্রোতে তৃণের মত ফ্যাশিষ্ট দুর্দানব ভেসে যেতে লাগল।

জয়তুরী হাতে নিয়ে প্যারিসের জয়যাত্রা একটা আকস্মিক ঘটনা নয়। ফ্রান্সের দেশভক্তেরা নিদারুণ অত্যাচার অগ্রাহ্য করে প্রতিরোধ চালিয়ে আসছিল, মুহূর্তের জন্যও তাদের পরম দেশপ্রেমিক কর্তব্যে অবহেলা করে নি। বিদেশী মিত্রপক্ষের কাছ থেকেও যখন বেতারে পরামর্শ আসত যে যথাসময়ে ফরাসীদের খবর দেওয়া হবার আগে ফ্যাশিজম্‌কে আঘাত করার চেষ্টায় তারা যেন শক্তি ক্ষয় না করে, তখনও তারা চুপচাপ বসে থাকতে রাজী হয় নি, মিত্রপক্ষের পরামর্শ মেনে নেওয়া সঙ্গত মনে করে নি।

ফরাসীদের কানে পৌঁছেছিল আর এক ধরনের পরামর্শ। ফ্রান্সের কম্যুনিষ্ট পার্টির আহ্বানে একদিনের জন্যও প্রতিরোধ ক্ষান্ত হয়ে থাকে নি। ফ্যাশিষ্ট শাসকরা এর প্রতিশোধ নেবার জন্য নিদারুণ অত্যাচার প্রবর্তন করেছিল। তাই ফ্যাশিষ্ট শাসনের প্রথম তিন বৎসরে একা কম্যুনিষ্ট পার্টিরই দশ হাজার সভ্য দেশের সেবায় মৃত্যু বরণ করে। ফ্যাশিষ্ট জল্লাদের হাতে গাব্রিয়েল পোর, পিরের সেমার, জঁ্যা কাথ্‌লা প্রভৃতি কত দেশভক্ত প্রাণ হারান বটে, কিন্তু দেশবাসীর স্মৃতিতে তাঁরা চিরঞ্জীব হয়ে আছেন।

প্যারিসের মুক্তিতে ভারতীয় সৈন্যদের অবদানের কথা জেনে আনন্দে, গর্বে আমাদের বুক ফুলে ওঠে। স্বাধীনতার যারা পূজারী, সর্বদেশেই তারা প্যারিসের, ফ্রান্সের ভক্ত। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার জয়গান যে দেশে প্রথম উঠেছিল, সে দেশকে ভালোবাসে না কে? সে দেশের প্রতি আমাদের গভীর মমতা জানাবার জন্যই ভারতের পুরুষশ্রেষ্ঠ রামমোহন রায় ইয়োরোপে যাবার সময় অনেক অসুবিধা

ভোগ করেও ফরাসী জাহাজে সমুদ্রযাত্রা করেছিলেন। নাৎসী বন্দীশালা থেকে পলায়ন করে ভারতীয় সৈন্তেরা যে প্যারিসের শৃঙ্খলমুক্তিতে সহায়তা করেছে, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

হয়তো নাৎসীবন্ধন থেকে মুক্তির দিন ফরাসীরা উৎসব করে প্রতিপালন করবে। ১৭৮৯ সালের ১৪ই জুলাই তারিখ যেমন ফরাসীদের জাতীয় দিবস, তেমনই ১৯৪৪ সালের ২৩শে আগষ্টও হয়তো প্রতি বৎসর সারা দেশ আনন্দ করবে, মুক্তিসংগ্রামের সদাস্মরণীয় কর্তব্য মনে জাগরূক রাখবে।

প্যারিসের "ফোবুর্গ" (যে শহরতলীগুলিতে প্রধানত শ্রমিকেরা বাস করে) আর প্রসিদ্ধ "প্লাস্‌" বা পথের কেন্দ্রগুলি প্রতি বৎসর ১৪ই জুলাই তারিখে কী অপূর্ব উল্লাসে যে মুখরিত হয়ে ওঠে, তা যারা দেখেছে তারা কখনও ভুলতে পারে না। জানা-অজানা ছেলেমেয়ের হাতে হাত বেঁধে সারা দিন উৎসবব্যস্ত প্যারিসের পথে পথে ঘুরে বেড়াবার অভিজ্ঞতা যাদের হয়েছে, তারা বোঝে ফ্রান্সের দেশপ্রেম কি বস্তু!

১৯৩৫ সালের ১৪ই জুলাই তারিখের কথা মনে আসছে। তখন ফ্রান্সে "ইউনাইটেড ফ্রন্টের" জয়জয়কার চলেছে। প্যারিসের শ্রমিকদের মনে বিপুল উৎসাহ। বহু লক্ষ লোক মিলে তারা মিছিল নিয়ে যাচ্ছে। মিছিলের মাঝামাঝি একটা গাড়ীর ওপর বিশ্ববিখ্যাত লেখক ও শ্রমিকবন্ধু আঁরি বারব্যুস। বারব্যুসের পোষাক লাল নিশান দিয়ে ঢাকা, চারিদিকে উৎসাহোদ্দীপ্ত জনতা।

মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে চলেছেন শ্রমিক আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ নেতার দল—কাশঁ্যা, মার্তি ও আরও অনেকে। মার্তি লিখে গেছেন যে প্রায়ই শ্রমিকেরা এসে তাঁকে বলছিল, "বারব্যুসকে মাথায় টুপি দিতে বলো, রৌদ্রে বৃদ্ধের স্বাস্থ্যভঙ্গ হবে।" কিন্তু বারব্যুসকে এ-কথা জানালে তিনি রাজী হন নি, হেসে জানিয়েছিলেন যে জনতার সামনে মাথার উপর টুপি বসাতে তিনি রাজী নন।

১৭৮৯-৯৪ সালের ফরাসী বিপ্লবের ঐতিহ্য সমগ্র মানবজাতির একটা পরম সম্পদ। কেবল তত্ত্ব নয়, কর্মের ক্ষেত্রেও জনগণের

অধিকার সুপ্রতিষ্ঠ করার সংগ্রামে ফ্রান্স বিশ্বের নেতৃত্ব নিয়ে এসেছে। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলেরই সম্পূর্ণ সমান অধিকারের কথা ফ্রান্সের দেশভক্তেরা প্রচার করেছে, স্বার্থসর্বস্ব সমাজপতিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণায় কুণ্ঠিত হয় নি।

সাম্যবাদী আন্দোলনে ফ্রান্সের অবদান একেবারে অনবদ্য। সাম্যবাদের নীতি যখন ছিল কল্পনাশ্রয়ী, যখন বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগপদ্ধতি ছিল অজ্ঞাত, তখন ফরাসী চিন্তানায়কেরা এ-বিষয়ে যথেষ্ট অনুশীলন করেছিলেন, অন্তর্দৃষ্টি দেখিয়েছিলেন। প্রথম ফরাসী বিপ্লব যখন স্বার্থান্ধ নেতাদের কবলে পড়ে পথভ্রষ্ট হল, তখন বাব্যফ্ প্যারিসে এক সাম্যবাদী অভ্যুত্থানের আয়োজন করেছিলেন। সাম্যবাদী পদ্ধতি আয়ত্ত করার সুযোগ বাব্যফের হয় নি, অভ্যুত্থান তাই ব্যর্থ হয়ে গেল, কিন্তু বাব্যফের কথা এখনও প্যারিস ভুলতে পারে নি।

১৮৩০ সালে আবার ফ্রান্সে বিপ্লব হয়, প্রজাতন্ত্র স্থাপনের সংকল্পই প্যারিস গ্রহণ করে। কূটরাজনীতিবিশারদের ষড়যন্ত্রে সংস্কৃত রাজতন্ত্রই আবার স্থাপিত হয় বটে, কিন্তু প্যারিস সহজে তাকে মেনে নেয় নি। প্যারিস এবং লিয়ঁ-র মত শিল্পবহুল শহরে শ্রমিকসাধারণের জাগৃতির লক্ষণ দেখা যেতে থাকে। তাই ১৮৪৮ সালের বিপ্লবে শ্রমিকদের অবদান ছিল অনেক বেশী।

১৮৪৮-৫১, এই কয় বৎসরের ইতিহাস আলোচনা করেছেন স্বয়ং কার্ল মার্ক্স্। তিনি দেখিয়েছেন, ফ্রান্সের ভাগ্যনির্দেশের সংগ্রামে দুটো আলাদা ধারা রয়েছে। শ্রমিকেরা যেতে চায় এক দিকে, আর বিপ্লববহ্নিভীত-শ্রেণীরা যায় অন্যদিকে। শ্রমিকদের শক্তি ও সংহতি তখনও অসম্পূর্ণ, বিপ্লবের আর্থনীতিক পশ্চাৎপট তখনও অব্যবস্থিত, তাই, শ্রমিকশক্তি পরাজিত হল। কিন্তু বিনা যুদ্ধে প্যারিসের শ্রমিক পরাজয় মেনে নেয় নি। প্যারিস আর তার শহরতলীর রাস্তা গরীবের রক্তে রঙীন হয়ে উঠেছিল, বুর্জোয়ারা মর্মে মর্মে বুঝেছিল জনতার শক্তি, জনতার অটল প্রতিজ্ঞা।

প্যারিসের ইতিহাসে সব চেয়ে গৌরবময় অধ্যায় হল ১৮৭১

সালের কথা। শত্রু প্রাশিয়ান্‌দের কাছে হার মেনে ফরাসী বুর্জোয়ারা একটা মিটমাটের চেষ্টায় ছিল, কিন্তু প্যারিসের বীর নর-নারী এই দেশদ্রোহী সংকল্পের বিরোধিতা করল। ঘরের শত্রু বিভীষণেরা বিদেশী বৈরীদের সঙ্গে যখন হাত মেলাল, তখন একা প্যারিসের শ্রমিকশ্রেণী দুর্জয় বীর্য দেখিয়ে নিজস্ব 'কম্যুন্‌' প্রতিষ্ঠা করল, স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রাণপাতের জন্য প্রস্তুত হল।

অতি নৃশংসভাবে হাজার হাজার নির্দোষ নরনারীকে অসঙ্কোচে হত্যা করে ফরাসী বুর্জোয়ারা বিদেশী প্রাশিয়ানদের সাহায্য নিয়ে আবার দেশে প্রভুত্ব বিস্তার করেছিল বটে, কিন্তু প্যারিস 'কম্যুনের' তিন মাসের অভিজ্ঞতা বিশ্বের জন-আন্দোলনকে যে শিক্ষা দিল, সে শিক্ষা আত্মস্থ করার ফলেই ১৯১৭ সালের সোভিয়েট বিপ্লব সম্ভব হয়েছিল।

প্যারিস 'কম্যুনের' লড়াই হল প্রলেটারিয়েটের প্রথম লড়াই। সোভিয়েট বিপ্লবের ঐ হল মহড়া। সর্বহারা শ্রেণীর একাধিপত্য নিষ্করুণভাবে স্থাপন না করলে যে জনসাধারণের বিজয় সম্ভব নয়, এই হল 'কম্যুনের' শিক্ষা। মার্কস্‌ 'কম্যুনের' কোন কোন কার্যকলাপের সমালোচনা করে বললেন যে নানা ত্রুটি সত্ত্বেও 'কম্যুন্‌' যে অপূর্ব বীরত্ব দেখিয়েছে আর যে শিক্ষা আমাদের দিয়েছে, শ্রমিক-আন্দোলন কখনও তা ভুলবে না।

১৮৭১ সালের মতই ১৯৪০-৪৪ সালের ফরাসী দেশভক্তদের একযোগে লড়তে হয়েছে দেশদ্রোহী ফরাসী আর বিদেশী জার্মান ফ্যাশিষ্টদের বিরুদ্ধে। ১৮৭১ সালে তারা সফল হয়নি, ১৯৪৪ সালে ফ্রান্সের দেশপ্রেম জয়মণ্ডিত হয়েছে।

চার বৎসর আগে ফ্রান্স যখন ফ্যাশিষ্ট আক্রমণে ভেঙে পড়ল, শ্রেষ্ঠ দেশভক্তদের বেঁধে রেখে ছদ্মবেশী ফরাসী ফ্যাশিষ্টরা যখন তাদের হিটলারী মালিকদের হাতে সোনার দেশকে তুলে দিল, তখন শুধু যে একটা নিতান্ত গুরুত্বপূর্ণ সামরিক বা রাজনীতিক ঘটনা ঘটল, তা নয়, তখন ঘটেছিল ইয়োরোপীয় সভ্যতার একটা বিরাট যুগের পতন। ইয়োরোপের সংস্কৃতির যা-কিছু শ্রেষ্ঠ, তার নিদর্শন খুঁজতে হলে প্রায়

গত দুশো বৎসর ধরে ফ্রান্সের কাছেই যেতে হয়েছে। প্যারিস ছিল সত্যই মানবসভ্যতার রাজধানী, সোভিয়েট-বহির্ভূত জগতের মুকুটমণি। সেই ফ্রান্স যখন তার বিপ্লবী ঐতিহ্যের গৌরব-কাহিনী ভুলে গিয়ে, আত্মসর্বস্ব সমাজপতিদের নির্বীর্য স্বার্থান্ধতার ফলে ক্লৈব্যের শিকল বাঁধতে রাজী হল, তখন ঘটল একটা মন্বন্তর, একটা বিপুল বিপর্যয়।

'প্যারিসের পতন' বলে এরেনবুর্গ যে উপন্যাস লিখেছিলেন, তার কথা আজ মনে পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ছে তার প্রতিশ্রুতি যে এবার 'প্যারিসের মুক্তি' সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন। তাঁর লেখার প্রধান কথা ছিল এই যে, ফ্রান্সে মন্বন্তর অবশ্য ঘটেছে, কিন্তু এইবার পুরোনো মনু যাবে চলে, আর নতুন সংহিতা ফ্রান্সের জনগণই তৈরী করবে। ১৯৪৪ সালের আগষ্ট মাসে সে-সংহিতার প্রথম পরিচ্ছেদ-গুলো লেখা আরম্ভ হয়ে গেছে।

চার বৎসর ধরে প্যারিস আর সারা ফ্রান্স নরকভোগ করেছে। প্যারিস শহর ছিল অক্ষত, উদ্ধত ফ্যাশিষ্ট-বাহিনী প্রবেশ করতে চেয়েছিল অটুট, সুন্দর প্যারিসে। চার বৎসর ধরে প্যারিস ভেবে এসেছে যে তার সৌধ সমারোহই ফরাসী দেশপ্রেমকে বিদ্রূপ করছে, অপমান করছে! প্যারিসের দেহ ছিল অক্ষত, কিন্তু তার মন, তার আত্মা ছিল দুর্বিষহ বিষাদ ও অবসাদের হিমে সম্পূর্ণ অবসন্ন।

আজ তাই প্যারিসের নবজন্মে সর্বদেশ এত উল্লসিত, আসন্ন মুক্তির সম্ভাবনায় সর্বদেশ আজ আশান্বিত। আর প্যারিসে যারা থেকেছে, প্যারিসের আকাশে বাতাসে যে সহজ প্রফুল্ল আত্মীয়তা ছড়িয়ে আছে তার পরিচয় যারা পেয়েছে, তাদের আনন্দ শুধু নৈর্ব্যক্তিক সমাজবোধে অনুপ্রাণিত নয়, তাদের আনন্দে আরও আছে যেন স্বজনেরই প্রতি মমত্ব।

প্রগতি লেখক আন্দোলনের প্রারম্ভ

'পরিচয়'-সম্পাদক ফরমায়েস করেছেন যে 'প্রগতি লেখক সংঘ' যখন প্রথম এদেশে স্থাপিত হয়েছিল, তখনকার কিছু খবর তাঁর পাঠকদের জন্য দরকার। ইতিহাসে আমাদের আগ্রহ কম বলে বড় সহজে আমরা সাম্প্রতিক ঘটনা পর্যন্ত ভুলে যাই আর তাতে আমাদের ক্ষতি বই বৃদ্ধি হয় না। পনেরো'ষোল বছর আগে প্রগতি লেখক সংঘ স্থাপনার মধ্য দিয়ে যে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল, তার কথা স্মরণ করলে আমরা উপকৃত হব সন্দেহ নেই।

আমাদের একজন খ্যাতিমান লেখক একবার বলেছিলেন যে সাহিত্য ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে আমরা প্রায় ইয়োরোপেরই অন্তর্ভুক্ত একটা প্রদেশে বাস করি। কথাটায় অতিরঞ্জন আছে, কিন্তু তাকে একেবারে অসার বলে উড়িয়ে দেওয়াও চলে না। ইংরেজি ভাষা মারফত ইয়োরোপের সাহিত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞান বাংলা রচনা ও রস-বোধকে বড় কম প্রভাবিত করে নি—তার ফল সু কিংবা কু, যাই হোক না কেন। প্রগতি লেখক সংঘকে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার প্রথম প্রয়াস হয়েছিল এদেশে নয়, বিদেশে; লণ্ডনে এক ঘরে বসে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের কয়েকজন যে-আলোচনা ১৯৩২-৩৩-৩৪ সালে করেছিল, তারই পরিণতি ঘটে 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ' প্রতিষ্ঠায়। সে আলোচনায় যারা যোগ দেয়, তারা সবাই যে লেখক তা নয়; আজও প্রগতি লেখক আন্দোলনে লেখক আর পাঠকের প্রায় সমান স্থান রয়েছে বললে হয়ত একেবারে ভুল হবে না। মূল্‌ক্‌রাজ আনন্দ্, সজ্জাদ জহীর, ভবানী ভট্টাচার্য, ইক্‌বাল সিং, রাজা রাও, মুহম্মদ আশ্‌রফ্ এবং আরও ক'জন মিলে যে আলোচনা চলে, তারই জের এ-দেশে টেনে ১৯৩৫ সালে প্রস্তাবিত প্রগতি লেখক সংঘের ইশ্‌তেহার প্রকাশ হয়। ১৯৩৬ সালে ঈস্টারের ছুটিতে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের সময় মুন্সী প্রেমচন্দের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের প্রথম প্রকাশ্য অধিবেশন হয়।

১৯৩০-৩২ সালে সারা পুঁজিবাদী দুনিয়ার উপর দিয়ে বিপুল আর্থনীতিক সংকটের ঝড় বয়ে যায়। আমাদের দেশে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আইন-অমান্য আন্দোলনও ব্যাপক হয়ে ওঠে। সংকটকে প্রশমিত করার বহুবিধ চেষ্টা অবশ্য হয়। কিন্তু সমাধানের কোন হদিস্ মেলে না। পুঁজিবাদীরা সন্ধান পায় শুধু একটিমাত্র রাস্তার, আর তা হল ফ্যাশিজম্; সে-রাস্তায় চলতে হলে জনসাধারণকে চাবুক মেরে শায়েস্তা করা আর জাতিবৈরীর বিষে বিকৃত করা ছাড়া উপায় ছিল না। ফ্যাশিজ্মের নগ্ন, কদর্য মূর্তি দেখে সব দেশের দরদী মানুষ শিউরে উঠল। যাদেরই হৃদয় আছে, মানুষের মর্যাদা সম্বন্ধে চেতনা আছে, তারাই ফ্যাশিজ্মের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো যে কর্তব্য তা অনুভব করল। আমাদের দেশে সভ্যতার এই সংকট-সময়ে সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ দ্বিধাহীন দৃপ্ততেজে ফ্যাশিজম্‌কে ধিক্কৃত করলেন; ১৯৩০ সালে সোভিয়েট দেশে 'ঐতিহাসিক মহাযজ্ঞ' তিনি দেখে এসেছিলেন, তাঁর কবিকণ্ঠ মুখর হয়ে উঠল ফ্যাশিজ্মের যে অপার কলঙ্ক মানুষের চিন্তা ও কর্মকে কলুষিত করছিল তার বিরুদ্ধে। মার্জিত রুচি নিয়ে বিবিধ তথ্য ও তত্ত্বের সন্ধান করতে গিয়ে তখন সদ্যপ্রচারিত 'পরিচয়' পত্রিকা সাহিত্য ও সমাজের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক অসংকোচে স্বীকার করে বাঙালী সাহিত্যিককে তার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই নতুন রাস্তায় চলার সম্বল সংগ্রহে সাহায্য করল। প্রগতি লেখক আন্দোলনের বনিয়াদ এদেশের বাস্তব জীবনই সৃষ্টি করে দিল।

১৯৩৫ সালের শেষাশেষি সর্বভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘ স্থাপনের আয়োজন সম্পূর্ণ হয়। তখন যে ইশ্তেহার প্রচার করা হয় তাতে বলা হয়েছিল: "সনাতনী সংস্কৃতিতে ভাঙন ধরার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সাহিত্যে আটপৌরে জীবনের বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাওয়ার আত্মঘাতী প্রবণতা দেখা দিয়েছে। আমাদের নূতন সাহিত্য প্রত্যক্ষ ও প্রাকৃতিককে ছেড়ে অপ্রত্যক্ষ ও আধ্যাত্মিকের দিকে ধাবিত হয়েছে, পৃথিবীর মাটি পরিত্যাগ করে কল্পলোকের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। ফলে তার রচনাভঙ্গি অন্ধ নিয়মানুগত্যের

বিষম জালে জড়িয়ে পড়েছে, তার ভাবসম্পদ হয়েছে রিক্ত ও বিকারগ্রস্ত।

"আমাদের সমাজ যে নবরূপ ধারণ করছে তাকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করা এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করে প্রগতিকামী মননধারাকে বেগবান করা, এই আমাদের লেখকদের কর্তব্য।...

"...আমরা চাই জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে সর্ববিধ কলার নিবিড় সংযোগ; আমরা চাই যে সাহিত্য প্রাত্যহিক জীবনের চিত্র ফুটিয়ে তুলুক আর যে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা আমরা করছি তাকে এগিয়ে আনুক।"

"ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির যা কিছু শ্রেষ্ঠ, আমরা তার উত্তরাধিকারের দাবি করি। আমাদের দেশে নানা মূর্তিতে যে প্রগতিদ্রোহ আজ মাথা তুলেছে তাকে আমরা সহ্য করব না।...যা কিছু আমাদের নিশ্চেষ্টতা, অকর্মণ্যতা, যুক্তিহীনতার দিকে টানে, তাকে আমরা প্রগতি-বিরোধী বলে প্রত্যাখ্যান করি। যা কিছু আমাদের বিচারবুদ্ধি উদ্বুদ্ধ করে, সমাজব্যবস্থা ও রীতিনীতিকে যুক্তিসঙ্গত ভাবে পরীক্ষা করে আমাদের কর্মিষ্ঠ, শৃংখলাপটু, সমাজের রূপান্তরক্ষম করে, তাকে আমরা প্রগতিশীল বলে গ্রহণ করব।"

বাংলাদেশে প্রগতি লেখক সংঘের প্রথম সভাপতি হন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত; কোষাধ্যক্ষ সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার এবং সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। ১৯৪৪ সালে সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর অকালমৃত্যু ঘটে; আশ্চর্য মানুষ ছিলেন ইনি; তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধি, অসামান্য জ্ঞান, অক্লান্ত অনুসন্ধিৎসা, মার্কস্‌বাদকে ভারতীয় গবেষণার উপর প্রতিষ্ঠিত করার বিপুল আগ্রহ, পরম সাহিত্যানুরাগ এবং বক্তৃতা ও রচনায় অসাধারণ কৃতিত্বের কথা যদি আমরা কখনও ভুলি তো তা হবে অমার্জনীয় অপরাধ। প্রগতি লেখক আন্দোলনে এই অজাতশত্রু পথিকৃতের অবদান যেন আমরা বার বার স্মরণ করি।

লক্ষ্মৌ শহরে ১৯৩৬ সালের ঈস্টারের ছুটিতে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তা ছিল নানা কারণে স্মরণীয়। সভাপতির মঞ্চ থেকে জওহরলাল নেহরু যে ভাষণ দেন তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল খুব

বেশী। বিভিন্ন বামপন্থী ধারাকে একত্র করে বিদেশে ফ্যাশিজ্‌মের বিরুদ্ধে এবং স্বদেশে ফ্যাশিজ্‌মেরই সগোত্র সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান তখন এসেছিল; কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে নেহরু সে-আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন এবং এমন ভাষায় যা সহজে ভুলবার নয়। লক্ষ্মৌয়ে নেহরুর বক্তৃতা উদ্ধৃত করে এখনও অনেকে তাই দেখান যে তাঁর তখনকার কথা আর আজকের কাজের মধ্যে বিকট অসঙ্গতি রয়েছে। লক্ষ্মৌ-ফৈজপুর-হরিপুরা-ত্রিপুরী কংগ্রেসের বিবরণ বেশ স্পষ্টভাবে এদেশের সব চেয়ে শক্তিশালী রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রগতিবাদী ধারার উত্থানপতন এবং আভ্যন্তরীণ অসামঞ্জস্যের পরিচয় দেয়। যাই হোক লক্ষ্মৌয়ে যখন কংগ্রেস বসেছিল, তখন সেখানকার এক হলে নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সম্মেলনের অধিবেশন হল। সভাপতি ছিলেন উর্দু এবং হিন্দী লেখকদের শিরোমণি প্রেমচন্দ্; যাঁরা বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এবং মওলানা হস্‌রৎ মোহানী (জাতীয় আন্দোলনের এই প্রবীণ নেতা উর্দু ভাষার একজন বিখ্যাত কবি)। উত্তর ভারতের লেখকদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত ছিলেন; যশ্‌পাল, সুমিত্রানন্দন পন্থ, রশীদা জহাঁ, ফয়েজ আহমদ্ ফয়েজ (আজ যিনি পাকিস্তানে বিপ্লবের চক্রান্তে জড়িত বলে আটক রয়েছেন), সজ্জাদ জহীর (বর্তমানে পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী) প্রভৃতি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। দক্ষিণ ভারত থেকে প্রসিদ্ধ তেলুগু কবি আব্বুরি রামকৃষ্ণ রাও যোগ দেন। বাংলা থেকে জন চার প্রতিনিধি গিয়েছিলেন; সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী নিজে যেতে পারেন নি, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে সাম্প্রতিক ধারা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলেন। যখন প্রবন্ধটি সম্মেলনে পড়া হয় তখন চারদিকে প্রকৃতই 'ধন্য ধন্য' রব ওঠে; বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এমন সাহিত্য-সমালোচনার নিদর্শন আর কোন প্রদেশ থেকে আসে নি। পরে "টুয়ার্ডস প্রগ্রেসিভ ক্রিটিসিজ্‌ম" নামে এক গ্রন্থে অপর কয়েকটি প্রবন্ধের সঙ্গে এই রচনা মুদ্রিত হয়েছিল; এখন তা দুর্লভ, হয়ত একেবারেই অপ্রাপ্য।

লক্ষ্ণৌয়ে সম্মেলন হওয়ার পূর্বে বাংলাদেশের বহু বিশিষ্ট লেখকের সঙ্গে আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এই প্রচেষ্টাকে আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথাও স্পষ্ট স্মরণ আছে। দল বেঁধে সাহিত্য করা সম্ভব কি না এই নিয়ে সুরসিক আলোচনা তিনি করেছিলেন, আর শেষ পর্যন্ত যখন আমরা সবাই রাজী হলাম যে দল বেঁধে সাহিত্য সৃষ্টি করা যাক বা না যাক, লেখক আর পাঠক মিলে (সুতরাং কিছুটা 'দল বেঁধে') আলোচনা ইত্যাদি করলে সাহিত্য সৃষ্টিতে নিশ্চয়ই সাহায্য ঘটে, তখন শরৎচন্দ্র সানন্দে লক্ষ্ণৌ সম্মেলনের জন্য তাঁর বাণী আমাদের হাতে দিলেন।

১৯৩৬ সালের ১৮ই জুন তারিখে বিশ্ববরেণ্য ম্যাক্সিম গর্কির মৃত্যু হয়। প্রগতি লেখক সংঘের বিভিন্ন শাখা 'গর্কি দিবস' পালনের উদ্যোগ করে। সংঘের সাধারণ সম্পাদক সজ্জাদ জহীর এ-বিষয়ে বিবৃতি দেন। এই সময় কলকাতার 'স্টেট্‌স্‌মান' কাগজে সংঘের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রচার আরম্ভ হয়। কমিউনিস্ট পার্টি তখন বে-আইনী ; 'স্টেট্‌স্‌মানের' প্রতিপাদ্য বিষয় হয় এই যে প্রগতি লেখক সংঘ কমিউনিষ্ট পার্টিরই এক ছদ্মবেশী রূপ। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রেমচন্দ্‌ যে-সংঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাকে এইভাবে বর্ণনা করতে 'স্টেট্‌স্‌মান' এবং তার বন্ধুদের সংকোচ হয় নি।

আমাদের দেশে প্রগতি লেখক সংঘের যোগাযোগ ছিল 'ওয়ার্লড কংগ্রেস ফর দি ডিফেন্স অব পীস্‌'-এর সঙ্গে ; রম্যাঁ রলাঁ প্রভৃতি মনীষী ফ্যাশিজ্‌ম্‌ যে নির্লজ্জভাবে যুদ্ধের চক্রান্ত করছিল তার বিরুদ্ধে প্রধানত লেখক ও শিল্পীদের নিয়ে সংগঠনের আহ্বান দেওয়ায় এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্যারিস, ব্রাসেল্‌স্‌, মাদ্রিদে এর অধিবেশন হয়েছিল, মুল্‌ক্‌রাজ আনন্দ্‌ ভারতীয় লেখকদের প্রতিনিধি হিসাবে সেখানে যোগ দিয়েছিলেন। ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬, তারিখে ব্রাসেল্‌সে যে বিশ্বশান্তি সম্মেলন হয় সেখানে প্রধানত বাঙালী প্রগতি লেখকদের উদ্যোগে একটি ইশ্‌তেহার ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে পাঠানো হয়। এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিজ্ঞানাচার্য

প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রমথ চৌধুরী, প্রেমচন্দ, জওহরলাল নেহরু, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, নন্দলাল বসু প্রভৃতি। বিবৃতিতে বলা হয়ঃ "...উন্মত্ত প্রতিক্রিয়া ও জঙ্গীবাদ আজ সভ্যতার ভাগ্য নিয়ে খেলা করছে আর সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার উপক্রম করছে। এ-সময়ে আমাদের নীরব থাকা হবে অপরাধ। সমাজের প্রতি আমাদের যে কর্তব্য তার ঘোর ব্যত্যয় করা হবে।" ভারতবর্ষে জনসাধারণকে শুধু যে নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে তা নয়, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা তাদের নেই এবং বিশেষত সমাজতান্ত্রিক মতবাদ ও কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে গ্রন্থাদি 'সী কাস্টম্স্' আইন অনুসারে বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি'-র ইংরেজি অনুবাদ নিষিদ্ধ, সিডনী ও বীট্রিস ওয়েবের "সোভিয়েট কমিউনিজম" গ্রন্থের আমদানী বন্ধ, সেন্সর-নীতির কাণ্ডজ্ঞানহীনতা শুধু হাস্যকর নয়, দেশের পক্ষে দারুণ অমঙ্গলেরই সূচনা তাতে দেখা যায়—এই ধরনের অনেক কথা এই বিবৃতিতে ছিল। আর বলা হয়েছিল "যুদ্ধকে আমরা ঘৃণা করি, যুদ্ধকে আমরা পরিহার করতে চাই, যুদ্ধে আমাদের কোন স্বার্থ নেই। যুদ্ধ মারফত কদর্য ফ্যাশিজ্‌ম্‌ কায়েম হতে চায়।" ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক ইতিহাসে প্রকৃত প্রস্তাবে এই বিবৃতির মূল্য অপরিসীম। প্রগতি লেখক সংঘের উদ্যোগে যে এর প্রকাশ ঘটে তা গর্ব করার বস্তু।

১৯৩৭ সালে বাংলাদেশে বহু স্থানে প্রগতি লেখক সংঘের শাখা স্থাপিত হয়। একে বাংলা, তায় লেখকদের ব্যাপার, সুতরাং সাংগঠনিক দিক থেকে আন্দোলনে অবশ্য অনেক গলদ থেকে যায় তবুও কাজ যা হয়েছিল তা একেবারেই তুচ্ছ নয়। ঐ বৎসর আবার রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী দিয়ে সংঘের পক্ষ থেকে সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'প্রগতি' নামে এক সংকলন সম্পাদনা করেন; এর ভূমিকা লিখে দেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত; আর যাঁদের রচনায় সংকলন সমৃদ্ধ হয়েছিল তাঁদের মধ্যে ছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সজনীকান্ত দাস, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধকুমার সান্যাল,

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, সময় সেন। কার্ল মার্কস্, আঁদ্রে জিদ্, ঈ. এম্. ফর্স্টার, টি. এস্. এলিয়ট্, সোভিয়েট কবি আলেকজান্দার ব্লক্, গোলাম গফুর ও কারাবিয়েভের লেখার অনুবাদ সংকলনে থাকে; অনুবাদকদের মধ্যে ছিলেন আবু সয়ীদ আইয়ুব, নীরেন্দ্রনাথ রায়, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আবদুল কাদির, বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা যথাসময়ে না পাওয়ার জন্য ছাপানো যায় নি। ভূমিকায় নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত লিখেছিলেন: "মানবের মানবত্বকে আশংকিত ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিতে হইলে সর্ব মানবের সংহত চেষ্টার প্রয়োজন। মানবের সকল শক্তির আজ প্রয়োজন হইয়াছে সংহত হইয়া এই দুর্ধর্ষ ধ্বংস-প্রচেষ্টার গতিরোধ করিবার। যাহার বাহুতে বল আছে, চিত্তে আছে যার ধী শক্তি ও ভাবুকতা, কণ্ঠে আছে যার বাগ্মিতা, লেখনী যার শক্তিমান—সকলের সমবেত চেষ্টা আজ প্রয়োজন, মানবের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও প্রগতিকে দৃপ্ত শক্তির মূর্ত অকল্যাণের হস্তে আসন্ন ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার।" আজও নরেশবাবুর সেদিনকার কথার আক্ষরিক পুনরাবৃত্তি আমরা করতে পারি।

প্রগতি লেখক আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের বিবরণ দিতে গেলে অনেক কথাই আজ মনে পড়ে। কিন্তু তার অবতারণা করতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাবে। তবে ১৯৩৮ সালের শেষ সপ্তাহে কলকাতায় নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সম্মেলনের যে অধিবেশন হয়, তার উল্লেখ না করলে খুবই অন্যায় হবে। সাহিত্য বিষয়ে বাংলাই যে প্রমুখ, এ-বিষয়ে অন্যান্য প্রদেশের লেখকদের মনে কোন প্রশ্ন নেই। তাই কলকাতায় সম্মেলন সবাই চেয়েছিলেন এবং সম্মেলন শেষ হওয়ার পর মুলক্‌রাজ আনন্দ্ বলেন, যে নানা দেশে সাহিত্যিকদের সভায় তিনি যোগ দিয়েছেন কিন্তু কোথাও কলকাতার মত এত বেশী লোকের সাহিত্য সম্বন্ধে এত বেশী আগ্রহ লক্ষ্য করেন নি। আশুতোষ মেমোরিয়ল হলে দু'দিন ধরে সম্মেলন চলেছিল; সভাপতি মণ্ডলীতে ছিলেন পাঁচজন—মুলক্‌রাজ আনন্দ্,

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু ও পণ্ডিত সুদর্শন (যতদূর মনে পড়ে, গুজরাতী লেখক উমাশংকর যোশী উপস্থিত হতে না পারায় তাঁর জায়গায় বুদ্ধদেব বসুকে সম্মেলন নির্বাচিত করে)। রবীন্দ্রনাথ যে বাণী প্রেরণ করেন সেটি প্রথমে পাঠ করে সভার কাজ আরম্ভ হয়; প্রেমেন্দ্র মিত্র, হিরণকুমার সান্যাল, আহ্‌মদ আলী, বালরাজ সাহ্‌নী, আবদুল আলীম প্রভৃতি আলোচনায় যোগ দেয়; অধ্যাপক শাহেদ সোহ্‌রাওবর্দী ও অধ্যাপক নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত প্রভৃতি বহু দেশবিখ্যাত কোবিদ্ উপস্থিত থেকে আন্দোলনের প্রতি তাঁদের সৌহার্দ্য প্রকাশ করেন। উর্দু কবিদের মধ্যে দু'জন এসে বাংলাদেশের লেখকদের চিত্ত জয় করেছিলেন— তাঁদের নাম হল মজাজ্ ও আলি সর্দার জাফ্‌রি। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসেবে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত সুচিন্তিত ও সুলিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন। প্রগতি লেখক আন্দোলনে এই বর্ষীয়ান সাহিত্যিকের অকৃপণ সাহায্য আমরা পরম কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি। আজও যখন দেখি যে চিন্তার প্রখরতায় ও অনুভূতির ঔদার্যে সমাজবিষয়ে তাঁর প্রতিটি সাম্প্রতিক রচনা ক্ষুদ্র হলেও প্রোজ্জ্বল হয়ে থাকে, তখন আশা হয় যে আমাদের এই দুর্ভাগা দেশের হৃদয়বিদারক পরিস্থিতি দেখে তিনি তাঁর পূর্বাভ্যস্ত কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর নিয়ে দূরে থাকতে পারবেন না।

সম্মেলনের সাফল্যের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, আর যিনি ছিলেন আমাদের প্রত্যেকটি উদ্যোগে একান্ত বন্ধু ও উপদেষ্টা, সেই সাংবাদিক শিরোমণি সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। তখন তিনি 'আনন্দবাজার পত্রিকার' সম্পাদক; তাঁর আপিস ছিল যেন প্রগতি লেখক সংঘেরও কার্যালয়। প্রধানত তাঁর এবং তাঁর শিষ্য বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সহায়তায় তদানীন্তন সাংবাদিক মহল থেকে প্রগতি লেখক আন্দোলন প্রচুর সমর্থন পেয়েছিল।

কলকাতায় প্রগতি লেখক সংঘের নিখিল ভারত সম্মেলনের সময় দেখা যায় যে প্রকৃত অনুরাগ নিয়ে সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করলে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সকলেরই সহায়তা পেতে দেরী হয় না। অতুলচন্দ্র

গুপ্ত, রাজশেখর বসুর মত বহুমানভাজন সাহিত্যিক সাগ্রহে সম্মেলনকে স্বাগত জানান। মনে আছে আলোচনার সময় প্রেমেন্দ্র মিত্র উপস্থিত থেকে যে আনন্দ পেয়েছিলেন তা তখনই বন্ধুদের কাছে প্রকাশ করতে কার্পণ্য করেন নি। মুল্‌ক্‌রাজ তো বললেন যে এমন সম্মেলন তিনি কখনও দেখেন নি। শৈলজানন্দ বললেন, আমার অভিভাষণ হবে রবীন্দ্রনাথের "প্রশ্ন" আবৃত্তি—

যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?

'পরিচয়' পত্রিকার সঙ্গে আন্দোলনের যোগ তখন ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ; বাংলায় তখন 'পরিচয়'-ই ছিল প্রকৃত প্রস্তাবে প্রগতি আন্দোলনের মুখপত্র। সম্মেলনে সভাপতিমণ্ডলীর সভ্যরূপে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যে অভিভাষণ পাঠ করেন তা প্রকাশ হয়েছিল আন্দোলনের ইংরেজী মুখপত্র 'নিউ ইণ্ডিয়ান লিটারেচার' ত্রৈমাসিকে; আবদুল আলীমের সম্পাদনায় এবং বিভিন্ন প্রদেশের লেখকদের সহায়তায় এই পত্রিকা কিছুকাল চলেছিল, কিন্তু সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্য এর প্রকাশ বন্ধ করে দিতে হয়। এর পুরো "ফাইল" হয়ত পাওয়া এখন শক্ত, কিন্তু যোগাড় করে রাখা আমাদের দরকার।

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ আরম্ভ হল: ১৯৪১ সালের ২২শে জুন হিটলার অতর্কিতে সোভিয়েট দেশ আক্রমণ করল। ইতিমধ্যে আমাদের দেশে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে জনতার সংগ্রাম চলছিল। প্রগতি লেখক আন্দোলন সংগঠন হিসাবে তখন শক্তিশালী ছিল না। কিন্তু তার প্রভাব যে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। ফ্যাশিজ্‌মের বিরুদ্ধে, সোভিয়েটের স্বপক্ষে, জনতার পার্শ্বে স্থান নিয়ে দাঁড়াতে আমাদের লেখক-শিল্পীরা ইতস্তত করেন নি; তাঁদের হাতে অস্ত্র ছিল লেখনী, কিন্তু ব্যবহার-পদ্ধতি ভিন্ন হলেও জনতার হাতিয়ারের যে লক্ষ্য তা ছিল মূলত লেখনীরও লক্ষ্য। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের ভাষায় বলতে গেলে, "সমিতির সাম্যে ও ঐক্যে, জনতার মুখরিত সখ্যে" যোগ দিতে আমাদের লেখকরা কখনও সংকোচ করতে পারেন না।

প্রগতি লেখক আন্দোলনের প্রারম্ভে বিশ্বব্যাপী ফ্যাশিজ্‌মের কবল থেকে সভ্যতাকে বাঁচাবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন লেখকেরা। আজ সেদিনকার ফ্যাশিজ্‌ম্ অপমৃত হলেও নবকলেবরে তার পুনর্জন্ম ঘটিয়ে যুদ্ধের নৃশংস তাণ্ডবে দুনিয়াকে জোর করে টেনে নামাবার প্রচেষ্টা যখন চলছে তখন আবার কেন আমরা পূর্বের মতোই তুচ্ছ ভেদাভেদের কথা বড় করে না দেখে হৃদয়বান ও সমাজ সচেতন সকল সাহিত্যিককেই অকপট ঐক্যের জোরে সেই অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করতে দেখব না?

কয়েকটী সোভিয়েট বই

কয়েকটি নতুন সোভিয়েট বই সম্প্রতি পড়েছি—পড়েছি আর আশ্চর্য হয়েছি।

কথাটা বোধ হয় বেশ খানিকটা নাটকীয় শোনাচ্ছে। সোভিয়েটের নামেই কীর্তনানন্দে-মাতোয়ারা ভাব দেখাচ্ছি বলে অভিযোগও হয়তো অনেকের কাছেই শুনব।

কিন্তু আশ্চর্য হবার কারণ যথেষ্ট রয়েছে। সোভিয়েট দেশের মজুরকিষাণ বিশ বছরের অমানুষিক পরিশ্রমে হাজার বাধা দূর করে সভ্যতার যে নতুন ইমারৎ বানিয়েছে, এ খবরটা তথ্যপূর্ণ বই মারফৎ আগেই শুনেছিলাম। কিন্তু আজ যেন সে-খবরটা নতুন করে আসছে। যুদ্ধের নৃশংস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সোভিয়েটের নব নব উন্মেষশালিনী শক্তি যেন স্বর্ণদ্যুতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে!

কয়েকমাস আগে মারাঠাদেশে স্টালিনগ্রাদ-গাথা শুনে এসেছি। লেলিনগ্রাদ, মস্কো, সেবাস্তোপোল, স্টালিনগ্রাদে লালফৌজের বীর কাহিনী আর সোভিয়েট দেশপ্রেম নিয়ে হয়তো কখনও মহাকাব্য লেখা হবে। নিজের দেশের মাটীর জন্য মানুষ কেমন লড়তে পারে, সংকল্পের মহত্ত্ব সম্বন্ধে প্রত্যেক যোদ্ধারই লেশমাত্র সন্দেহ না থাকলে কী অটুট বীর্য ও মনোবল নিয়ে মানুষ লড়তে পারে, বর্বর শত্রুর অকথ্য ক্রুরতাকে 'বজ্রসম দহিবার' মত বিপুল ঘৃণা যখন হয় জাগ্রত জনসেনার সুদর্শনচক্র, তখন মারণাস্ত্রই যে কেমন করে নতুন আলোয় ঝলমল করে ওঠে, পিতৃভূমির জন্য ন্যায়যুদ্ধ সোভিয়েটের সর্বত্র, সর্বজাতির মধ্যে, ছোটবড়, স্ত্রীপুরুষ, সকলেরই মনের বনিয়াদে যে কী অপূর্ব আলোড়ন এনেছে—তাই নিয়ে আজ আমাদের কাছে চেনা, অচেনা ও প্রায়-অচেনা সোভিয়েট শিল্পী ছবি আঁকছেন, সঙ্গীত-সৃষ্টি করছেন, গীতিকবিতা লিখছেন, গল্প লিখছেন, হয়তো বা কেউ মহাকাব্য বা উপন্যাসমহীরুহেরও পরিকল্পনা করছেন। যুদ্ধ চলছে—সর্বগ্রাসী, সর্বসংহারী যুদ্ধ। আর সঙ্গে সঙ্গে চলছে স্বাধীন মানুষের

স্বকীয় মহিমার স্ফুরণ, সংস্কৃতি বা সমাজের সৃষ্টিপ্রেরণাকে প্রলয়ের কালকোলাহল ব্যাহত করতে পারে নি।

ট্রেটিয়াকভ্‌ গ্যালারিতে যুদ্ধকালীন সোভিয়েট ছবির প্রদর্শনী হয়ে গেছে। তার কয়েকটা প্রতিকৃতি প্রকাশ হয়েছে, মস্কো থেকে প্রকাশিত পাঁচ ভাষায় ছাপা 'ইণ্টারন্যাশনাল-লিটারেচর' বলে মাসিকপত্রে। হয়তো কেউ কেউ দেখে থাকবেন। শস্টকোভিচ্‌ শত্রু-অবরুদ্ধ লেলিনগ্রাদে বসে যে নতুন সঙ্গীত সৃষ্টি করেছেন, তার বিবরণ আলেক্সাই টল্‌স্টয়ের কলম-মারফৎ পেয়েছি, হয়তো বা কারও তা শোনার সৌভাগ্য হয়েছে। সিমনভের একটা কবিতার ইংরেজী অনুবাদ থেকে অনুবাদ ('প্রতীক্ষা') আমাদেরই একজন খ্যাতনামা কবি করেছেন। টিখনভের 'লেনিনগ্রাদের গল্প' প্রভৃতি বই থেকে কিছু কিছু বাংলা অনুবাদ এরই মধ্যে হয়েছে।

কিন্তু আমাদের সাহিত্যিক মহলে এই নিতান্ত সম্প্রতিকার সোভিয়েট লেখা বোধ হয় এখনও ঠিক প্রবেশ পায় নি। মাত্র কয়েকখানা কপি কলকাতায় আসে; আজকের দিনে সস্তাদরে সুশোভন বই খাস্‌ সোভিয়েট থেকে সোজাসুজি আসছে বলে তখনই অনেকে সেগুলো লুফে নিই। আমাদের অনেকেরই কাছে সোভিয়েটে ছাপা সোভিয়েট বই বলে তার বাড়তি কদর খুবই; তাই সাহিত্যিক বন্ধুদের কাছে এগুলো পৌঁছে দেওয়া জরুরী কর্তব্য বলে জানলেও হাতছাড়া করতে মায়া হয়, নিজের কাছেই সেগুলো থাকে। অধিকাংশ সাহিত্যিকই কষ্ট করে 'পোলিটিকল' বইয়ের দোকানে যান না, গেলে যে আজকাল মাঝে মাঝে দারুণ দাঁও হাতে পড়তে পারে জানেন না। আমাদেরই মত কারুর মুখে এই টাট্‌কা সোভিয়েট লেখার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনে হয়তো তাঁরা ভাবেন যে আমরা সোভিয়েট সম্বন্ধে নিছক ভাবালুতায় হাবুডুবু খেয়ে থাকি। মোটের ওপর ফল হয় এই যে, সোভিয়েট সভ্যতার যে ভাস্বর প্রকাশের সঙ্গে তুলনা করার মত আজ যুদ্ধরত কোন দেশেই কিছু নেই, তার সঙ্গে আমাদের লেখক ও শিল্পীদের পরিচয় অপূর্ণ রয়ে যাচ্ছে, বহুক্ষেত্রে একেবারেই পরিচয় হচ্ছে না।

সময় ও সামর্থ্যের অভাবে আজকের সোভিয়েট সাহিত্য সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলতে চেষ্টা করছি।

কয়েকমাস আগে সোভিয়েট লেখক ও শিল্পীদের এক সভায় আলেক্সাই টলস্টয় বলেন, "অনেকে ভেবেছিলেন যে আজ কামানের গর্জন শিল্পের মধুকণ্ঠকে ডুবিয়ে দেবে। যুদ্ধের সময় সাহিত্য তার উৎকর্ষ হারিয়ে ফেলবে, সাহিত্য বিকৃত হয়ে পড়বে, হয়তো বা একেবারে নীরব হয়ে যাবে। কিন্তু ফ্যাশিজ্‌ম্ যে বর্বর বাহিনী পাঠিয়ে সোভিয়েট দলন করতে চেয়েছিল, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে সোভিয়েট শিল্প ও জনগণের বিপুল বীর্যের বহুরূপী প্রকাশ সাধন করছে। ১৯১৭ সালের বিপ্লব জনতার হাতে শিল্পের মহাস্ত্র তুলে দিয়েছিল ; তখনই রাতারাতি অবশ্য জনশিল্প জন্মায় নি, কিন্তু বহু বাধা অতিক্রম করে সোভিয়েট শিল্প আজ জনগণেরই শিল্প হয়েছে, সোভিয়েট সংস্কৃতি আজ বহু বিচিত্র রূপ পরিগ্রহ করছে।"

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন হয়েছিল, তখনও যুধ্যমান দেশগুলির সাহিত্যের উপর তার প্রতিরূপ পড়েছিল। সহজ দেশপ্রেম নিয়ে তখন রিউপার্ট ব্রুকের মত কবি কিছু লিখলেন, কিন্তু তার পরেই এল এক রকম প্রতিক্রিয়া। ওয়েন্ ও সিগ্‌ফ্রিড্ সাস্থনের মত নিঃসন্দিগ্ধ কবি অনবদ্যভাবে লিখলেন, সাধারণ সৈনিকের সহজাত চরিত্রবলের ছবি আমরা পেলাম, কিন্তু ফলের মধ্যে তখন যেন পোকা ঢুকে গিয়েছিল। যে উদ্দেশ্যের জন্য লড়াই, যাদের নায়কত্বে লড়াই, সে-উদ্দেশ্য ও সে-নেতৃত্ব সম্বন্ধে কোন আশা, কোন ভরসা রাখাই আর তখন সম্ভব ছিল না, উদ্দীপনার উৎস যাচ্ছিল শুকিয়ে, জীবন হয়ে উঠছিল নিরর্থক, আশাভঙ্গের বেদনাকে ভোলার জন্যই বুঝি সৌন্দর্যের দরজা আগলে বসে কবি গান গেয়ে যাবার বৃথা চেষ্টায় লাগলেন।

যুদ্ধ শেষ হল। "At the going down of the sun and in the morning, we shall remember them"—সরেন্স বিনিয়ন্ যাদের কথা বলতে চেয়েছিলেন, কেউ তাদের কথা ভাবল না। সমাজপতিরা কালনেমির লঙ্কাভাগেই ব্যস্ত রইলেন। জীবন একটা বিরাট পরিহাস হয়ে উঠতে লাগল। "ওরে আশা নাই, শুধু মিছে

ছলনা”—একথা বলা শুধু কবির একটা সাময়িক বিলাস মাত্র রইল না, একথাই জীবন ব্যাপারে অকাট্য সত্য হয়ে উঠল। “Waste Land”-এ ইংরেজী ভাষায় বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ কবি শিল্পীমানসের ছবি আঁকলেন—‘these fragments I have shored against my ruins.’

ইংরেজীর মত অন্যান্য সাহিত্যের ছবির উপরেও এই কাল ছায়া পড়ল। জীবনকে অস্বীকার না করলে সৃষ্টি-প্রেরণাকে আহ্বান করা যেন আর চলল না। নিছক কবিতার সাধনা শুরু হল, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের চেতন-অবচেতন রাজ্য থেকে অষ্ট ধাতু সংগ্রহ করে নতুন কবিতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করানো হল। অতি নিগূঢ় মনোবিকলনের রাজ্য থেকে কথাশিল্পী রূপসৃষ্টির মশলা হাতড়ে বেড়াতে লাগলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধল। সভ্যতার উন্মাদয়োগ মোচনের জন্য অস্ত্রোপচার প্রয়োজন হল, রক্তক্ষরণ অনিবার্য হল। এলিয়ট এবার বললেন যে এই দুই যুদ্ধের মধ্যে বিশ বছর আমরা হারিয়েছি, স্পেণ্ডারকে উপদেশ দিলেন, “ভুলে যাও এ যুদ্ধের কথা, এ জঘন্য কাণ্ডকে অস্বীকার করো অনন্যচিত্ত হয়ে লিখে যাও।” জীবন যখন কঠোর ভয়ঙ্কর রূপে দেখা দিল, তখন জীবন থেকে সরে যাওয়া ছাড়া এদের গত্যন্তর রইল না, আত্মরতির চূড়ান্ত পর্যায় আরম্ভ হয়ে গেল।

যুদ্ধ চলছে, পৃথিবীর ভাগ্যনির্ণয় হচ্ছে রক্তক্লেদের মধ্য দিয়ে। যুদ্ধ চলছে, শুধু দূর রণক্ষেত্রে নয়, আমাদের চোখের সামনে দিনের পর দিন তার ছায়া পড়ছে। কিন্তু সোভিয়েট ছাড়া সব দেশেই শ্রদ্ধেয় শিল্পী যাঁরা, তাঁদের অধিকাংশই যেন চোখ বুজে আছেন, ভাবছেন এ করাল তাণ্ডব চুকে যাক, আবার সৃষ্টির ঐশ্বর্যে সংস্কৃতি সুসমৃদ্ধ হয়ে উঠবে, আজ উপায় নেই কিছু, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রাণপণে শুধু যেমন করে হোক আশাকে জিইয়ে রাখতে হবে।

সোভিয়েটে যা ঘটছে, তা হল সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। যুদ্ধের ক্রূর তাণ্ডব সোভিয়েট জনসাধারণ যেমন দেখেছে, তেমন আর কেউ দেখেনি, আর কাউকে তেমন সইতে হয় নি। পূর্ব ইয়োরোপের সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলার বর্বর প্রতিজ্ঞা নিয়ে হিটলারী পঙ্গপাল

অবর্ণনীয় অত্যাচার করেছে, যন্ত্রণার অন্নসত্র খুলে দিয়েছে। কিন্তু সোভিয়েট মুহূর্তের জন্যও নতজানু হয় নি, আর শুধু যন্ত্রের মত লড়ে যায় নি; জীবন যে অর্থহীন, ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার অনিশ্চিত, সৌন্দর্য সৃষ্টি যে জীবন বহির্ভূত গুপ্তসাধনা, এমন দুশ্চিন্তা তার মনে ঢোকে নি। জীবনের জয়ধ্বজা উড্ডীন রেখে সে লড়ছে, অতিবর্ষণের মধ্যে সুবিচিত্র রামধনু কখনও তার চোখ এড়িয়ে যেতে পারে নি।

যে সব লেখকের নাম আগে আমরা জানতাম না, যাদের মধ্যে অনেকে সাধারণ যোদ্ধা কিম্বা কোন না-কোন ভাবে যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সংশ্লিষ্ট, তাদের লেখা গল্প তাই এতটা চমক লাগিয়ে দেয়। অন্য দেশের সাহিত্যকে যুদ্ধ একেবারে স্পর্শ করে নি বলা হয়তো একটু বাড়াবাড়ি হবে, কিন্তু খুব কমই করেছে বলা অন্যায় হবে না। আর কোন দেশে শত্রুর প্রতি অটুট ঘৃণা শিল্পক্ষেত্রেও হাতিয়ার হয়ে ওঠে নি, যুদ্ধ জয়ের পর নতুন দুনিয়া গড়া সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিতিও কোথাও নেই, দেশের সকলে যুদ্ধপ্রচেষ্টায় নানাভাবে মিলে থেকে যে নতুন মহাভারতের উপকরণ দিনের পর দিন শিল্পীদের হাতে তুলে দিচ্ছে, এ-বোধও অন্য কোন দেশে নেই।

Tikhonov, Sobeler, Wanda Wasilewska, Kozhevnikov, Dovzhenko প্রভৃতি অল্পখ্যাত ও অখ্যাত লোকের লেখা ছোট-ছোট গল্প শুধু যে রসোত্তীর্ণ হয়েছে তা নয়। সোভিয়েট নাগরিক কেমন করে আজ নিজেদের হাতে গড়া দুনিয়াকে বাঁচাচ্ছে, সাধারণ মানুষের সহজ বিক্রম যে আজ শিল্পের পরম উপজীব্য, শত্রুকে ঘৃণা করার সঙ্গে সঙ্গে জাতিধর্মনির্বিশেষে সর্বমানবের প্রতি সতেজ সহানুভূতি যে কেমন করে অপরাজেয় যোদ্ধা সৃষ্টি করতে পারে, সৈন্য দলের সঙ্গে সমাজের অন্যান্য সকল অংশের সম্পর্ক যে কত নিবিড়— তার সরল, ঘটনাবলম্বী, বক্তৃতাকণ্টকশূন্য ব্যঞ্জনা আমাদের সামনে এনে দিয়েছে।

তাড়াহুড়ো করে লেখা এ প্রবন্ধ নিতান্ত অসম্পূর্ণই থেকে যাবে, কিন্তু অন্তত একটা বইয়ের নাম না করলেই না। এটা হল ইলিয়া এরেন্‌বুর্গের লেখা 'The Fall of Paris'; বেশ বড় উপন্যাস, আধা-

reportage, আধা-কল্পনা, ১৯৪০ সালের ফ্রান্সের পতনের সব চেয়ে চমৎকার বিবরণ। ১৯৩৪ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত ফরাসীদেশের বহু বিশিষ্ট রাজনীতিকের ছবি এতে আছে, কোথাও নাম দিয়ে, কোথাও নাম না দিয়ে। জনতাকে ঐক্যবদ্ধ করে ইয়োরোপের রাজনীতির ছবি বদলে দেবার যে চেষ্টা কম্যুনিস্টদের উদ্যোগে হয়েছিল, সে-চেষ্টাকে বিফল করার জন্য যে বহু-বিস্তৃত চক্রান্ত চলেছিল, জাতির জীবন-বীজকে নীরস করে দিয়ে যে-চক্রান্ত ১৯৪০ সালে ফ্রান্সকে হিটলারের পদানত করেছিল, তার বিবরণ এ-বইয়ে রয়েছে।

'বিবরণ' কথাটা শুনে যদি কেউ আঁতকে ওঠেন তো অন্যায় হবে। ফ্রান্সের পতন শুধু একটা সামরিক বা রাজনীতিক ঘটনা নয়, ফ্রান্সের পতন হল ইয়োরোপীয় সভ্যতার একটা বিরাট যুগের পতন। ইয়োরোপের সংস্কৃতির যা কিছু শ্রেষ্ঠ, তার নিদর্শন খুঁজতে হলে প্রায় গত দুশো বছর ধরে ফ্রান্সের কাছেই যেতে হয়েছে। সেই ফ্রান্স যখন তার আত্মসর্বস্ব সমাজপতিদের নির্বীর্য স্বার্থান্ধতার ফলে ক্লৈব্যের শিকল বাঁধতে রাজী হতে বাধ্য হল, তখন ঘটল একটা মন্বন্তর, একটা বিপুল বিপর্যয়।

মন্বন্তর যে ঘটবে, পুরোনো মন্থ যে চলে যাবে, নতুন সংহিতা যে ফ্রান্সের জনগণই তৈরী করবে—এই হল এরেনবুর্গের লেখার প্রধান কথা। কোথায় ফ্রান্সের অপরাজেয় শক্তি লুকিয়ে রয়েছে, স্বার্থের সূক্ষ্ম জাল বুনতে গিয়ে ফ্রান্সের ধনপতিরা কি ভাবে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় দেশকে ফ্যাশিস্ট্ রসাতলে নিয়ে চলেছিল, ফ্রান্সের সাধারণ দেশ-প্রেমিক, ফ্রান্সের লেখক-শিল্পী-বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধিজীবী, সমাজপতিদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে যে আবার নবতেজে জেগে উঠবে—এরেনবুর্গ তাই আমাদের বলেছেন। আর তিনি এ সব কথা বলেছেন এমন ভাবে, যা কঠোর সমালোচককেও রসোত্তীর্ণ বলে স্বীকার করতে হবে।

সোভিয়েট লেখায় যে নতুন ব্যাপকতা এসেছে, 'The Fall of Paris'-এ তা অতি স্পষ্ট। বিরাট পটভূমিকায় সোভিয়েট দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এরেনবুর্গ ছবি এঁকেছেন, কম্যুনিস্ট জীবনধর্মকে প্রত্যাখ্যান

করতে করতে শেষে যে নরকভোগ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে—একথাটাই বলে গেছেন বারবার, কিন্তু কোথাও সঙ্কীর্ণ প্রচারসর্বস্বতার চিহ্নমাত্র নেই। নানাভাবে এমন সার্থক সৃষ্টি বহুদিন সোভিয়েট লেখায় দেখা যায় নি।

ফ্রান্স আবার জাগবে, আবার তার পুরোনো স্থান অধিকার করবে—এ কথা এরেনবুর্গের লেখা পড়লে বারবার মনে হয়। ঠিক এই কথাই সম্প্রতি বলেছেন জিদ্—আবার ফ্রান্স জাগবে। এতদিন ফ্রান্সের বুদ্ধিজীবী ও কলাসাধকরা উচ্চাঙ্গের সৃষ্টি করতে গিয়ে জীবন থেকে সরে গেছিলেন, Love, Liberty, Fraternity প্রভৃতির মত যে-সব চিন্তা, যে সব স্বপ্ন সহজ সাধারণ মানুষেরও অধিগম্য, তাকে বর্জন করে শিল্পের অদ্বিতীয়-ব্রতে তাঁরা লেগেছিলেন। জিদ্ তাঁদেরই বলছেন ফিরে যেতে, জীবনের কোলাহলের মধ্যে রূপসন্ধান করতে—আর কোন পথ নেই, থাকার প্রয়োজনও নেই।

Valery বা Charles Maurras-র মত যাঁরা ফ্যাশিজমের সঙ্গে মিতালি করতে রাজী, তাঁরা ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ, সভ্যতার ভবিষ্যৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকুন। ফরাসী সাহিত্যিক আজ ভাবছেন Louis Aragon-এর কথা, যিনি সোভিয়েটে থেকে সহজ, সরল যে কবিতা লিখছেন, তেমন নাকি গত একশো বছরে কেউ লেখে নি।

জার্মাণ লেখক Remarque লিখেছিলেন 'The Road Back'—যুদ্ধ থেকে ফিরে নতুন এক নরকে যাবার রাস্তার কথা। সোভিয়েট লেখকরা লিখছেন The Road to Life—স্বর্গে সিঁড়ির স্বপ্ন না দেখে জীবনের রাস্তাই আজ তাঁরা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছেন, নতুন দিনের নতুন আলোয় ঝলমল করে উঠবে যে পথ, তার ইঙ্গিত দিচ্ছেন।

ভারত আবিষ্কার

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর এই আধুনিকতম রচনার নাম হল "ভারতবর্ষ আবিষ্কার"। বইয়ের নাম শুনেই সকলের পড়তে ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক। তাঁর আত্মজীবনীতে পণ্ডিতজী লিখেছিলেন যে, দেশে বিদেশে সর্বত্রই তিনি যেন নিজেকে একজন প্রবাসী বলে অনুভব করেন। তাঁর সে অনুভূতি যে বদলেছে, দেশের সঙ্গে প্রকৃত অন্তরঙ্গ আত্মীয়তার সূত্র যে তিনি খুঁজে পেয়েছেন, এটা হল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তাই এ বইয়ের চাহিদা যে খুব দারুণ হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

১৯৪৪ সালে আহ্‌মদ্‌নগর জেলে থাকার সময় তিনি এ বইটি লিখেছিলেন; মুক্তি পাবার পর লেখার আর তেমন সময় পান নি, কেবল ১৯৪৫ সালের শেষ দিকে 'পুনশ্চ' নাম দিয়ে ক'পাতা যোগ করেছেন। নেহরুজীর রচনাসৌষ্ঠব বিশ্ববিখ্যাত; সুন্দর ঝরঝরে ভাষা, আর বিশেষ করে যখন তাঁর স্ত্রী কমলাকে স্মরণ করে তিনি নিজের দাম্পত্য 'জীবনের কথা লিখেছেন, তখন রচনা বাস্তবিকই অনবদ্য হয়েছে। বইটি পড়তে পড়তে অনেক সময় তাঁর কবিমনের সাক্ষাৎ মেলে এবং মনে হয় যে, ঘটনার যোগাযোগে পণ্ডিতজী আজ দেশের বহুমানভাজন নেতা, কিন্তু সে যোগাযোগ যদি না ঘটত, তো অন্ততঃ লেখক হিসাবে খ্যাতিলাভ তিনি করতেন।

"ভারতবর্ষ আবিষ্কারের" প্রশংসায় অনেকেই শতমুখ হবেন, কিন্তু কেবল "এমনটি আর হয়নি" বলে সন্তুষ্ট হতে পারছি না। ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি চিত্তাকর্ষক সংক্ষিপ্তসার লেখক দিয়েছেন; কারাগারে অবসর সময়ে যে তিনি বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছেন, তার পরিচয় পাতায় পাতায় মিলবে। কিন্তু মাঝে মাঝে আমাদের ইতিহাসে অল্প-পরিচিত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার অবতারণা তিনি করলেও মোটের উপর তিনি গতানুগতিকভাবেই লিখে গেছেন। ইংরেজ আমলের ইতিহাস

লেখার সময় কার্ল মার্কসের কাছে ঋণ স্বীকার না করলেও ভারতবর্ষ সম্পর্কে মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তিনি অনেক সাহায্য পেয়েছেন, ইতিহাসে কার্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয় সেখানে করতে পেরেছেন। কিন্তু ইংরেজ আমলের আগের ইতিহাস লেখার সময় সচরাচর ইতিহাসের পণ্ডিতেরা যা বলে থাকেন, তারই পুনরাবৃত্তি করেছেন স্বভাবসিদ্ধ সুললিত ভাষায়। সাম্রাজ্যের উত্থানপতন ভারতবর্ষে বারবার কেন হয়েছে, তার সন্ধান তিনি পান নি, হয়তো করেনও নি।

আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের যে বিশিষ্ট স্বীকয়তা আছে, তার সাক্ষ্য যে ইতিহাস, একথা তিনি বোঝেন নি। ভারতবর্ষের ঐক্য সম্বন্ধে তাঁর এমনই নিশ্চিতি যে মৌর্য্য বা গুপ্ত যুগে কিম্বা মোগল বাদ্শাহদের সময় বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়েছে দেখে তিনি উল্লসিত হয়েছেন। সে সাম্রাজ্য কেন ক্ষণস্থায়ী হল, তা তিনি বোঝেন নি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে মূলগত ঐক্য বর্তমান থাকলেও তাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের সম্পূর্ণ স্ফূরণের সুযোগ দিয়ে প্রকৃত ভারতীয় মহাজাতির ঐক্য যে এ পর্যন্ত আমাদের ইতিহাসে স্থাপিত হয় নি, আর সেই ঐক্য স্থাপনই যে জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য এ কথা তাঁর কাছে সত্য হয়ে ওঠে নি। তাই ইতিহাসের নজির দিয়ে উকিলের মত ভারতের ঐক্য প্রমাণ করতেই তিনি ব্যস্ত থেকেছেন, খণ্ডের মধ্যেই যে অখণ্ডত্বের উপজীব্য রয়েছে, তা তিনি বোঝেন নি। মাঝে মাঝে তাই তাঁর লেখা হয়েছে অত্যন্ত হালকা ধরনের : ৩৯২-৩৯৭ পৃষ্ঠাতে বিভিন্ন প্রদেশের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যা তিনি লিখেছেন, তা প্রায় হাস্যকর।

সাম্প্রতিক ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতি ব্যাপারে নেহরুজীর বক্তব্যই সকলে সাগ্রহে পড়বে; তাই সে বিষয়ে কিছু বলা দরকার। মুসলিম লীগ আর জিন্না সাহেবের দোষত্রুটি বার করতে হলে পুরু কাঁচের চশমা পরতে হয় না, কিন্তু তাই বলে মুসলিম লীগ স্থাপনাটা স্রেফ ইংরেজ সরকারের একটা চাল (পৃঃ ৪১১) বলে দেওয়া যথেষ্ট বাড়াবাড়ি; পণ্ডিতজী যদি কষ্ট করে বদরুদ্দীন তৈয়াবজী, রহিমতুল্লা সায়ানি আর নবাব সৈয়দ মুহম্মদ, কংগ্রেসের এই প্রথম তিনজন মুসলমান

সভাপতির বক্তৃতা পড়ে দেখেন তো তাঁর ভুল বুঝতে পারবেন। মুসলমান পাঠকেরা যদি মনে করেন যে, তাঁদের প্রতি পণ্ডিতজীর অবজ্ঞা একেবারে মজ্জাগত, তো বিশেষ অন্যায় করা হবে না। সাতশো এগারো পাতার বইয়ে কোথাও ওয়াহাবি আন্দোলনের উল্লেখ নেই; খেলাফৎ আন্দোলনের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকার কোন পরিচয় নেই। আর নিতান্ত মার্কিন মার্কা সাংবাদিকের মত সস্তা বাহবা পাওয়ার আশায় যেন তিনি লিখেছেন (পৃঃ ৪৩১) যে, জিন্নার কংগ্রেসত্যাগের প্রধান কারণ হল যে এক গাদা হিন্দীভাষী ময়লা-কাপড়-পরা লোকের সান্নিধ্য তাঁর পছন্দ হত না। কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আপোষের আলোচনা করার সময় জিন্না সাহেব যে ব্যবহার কখনও কখনও করেছেন কিম্বা পাকিস্তান দাবী নিয়ে ধনুকভাঙ্গা পণ করে থেকেছেন, তার কঠোর সমালোচনা করা অসঙ্গত নয়। কিন্তু কেবল ঐ কথা বলা, আর ১৯২৩ সাল থেকে বার বার সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রচেষ্টা বিফল হওয়ার কারণ নির্ধারণের চেষ্টা না করা, এবং পাকিস্তান দাবী হাজির হওয়ার বহুপূর্ব হতে জিন্নার ১৪ দফা দাবী কিম্বা "নেহরু-রিপোর্টে" কিছু অদল-বদল করার দাবী আজ আমাদের কাছে সহজগ্রাহ্য মনে হলেও তখন প্রবলভাবে তাকে অগ্রাহ্য করার কারণ সন্ধানের চেষ্টা না করা, নেহরুজীর একদেশদর্শিতারই যে পরিচায়ক, তা অস্বীকার করা চলে না।

দুই

বইটি প্রথম যখন হাতে পড়েছিল, আশা হয়েছিল যে নিশ্চয়ই দলিত ভারতবর্ষের কৃষক শ্রমিকদের সম্বন্ধে অন্তত কয়েকটি দামী কথা লেখক বলেছেন। কিন্তু কৃষকদের উল্লেখ আছে মাত্র এক জায়গায়, যেখানে পণ্ডিতজী ভুল করে বাংলায় "কৃষক-প্রজা পার্টির" নাম দিয়েছেন কৃষক-সভা (পৃঃ ৪৬২)। তিনি নিজে একবার ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করলেও কোথাও শ্রমিক সংগঠনের নামগন্ধই প্রায় নেই। অবশ্য তিনি বলতে ভোলেন নি যে গান্ধীজীর প্রতিষ্ঠিত আহ্‌মেদাবাদের "মজুর মহাজন" হল দেশের মধ্যে সব চেয়ে

বড় আর সুসংবদ্ধ সংগঠন। বলা বাহুল্য, এই "ইউনিয়নটি" ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসে যোগ দেয় নি। মজুরে-মালিকে মিতালি যে সম্ভব এবং কাম্য, এই হল এর কর্তাদের বিশ্বাস।

ভারতবর্ষের সর্বত্র পরিভ্রমণ করে সর্বশ্রেণীর মানুষের সঙ্গে মিশে তিনি যে দেশকে চিনেছেন, একথা অবশ্য পণ্ডিতজী বলতে কুণ্ঠিত হন নি। কিন্তু আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ তাঁকে কি শিখিয়েছে, তা তিনি বলেন নি। বরং মনে হয়, যা কিছু শেখাবার, তা তিনিই তাদের শিখিয়েছেন ; এক জায়গায় বেশ বর্ণনা আছে যে পণ্ডিতজীর বাণী শুনে তাদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, তাদের অসাড় মস্তিষ্কের মধ্যে ভারত মাতার সম্পর্কে ধারণা তিনি প্রবেশ করিয়ে দিচ্ছেন (পৃঃ ৫৪-৫৫)। 'রাজার নন্দিনী প্যারী যা করেন তা শোভা পায়।'

এহেন মনোভাব নিয়ে যখন বইটী লেখা, তখন সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং সব দেশের কমিউনিস্ট পার্টি সম্বন্ধে তাঁর মত যে কি, তা আন্দাজ করা খুব শক্ত নয়। ৬২৮-২৯ পৃষ্ঠাতে তিনি বলেছেন যে, কমিউনিস্টরা সর্বত্র সোভিয়েটের ধামা ধরে থাকে বলে শ্রমিকদের মজ্জাগত জাতিবোধ তাদের বিরোধিতা করেছে। এ বিষয়ে সম্প্রতি কমরেড রজনী পাম দত্ত বলেছেন যে, পণ্ডিতজী চট করে আর একবার ইউরোপটা ঘুরে আসুন, তাহলে তিনি দেখবেন যে, দেশে দেশে শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে কমিউনিস্টদের যোগসূত্র কত ঘনিষ্ঠ হয়েছে। ভারতবর্ষের কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে তাঁর অবজ্ঞা অবশ্য অসীম, তাদের প্রভাব হল নগণ্য (পৃঃ ৫২৪); অথচ গত নির্বাচনের সময় কেউ তাঁকে হয়তো বোঝায় নি যে কমিউনিস্টরা যদি বাস্তবিকই মশা হত তো নেহরুজীর বক্তৃতারূপী কামান অবিশ্রান্তভাবে তাদের বিরুদ্ধে দাগতে হত না। ৬২৯ পৃষ্ঠাতে তিনি বলেছেন যে, ভারতীয় কমিউনিস্টরা ভাবে যে পৃথিবীর ইতিহাস আরম্ভ হয়েছে ১৯১৭ সালে বলশেভিক বিপ্লবের পর থেকে। কমিউনিস্টদের হয়ে ওকালতী করার প্রয়োজন এখানে নেই কিন্তু নিজের দেশের ঐতিহ্য সম্বন্ধে নেহরুজী যদি কিছু না জানেন তো সেটা তাঁর পক্ষে গৌরবের কথা নয়।

তিন

পণ্ডিত নেহরুর যে কোন রচনা পড়লেই মনে প্রশ্ন জাগে: সোভিয়েট সম্বন্ধে অকুণ্ঠ প্রশংসা বা নিন্দা তিনি করতে পারেন না কেন? সোভিয়েটের প্রশংসা যে তিনি করেন না, তা একেবারেই নয়। কিন্তু সোভিয়েটের নামে যারা তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে, তাদের কথা ভেবে কিম্বা কোন এক সহজাত দ্বিধাগ্রস্ততার চাপে তিনি সর্বদাই বলেন যে, "অনেক কিছু" সোভিয়েট করেছে যা তাঁর মনোনীত নয়। এ বইয়েও তাই সোভিয়েটের বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। সোভিয়েট প্রতিবেশী দেশগুলোকে তাঁবেদার করে রাখতে চায়, এ অভিযোগও করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে আবার সোভিয়েটের তারিফও আছে! ৬৬৯ পৃষ্ঠাতে একটা তাজ্জব কথা তিনি বলে ফেলেছেন: "রাষ্ট্রিক গণতন্ত্রের যা কিছু দোষ, তা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমান; আর রাষ্ট্রব্যাপারে গণতন্ত্রের অভাবের যা কিছু দোষ, তা আছে সোভিয়েটে।" যার মনে প্যাঁচ নেই, তার কাছে নিশ্চয়ই এ কথার অর্থ হবে যে, দোষেগুণে আমেরিকা হল সোভিয়েটের চেয়ে ভাল!

একটা কথা খুব উল্লেখযোগ্য; ১৯৪৫ সালের ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে লেখা প্রবন্ধ এ বইয়ে রয়েছে, অথচ আজাদ হিন্দ ফৌজের বিষয়ে একটীও কথা নেই; "জয়হিন্দ" শব্দটির অনুপস্থিতিও লক্ষ্য করার জিনিস। ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটি সম্পর্কে অনেক কথা আছে, কিন্তু কমিটি নিয়োগ করেছিলেন সুভাষ বসু, সে কথা নেই। ৫০৮-৯ পৃষ্ঠায় আছে যে, সুভাষ বসু কংগ্রেস সভাপতি হলেও জাপানী, জার্মান বা ইতালিয়ান ফ্যাশিজ্‌মের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের মনোভাব সমর্থন করতেন না, কেবল নেহরু প্রভৃতি কয়েকজনের খাতিরে মুখ বুজে থাকতেন!

গল্প আছে যে, বিলাতে রক্ষণশীল দলের একজন শিরোমণি লেডী অ্যাস্টর নেহরুজীর সামনে সোশালিস্টদের বিরুদ্ধে কিছু বলায় তিনি

যখন আপত্তি করেন তখন জবাব আসে, "মিস্টার নেহরু, আমি আপনার মত সোশ্যালিস্টের কথা বলছি না।" অ্যাস্টর-পরিবারে জলচল হয়ে নেহরুজী সুখী কি অসুখী হয়েছিলেন জানা নেই। কিন্তু এ বইয়ে ধর্ম, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, আত্মা, কর্মফল, পুনর্জন্ম, বেদান্ত, বস্তুবাদ, মার্কসীয় পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে নেহরুজী হরেকরকমের এত প্রশ্ন তুলেছেন, অথচ তার জবাব দেন নি কিম্বা জবাবের দরকারও স্বীকার করেন নি, যে তাঁকে "সোশ্যালিস্ট" বলতে যাওয়াই বাতুলতা। অবশ্য অনেক সময় মনে হয় যে, মত স্থির না করতে পারাটাই হল নেহরুজীর বৈশিষ্ট্য। আর সঙ্কোচের এই বিহ্বলতা অনবদ্য ভাষায় তিনি প্রকাশ করিতে পারেন বলেই তাঁর লেখা এত লোক আগ্রহ নিয়ে পড়ে।

আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্ববিরাজ

সোভিয়েট রাষ্ট্র ও সমাজের দুর্নাম রটনা রুশবিপ্লবের দিন থেকেই চলে আসছে, আর তাতে বিস্মিত হওয়ারও কিছু নেই। কিন্তু সম্প্রতি কয়েক বৎসর ধরে সেই অপবাদের মধ্যে একটা অসঙ্গতি দেখা যাচ্ছে। বেশ কিছু কাল ধরে বলা হত যে সোভিয়েট দেশের যারা নায়ক—"The wicked men of the Kremlin" বলে যাদের কুৎসায় চার্চিল প্রায় গলা ফাটিয়ে বসেছেন—তারা দেশভক্তির ধার ধারে না, তাদের অনেকেই হল গৃহহীন, ভ্রাম্যমান ইহুদী, আর তারা শুধু তাদের এক উদ্ভট বিশ্ববীক্ষার (weltanschauung) নামে দুনিয়াটাকে কবজা করার জন্য ব্যস্ত। তারপর থেকে সুর বদলে বলা হয় যে আন্তর্জাতিকতা বলে কোন বস্তু সোভিয়েটের ধারণার মধ্যে নেই, জারের প্রাক্তন সাম্রাজ্যকে নবকলেবরে সাজিয়ে তুলে ক্রমে জগৎজয় করাই ষ্টালিন-প্রমুখ অসুরদের মতলব। তবুও পৃথিবীর সাধারণ মানুষ সোভিয়েটের দিকে আশা ও উদ্দীপনা নিয়ে তাকিয়ে থাকছে দেখে আবার বলা হয় যে মুষ্টিমেয় কুচক্রী দেশে দেশে তাদের ভুল পথে ঠেলে নিয়ে চলেছে, ছদ্মবেশী জার-সাম্রাজ্যের কবলে তারা যে কয়েদী হচ্ছে এই সোজা কথাটা এখনও জনসাধারণের মগজে ঢোকে নি মোটের উপর একথাই চালাবার চেষ্টা চলেছে যে সোভিয়েট আর "internationalist" নয়, সোভিয়েট হল একেবারে 'nationalist', রুশ জাতীয় স্বার্থসিদ্ধিই সোভিয়েট ইউনিয়নের একমাত্র লক্ষ্য। "Red imperialism" ইত্যাদি বাক্য নিয়ে জিহ্বাস্ফোট আজকাল তাই এত সোরগোল ঘটিয়ে তুলছে।

সোভিয়েটের বহুমুখী কর্মকাণ্ড দেখে দিনের পর দিন নানা প্রকৃতির বহু সৎচেতা মানুষ আকৃষ্ট হচ্ছে বলে নানা দিক থেকে সোভিয়েটের এই "জাতীয়তাবাদী" দুর্নাম সম্বন্ধে রটনাও সম্প্রতি খুব বেড়েছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় যে কিছুকাল আগে শষ্টাকোভিচ্

(Shostakovitch) প্রমুখ কয়েকজন সঙ্গীতকারের বিরুদ্ধে সোভিয়েটে যখন প্রখর সমালোচনা হয়, পশ্চিম ইয়োরোপের ক্ষীয়মান সংস্কৃতিধারার দূষিত প্রভাব তাদের উপর পড়ছে বলে যখন সে দেশে আপত্তি ওঠে, তখন সোভিয়েট বিরোধীরা আহ্লাদে আটখানা হয়ে বলতে আরম্ভ করেন যে এর মধ্যে সোভিয়েটের জাতীয় সংকীর্ণতা-সঞ্জাত মনোভাবই ধরা পড়ছে। আবার মিচুরিণের প্রধান শিষ্য লাইসেঙ্কো (Lysenko) যখন সোভিয়েট প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌দের সঙ্গে "Mendelism-Morganism" সম্বন্ধে দেশব্যাপী সুদীর্ঘ আলোচনা ও বিতর্কের পর স্বীয় মত যুক্তিবলে প্রতিষ্ঠা করেন, তখন আবার রব উঠল যে এ ঘটনাও হল রুশ জাতিগর্বেরই প্রমাণ, মিচুরিণকে জাতে তোলার জন্যই Mendel এবং Morgan-এর মত পূর্বসূরীর গায়ে কাদা ছিটানো হল, বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নয়।

প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌দের বিতর্কে "ইতরে জনাঃ" প্রবেশ করবে না, কিন্তু বাস্তবিক যদি সোভিয়েটের প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌রা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত পথে চলতে থাকে, বিজ্ঞান যে সততা দাবী করে তারা যদি সেই সততা থেকে বিচ্যুত হয়, তা হলে তাদেরই হবে সমূহ বিপদ। আর সোভিয়েট বিজ্ঞান বিজ্ঞানপদবাচ্য না হলে সোভিয়েটের যারা শত্রু তাদেরই হবে সবচেয়ে বেশী লাভ। সুতরাং লাইসেঙ্কো যদি আত্মম্ভরী এবং হাতুড়ে হয়, সোভিয়েটে জাতীয়তার দোহাই দিয়ে যদি বিজ্ঞানকে পাঁকে নামানো হয় তাহলে "Western Democracy" অর্থাৎ আমেরিকা হল যে পালের গোদা তাদের খুবই উৎফুল্ল হওয়া উচিত। আসলে কিন্তু তারা একেবারেই উৎফুল্ল হয় নি। তারা বেশ জানে যে জ্ঞান-বিজ্ঞানেব যাচাই সোভিয়েট করে নেয় কাজের ক্ষেত্রে, যে বিজ্ঞান বাস্তব পরীক্ষায় বাতিল হয় সে-বিজ্ঞানকে আঁকড়ে থাকা সেখানে সম্ভব নয়, আর লাইসেঙ্কোর সিদ্ধান্ত বাস্তবের কষ্টিপাথরে যাচাই না হলে এতদিনে তাকে বাতিল করা নিশ্চয়ই হয়ে যেত। তবুও এ-ধরনের প্রচার চলে শুধু জোর করে বলার জন্য যে সোভিয়েট বিজ্ঞানকেও নিছক জাতীয়তার ছোপ লাগিয়ে ছাড়ছে।

সঙ্গীত ব্যাপারে শষ্টাকোভিচ্-প্রমুখ শিল্পীদের নিয়ে যে সমালোচনা

হয়েছিল তা ঠিক কি বে-ঠিক বলতে আমরা হয়তো পারি না, কিন্তু সঙ্গীত বিষয়ে যে সব খবর আসে তা থেকে সোভিয়েটে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ সঙ্গীতকে বিকৃত করছে কি না, অনেকটা বুঝতে পারি। ১৯৪৯ সালে ২৪ জন সঙ্গীতকার (Composer) স্টালিন পুরস্কার পেয়েছেন; এদের মধ্যে আঠারো জন রুশদেশ কিম্বা য়ুক্রেনের বাসিন্দা, বাকী ছ'জনের মধ্যে একজন করে মলদাভিয়ান, আজের-বাইজানী, এস্থোনিয়ান্, লাট্‌ভিয়ান্, তাতার এবং জর্জিয়ান্ আছেন। জাতিগত সংকীর্ণতার কোন লক্ষণ এখানে দেখা যায় না। হঠাৎ এক সোভিয়েট পত্রিকা খুলে দেখি এক কারখানার মহিলা কর্মীর ছবি; অবসর সময়ে তিনি পিয়ানো-বাদন নিয়ে থাকেন আর তাঁর সবচেয়ে প্রিয় "Composer" হল জার্মাণ বেঠোফেন (Beethoven), পোলিশ শোপ্যাঁ (Chopin) এবং রুশ চেকভ্‌স্কি (Chaikovsky)। আরও দেখি যে শষ্টাকোভিচ্ অনেক নতুন কাজ নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন; তাঁর সাম্প্রতিক রচনা "Song of the Forests"-এর "monumental oratorio form" সম্বন্ধে সমালোচক অকুণ্ঠ প্রশংসা করছে। সংকীর্ণতার পরিচয় তেমন মিলছে না বলেই তো মনে হয়।

সোভিয়েট পক্ষ থেকে একটা কথা সম্প্রতি নিঃসঙ্কোচে জানানো হচ্ছে। কথাটা হল এই যে আন্তর্জাতিক মনোবৃত্তি এবং জাতিবৈরীভাব থেকে মুক্ত থাকার মানে বিশ্ববিরাজী হয়ে যাওয়া নয়; প্রকৃত "internationalism" থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বলে "cosmopolitanism" বস্তুটা সর্বথা বর্জনীয়। এই নিয়ে প্রতীচ্য জগতে কৌতুক পরিহাস যথেষ্ট হচ্ছে; "cosmopolitanism"-এর বিরুদ্ধে সোভিয়েটের এই প্রচার যে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদেরই সংস্করণ মাত্র এই কথা বলা হচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে "Western culture" বাঁচাতে হলে সোভিয়েটের বিনাশসাধন যে প্রয়োজন তা বার্ট্রাণ্ড রাসেল থেকে আরম্ভ করে বহু বিখ্যাত ব্যক্তির মুখেই শোনা যাচ্ছে।

স্টক্‌হল্‌মে এক বক্তৃতায় সোভিয়েট সাহিত্যিক ইলিয়া ইরেনবুর্গ যা বলেছিলেন সেটা উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না :—"যুদ্ধ যারা

চায় তারা তথাকথিত 'প্রতীচ্য সংস্কৃতি' নামে এক বস্তু আবিষ্কার করে যারা শান্তির জন্য সংগ্রামে নেমেছে তাদের বিরুদ্ধে খাড়া করেছে। যারা হাসি একেবারে ভুলে যায় নি তাদের কাছে আমি প্রশ্ন করি: "ফরাসী বৈজ্ঞানিক বের্থলে, পাস্ত্যর্ ও ক্যুরি-র কাজের কদর কে বেশী করে—অ্যাচিসন্ সাহেব না জোলিয়োক্যুরি? লভ্র্, উফিৎসি, প্রাদো চিত্রশালার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আগ্রহ কার বেশী—জেনারল ফ্র্যাঙ্কোর না পিকাসো-র? আজকের দিনে শেক্সপীয়রের অভিনয় দেখে এবং বোঝে কারা—মিসিসিপির সম্ভ্রান্ত, পরশ্রমভোগী মালিকরা না সোভিয়েটের সাধারণ মানুষ? শান্তির জন্য যারা সংগ্রাম করছে, তাদের মতামত যাই হোক না কেন, আমরা আবার সবাইকে শুনিয়ে বলব যে আমরাই প্রকৃতপক্ষে মানব সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখছি। ইয়োরোপের বিপুল, প্রাণবন্ত মধুভাণ্ডকে আমরা নষ্ট হতে দেব না, সকলের প্রিয় নগর, চিত্রশালা, বিদ্যায়তনকে আমরা রক্ষা করছি। সভ্যতার জন্মভূমি, জাগ্রত এশিয়ার সংস্কৃতিকে আমরাই রক্ষা করছি।"

সাহিত্য শিল্পের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকতা (internationalism) যে বিশ্ববিরাজী (cosmopolitanism) রূপ পরিগ্রহ করবে, এ কথা সোভিয়েট লেখক ও শিল্পীদের কাছে অগ্রাহ্য। তাঁদের মতে আন্তর্জাতিকতা (অর্থাৎ জাতিবৈরীশূন্য মনোভাব) বিশ্ববিরাজ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক তো বটেই, একেবারে পরস্পরবিরোধী। প্রকৃত আন্তর্জাতিকতা কখনও জাতীয় সত্তার শক্তি ও গভীরতাকে অস্বীকার করে না; অপরপক্ষে সাহিত্য ও শিল্প জনজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রেখে এবং জাতির বিশিষ্ট ঐতিহ্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠ হয়ে তবেই গরিষ্ঠ বলে স্বীকৃত হয়। মস্কোর সাপ্তাহিক 'অগ্নিয়েক্' পত্রিকার সম্পাদক সুর্কভ্ সম্প্রতি ভারতীয় সাংবাদিক ইক্বাল সিংকে বলেছিলেন: "প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব মূর্তি আছে; মহৎ শিল্প ও সাহিত্য যে জাতি থেকে উদ্ভূত তার মূর্তিকে প্রতিফলিত না করে পারে না"। জাতির এই 'মূর্তি'-কে বিশ্ববিরাজ বিকৃত করে ফেলে; শিল্পীকে তার স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে ছিনিয়ে নিলে তার প্রেরণার উৎস ক্রমে

শুকিয়ে যায়। গাছের শিকড় কেটে দিলে মাটি থেকে রস সংগ্রহ করা যেমন অসম্ভব হয়, স্বীয় ক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হলে শিল্পীও তেমনই বন্ধ্যা হয়ে পড়ে। সমাজে যখন ভাঙন ধরে, বর্তমানের ব্যর্থতা ও ভবিষ্যতের ভয়াবহতা যখন প্রকট হয়ে ওঠে, প্রাচীন জীবনধারার প্রতি অবজ্ঞা ও নবজীবন প্রতিষ্ঠায় অনীহা যখন মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে, যখন মুখ্য অনুভূতি হয়ে দাঁড়ায় জীবনের অসার্থকতা ও ক্রমবর্ধমান বিড়ম্বনা, তখন কোথাও খেই না পেয়ে, কোথাও খুঁটি খুঁজে না পেয়ে শিল্পী নিজেকে মনে করে বানের-জলে-ভেসে-আসা খড়কুটোর মতই নিরালম্ব ও নিরাশ্রয়—তার দেশ নেই, জাতি নেই, মমতা নেই, আছে শুধু একান্ত স্বকীয় প্রতিভা এবং তার অনিবার্য ব্যর্থতা সম্বন্ধে নিশ্চিতি।

এই বিশ্ববিরাজী মনোবৃত্তিকে আজ শুধু মুষ্টিমেয় স্বয়ং-সম্পূর্ণ শিল্পীর চিত্তবিলাস বললে ভুল হবে। একদা নিশ্চয়ই বলা চলত—

"দেশে দেশে মোর ঘর আছে, আমি
সেই দেশ লব যুঝিয়া।"

সংকীর্ণ, আত্মম্ভরী, শক্তিলোভী, জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে কণ্ঠ উত্তোলন করা একসময় শুধু নির্দোষ নয়, শিল্পীর পক্ষে অবশ্যকর্তব্য ছিল। কিন্তু আজ পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। অনেকে যাঁরা শিল্পজগতে "cosmopolitan", যাঁরা Huxley, Auden, Isherwood-এর মত বস্ত্রপরিবর্তনের মত দেশ পরিবর্তন করেন এবং "Ape and Essence"-জাতীয় রচনায় মানুষ জাতের প্রতি অপার ঘৃণা প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হন না, Jean-Paul Sartre এবং Albert Camus-এর মত যে বহু প্রশংসিত "Existentialist"-রা বলেন, "There is only one philosophic problem which is truly serious, and that is suicide"; যে বিশ্রুতকীর্তি নাট্যকার Eugene O' Neil বলেন, "The life of a pipe dream is what gives life to the whole mis-begotten mad lot of us, drunk or sober"; যে Henry Miller ("already among the greatest contemporary writers")

বলেন, "My home? Why, it is the world, the whole world!" আর সঙ্গে সঙ্গে নীগ্রো, ইহুদী, ইতালিয়ান্ ও অন্যান্য "primitive races" সম্বন্ধে অপরিসীম অবজ্ঞা অবলীলাক্রমে প্রকাশ করেন এবং বলেন, "Action, as expressed in creating a work of art is a concession to the automatic principle of death", তাঁরা এবং তাঁদের মত আরও অনেকে শুধু প্রলাপ বকে সারা হচ্ছেন বললে একেবারে ঠিক হবে না। সর্বপ্রকার প্রগতির এঁরা আজ বিরোধী; সোভিয়েট এঁদের চক্ষুশূল; সাধারণ মানুষ (তা যে কোন দেশের হোক না কেন) এঁদের প্রচণ্ড ঘৃণা ভিন্ন অন্য কোন অনুভূতি উদ্রেক করে না; দেশের মাটির প্রতি মমতা এঁদের কাছে নিছক হাস্যকর কাণ্ড; এঁদের একান্ত উপজীব্য হল আত্মশ্লাঘা—আর এঁদের রচনা ছড়িয়ে দেয় এঁদেরই বিকারগ্রস্ত মনের কদর্য বিষ, এঁদের তূণ থেকে নিক্ষিপ্ত শরের লক্ষ্য হল মানুষের আত্মসম্মান, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস, একযোগে নবসৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হওয়ার আগ্রহ। শিল্প জগতে এঁরাই হলেন প্রতিক্রিয়ার নির্লজ্জ সৈনিক। "বিশ্ব" (cosmos) শব্দটি ব্যবহার করে নিজেদের মনের ব্যাপ্তি ও ঔদার্য প্রকাশ করতে এঁরা চান বটে, কিন্তু এঁদের মুখোস ভেদ করে আসল চেহারা সহজেই সকলের চোখে ধরা পড়ে যাবে।

বিশ্ববিরাজের (cosmopolitanism) বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে সোভিয়েটে রুশসংস্কৃতির আধিপত্য বিস্তার ঘটছে বলে যে অভিযোগ পশ্চিম ইয়োরাপ ও আমেরিকা থেকে প্রায়ই এসে থাকে তার জবাবে সোভিয়েট পক্ষের বক্তব্য খুবই সুস্পষ্ট। সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত নানা জাতির স্বতন্ত্র, স্বাধীন অথচ দ্রুত অগ্রগতি সোভিয়েটে এতই নিঃসন্দিগ্ধ, সমান অধিকারের ভিত্তিতে বিভিন্ন জাতির সহযোগিতা সেখানে এতই দ্বিধাহীন ও সফল, যে শত্রু পক্ষও তা অস্বীকার করতে পারে না। সোভিয়েট দাবী করে যে তাদের রাষ্ট্র হল বর্তমান যুগে প্রকৃত আন্তর্জাতিকতার (internationalism) জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। সোভিয়েট দেশে রুশ অধিবাসীদের সংখ্যা হল পাঁচ কোটিরও বেশী; দাঘেস্তান পর্বত অঞ্চলে

আবর্তসি (avartzi) জাতির অন্তর্ভুক্ত লোকসংখ্যা হল কয়েক হাজার মাত্র ; কিন্তু তাদেরও নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি বিকাশে সহায়তা করে সমগ্র রাষ্ট্র ; কারণ সোভিয়েট পরিবারে কোন জাতিভেদ নেই, বর্ণবৈষম্যের ভিত্তিতে বঞ্চনার ব্যবস্থা নেই। কাজাক্ জাতির নিরক্ষর চারণ অধুনামৃত জাম্বুল (Jamboul) সোভিয়েট ভূমির সর্বত্র রাজোচিত সম্মান পেতেন, কাজাক্ সংস্কৃতি আজ বহু শতাব্দীর সুষুপ্তির পর জেগে উঠে এগিয়ে চলেছে। আজেরবাইজানের মহাকবি নিজামী প্রায় ৮০০ বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন ; তাঁর স্মৃতিতর্পণের জন্য সোভিয়েটের সর্বত্র সংস্কৃতি উৎসব হয়েছিল। তাজিকিস্তানের কবিশ্রেষ্ঠ সদরুদ্দীন আইনী সম্বন্ধে সোভিয়েটের নানা ভাষায় গ্রন্থ প্রকাশ হয়েছে, তাঁর জীবনী নিয়ে চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে, বৃদ্ধ হলেও তাঁকে দেশবাসী সসম্মানে সোভিয়েট পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত করেছে। মস্কো থেকে চার হাজার মাইল দূরে, একেবারে এশিয়ার মর্মস্থলে অবস্থিত টুভা (Tuva) সম্বন্ধে Douglas Carruther তাঁর "Unknown Mongolia" গ্রন্থে লিখেছিলেন, "this race must soon disappear" ; সেখানকার অধিবাসীরা পাশ্চাত্ত্যের গণতন্ত্রবর্গী সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে পড়লে লেখকের ভবিষ্যদ্বাণী নিশ্চয়ই ফলে যেত। কিন্তু সোশালিষ্ট সমাজ-ব্যবস্থায় আজ তাদের মধ্য থেকে আসছে চিত্রকর, অভিনেতা, শিল্পী, বৈজ্ঞানিকের দল। দৃষ্টান্ত বাড়ানো অত্যন্ত সহজসাধ্য ব্যাপার, কিন্তু তার কোন প্রয়োজন নিশ্চয়ই নেই।

হয়তো কেউ মন্তব্য করতে পারেন যে সোভিয়েত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতি বিকাশে সহায়তা করেও রুশসংস্কৃতির প্রাধান্য অপ্রতিহত থাকে ; তাই 'বনগাঁয়ের শিয়াল রাজা' হয়ে সোভিয়েট হয়তো সেই ঔদার্য দেখাচ্ছে। কথাটা কিন্তু অত্যন্ত অসঙ্গত হবে। সোভিয়েটের বাইরে রয়েছে যে বিরাট মানব পরিবার, তার সঙ্গে সোভিয়েটেয় সম্পর্ক এবং তার প্রতি সোভিয়েটের মনোভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। বিশ্বসাহিত্যে যা কিছু জীবন্ত, শিল্পের সোনার কাঠির স্পর্শে যা কিছু মোহনীয়, তাকে সংগ্রহ করা ও জনতার সামনে পরিবেশন করায় সোভিয়েটের আগ্রহ ও উদ্যমের সীমা পরিসীমা নেই। তাই

দেখি যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার মাত্র পাঁচ বৎসরের মধ্যে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষায় লেখা সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক রচনা সোভিয়েট দেশের নানা ভাষায় অনূদিত হয়ে ন্যূনপক্ষে তিন কোটি গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছে ; ব্রিটেন ও আমেরিকায় এ রকম ঘটনা অকল্পনীয়। শেক্সপীয়রের দেশবাসীরা সোভিয়েটের বিভিন্ন অঞ্চলে—যাদের আদিম, অসভ্য বলে আমরা মনে করি তাদেরও নবনির্মিত রঙ্গমঞ্চে —শেক্সপীয়রের নাটক কি ভাবে এবং কত আনন্দ ও উদ্দীপনার মধ্যে অভিনীত হয় জানলে লজ্জায় মাথা হেঁট করতে বাধ্য হবে। তুলসীদাসের রামায়ণ থেকে রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী পর্যন্ত আমাদের সাহিত্য সম্বন্ধে সোভিয়েটের আগ্রহের খবর আমরা মাঝে মাঝে পাই। আধুনিক যুগে চীনের শ্রেষ্ঠ লেখক লু-সিনের রচনা অনুবাদে সোভিয়েটের প্রসিদ্ধ লেখক ফাদেইয়েভ্ স্বয়ং প্রবৃত্ত হওয়ার কথা নিজে বলেছেন। ফির্দৌসী সম্বন্ধে তথাকথিত মুসলিম দুনিয়ার চেয়ে সোভিয়েট সাহিত্যসেবকদের অনেক বেশী আগ্রহ এবং অক্লান্ত পরিশ্রম দিয়ে সে-আগ্রহের প্রমাণ তাঁরা দিয়েছেন।

আরও দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে যাওয়ার কোন হেতু নেই। জাতিবৈরী যে সোভিয়েট দেশে নেই, এ কথা অবিসম্বাদী সত্য বলে সর্বত্রই স্বীকৃত হয়েছে। তাই বিশ্ববিরাজ (Cosmopolitanism) সম্বন্ধে সোভিয়েট সাহিত্যিক ও শিল্পীদের মনোভাব লক্ষ্য করার গুরুত্ব আছে। ইতিপূর্বে উল্লিখিত সাংবাদিক ইকবাল সিং সোভিয়েট দেশ পর্যটনে গিয়ে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করেছিলেন। তিনি বলেন যে বিশ্ববিরাজ বিষয়ে এই সিদ্ধান্ত হঠাৎ কেউ সেখানে সকলের উপর চাপিয়ে দেয় নি; বহু দিন ধরে দেশব্যাপী আলোচনা চলেছিল, আর আলোচনায় শুধু লেখক নয়, পাঠকরাও যোগদান করেছিল। বিশ্ববিরাজী মনোবৃত্তির বিরোধিতা করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত আন্তর্জাতিকতাকে অটুট রাখতে হবে—এই হল তাদের সিদ্ধান্ত। তারা আরও বলে যে বিশ্ববিরাজের মুখোস পরে প্রতিক্রিয়ার জঘন্য চক্রান্তে অংশীদারী করেছেন কোন কোন শিল্পী জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারে হোক। এরূপ ব্যবহারের ফল

অত্যন্ত মন্দ ; তাই বিশ্ববিরাজী মনোবৃত্তিকে একটা নির্দোষ চিত্তবিলাস মনে না করে অপরাধ মনে করাই সঙ্গত।

সাধারণ জীবনে "Cosmopolitanism"-এর বিড়ম্বনা আমরা এ দেশে যথেষ্ট দেখেছি এবং দেখি। একদা খ্যাত ইঙ্গবঙ্গ সমাজ এ দেশকে দেশ বলে মানত না, কিন্তু দেশ তাদের কোথাও জোটে নি, তাই অনুভূতির দৈন্যে ও প্রকৃত কৃতিত্বের অভাবে এ-সমাজের তুলনা মেলা ভার; নতুন পথের নির্দেশ দেওয়ার তাগিদ যারা অনুভব করে, দুঃসাহসী পরিবর্তন সাধনের ব্রত যারা গ্রহণ করে, তারা অবশ্যই সমাজের বহু বিধানের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবে, কিন্তু মূলগত ভাবে জনজীবনের সঙ্গে গ্রথিত না থাকলে তাদের ব্রত উদ্‌যাপন কখনও হবে না, তাদের উদ্দেশ্য কখনও সাধিত হবে না। বিশ্ববীক্ষা প্রকৃত কর্মীকে বিশ্ববিরাজী করবে না, তার পা থাকবে শক্ত মাটির উপর, আর সেই মাটির নীচে গভীর খাতে বয়ে চলবে জীবনের জল ; দেশবাসীর শত ত্রুটি সত্ত্বেও তার মনে হবে—"We are members of one another" ; মানবঘৃণা, জাতিবৈরী, আত্ম-স্তরিতা থেকে সে দূরে থাকবে। যে পথবাসী, যে গৃহহারা, সে গতিহীন হতে বাধ্য।

বাঙালীর ইতিহাস

বহুদিন পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র একবার বলেছিলেন : "বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখনও মানুষ হইবে না।" আগে ইতিহাস আয়ত্ত করে তার পরে বাঙালী মানুষ হবে, অথবা মানুষ হওয়ার পর ইতিহাস আয়ত্ত করা সম্ভব হবে, অথবা ইতিহাস আয়ত্ত করা আর মানুষ হওয়ার কাজটা একযোগেই চলবে, এ ধরনের 'তৈলাধার পাত্র কিম্বা পাত্রাধার তৈল'-জাতীয় তর্ক তুলে বঙ্কিমচন্দ্রের কথার কদর্থ করা অসঙ্গত ও অসমীচীন হবে। সমসাময়িক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে ঔৎসুক্য ও আগ্রহের সম্পূর্ণ অভাব লক্ষ্য করে বঙ্কিমচন্দ্র ও বিদ্যাসাগরের মত মহদাশয় মনীষী ব্যথিত হয়েছিলেন, সাধ্যানুসারে বাংলার ও বাঙালীর ইতিহাস পুনরুদ্ধারের চেষ্টাও তাঁরা করেছিলেন।

নিছক জ্ঞানানুসন্ধিৎসা ছাড়া নিশ্চয়ই অন্তত আরও দুটো কারণে বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশের ইতিহাস সম্পর্কে অক্লান্ত আগ্রহ পোষণ করতেন। প্রথম হল তাঁর স্বাজাত্যাভিমান, যাকে ইতিহাসের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা অপরিহার্য ছিল। আর দ্বিতীয় কারণ হল এই যে কল্পনার ঐশ্বর্য যাঁর আছে, তাঁর কাছে অতীত যুগ-যুগান্তরে মানুষের, এবং বিশেষ করে স্বদেশবাসী মানুষের, জীবনযাত্রা, সুখদুঃখ, কীর্তি-কলাপ ও ধ্যানধারণার আলেখ্য চিত্রিত করার মত ইষ্টকর্ম অতি অল্পই থাকতে পারে। বিদ্যা, জাতিগর্ব এবং শিল্পীমন বঙ্কিমচন্দ্রকে ইতিহাসের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল।

বাঙালীর মনুষ্যত্ব আজ যথেষ্ট খর্ব হলেও বোধ হয় মনুষ্যত্ব অর্জনের পথে আমরা কথঞ্চিৎ অগ্রসর হয়েছি। তাই বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাস অন্বেষণ করে সুপরীক্ষিত তথ্য প্রচারে যাঁরা লিপ্ত আছেন, তাঁদের সংখ্যা আজ নিতান্ত নগণ্য নয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের মনের ব্যাপ্তির পরিচয় আমরা পাই যখন দেখি যে তদানীন্তন বহু পণ্ডিতের মত তিনি শুধু রাজা ও রাষ্ট্রের ইতিহাস রচনা কামনা করেন নি। বাংলার যে-ইতিহাস বলবে "রাজ্যশাসন-প্রণালী কিরূপ ছিল, শান্তিরক্ষা কিরূপে হইত? রাজসৈন্য কত ছিল, কি প্রকার ছিল, তাহাদের বল কি, বেতন কি, সংখ্যা কি?......... রাজা কি লইতেন, মধ্যবর্তীরা কি লইতেন, প্রজারা কি পাইত, তাহাদের সুখদুঃখ কিরূপ ছিল? চৌর্য, পূর্ত, স্বাস্থ্য এ সকল কিরূপ ছিল?...তখনকার লোকের সামাজিক অবস্থা কি রূপ?......বাণিজ্য কিরূপ?......পণ্যকার্য কি প্রকারে নির্বাহ হইত?"........তেমন ইতিহাসই তিনি কামনা করেছিলেন।

আবার বহু বৎসর পরে "গৌড়রাজমালা" রচয়িতা অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় নিঃসংকোচ ভাষায় বলেছিলেন, "বাঙালীর ইতিহাসের প্রধান প্রধান কথা—বাঙালী জনসাধারণের কথা।" শুধু রাজা ও রাজপুরুষদের বৃত্তান্ত নয়, শুধু মুষ্টিমেয় বিত্তবানের কাহিনী নয়, "অকীর্তিতান্ আচণ্ডালান্" প্রভৃতি সকলকে নিয়ে বাঙালীর যে-সমাজ তার ইতিহাস আমাদের চাই, বিভিন্ন সমাজবিন্যাসের উত্থানপতনের বিবরণ এবং তার প্রকৃত কার্যকারণ নির্ণয়ের উপাদান আমাদের চাই, নতুবা ইতিহাস আলস্যমোচনের প্রক্রিয়া ও অবসরবিনোদনের উপকরণ মাত্র হয়ে থাকবে।

পূর্বসূরীদের গবেষণাফল বিশ্লেষণ করে নীহাররঞ্জন রায় বাঙালীর ইতিহাস রচনার যে প্রয়াস করেছেন, তা বাঙালীর অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবী অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই রাখবে। এত বিশদ, এত পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস ভারতবর্ষীয় কোন ভাষাতেই আজও প্রকাশ হয় নি। আচার্য যদুনাথ সরকার একে "মহাগ্রন্থ" আখ্যা দিয়েছেন; তাঁর একাগ্র, তথ্যনিষ্ঠ মন এ-যাবৎ প্রায় নিছক রাষ্ট্রিক ইতিহাস নিয়ে তন্ময় থেকেছে, কিন্তু নীহাররঞ্জনের ব্যাপক প্রচেষ্টা দেখে যে তিনি বিচলিত হন নি, বরঞ্চ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে উঠেছেন, তা আচার্যবরের জাড্যলেশহীন মনীষা এবং নীহাররঞ্জনের অসামান্য কৃতিত্বেরই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

নীহাররঞ্জন বারবার সবিনয়ে জানিয়েছেন যে তিনি 'শুধু কাঠামো রচনায়' চেষ্টা করেছেন। "এই গ্রন্থের অপূর্বত্ব ও গভীর মহিমা" আচার্য যত্নাথকে মুগ্ধ করেছে; তাই তিনি এর "ত্রুটিবিচ্যুতি" থাকলেও "ছিদ্রান্বেষী"-দের বিরুদ্ধে পাঠককে সতর্ক করে দিয়েছেন।

কিন্তু "অনন্যপূর্ব" গ্রন্থ বলেই এর প্রকৃত সমালোচনা প্রয়োজন। বাংলা ভাষায় এমন বই নেই বলেই আমরা এর বিষয়বস্তু, এর গুরুত্ব, এর বিচারপদ্ধতির কথা ভাবব এবং সঙ্গে সঙ্গে যেখানে প্রলুব্ধ পাঠকের প্রত্যাশা অপূর্ণ থেকে যায় তখন তার উল্লেখ করতে চাইব। ছিদ্রান্বেষিতা-দোষে অভিযুক্ত হওয়ার আশঙ্কায় আলোচনা থেকে নিবৃত্ত থাকা অকর্তব্য হবে।

গ্রন্থপঞ্জী এবং লিপিমালা-সূচী "বাঙালীর ইতিহাস"-এর একটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য। কিন্তু বিভিন্ন পরিচ্ছেদের বক্তব্যের সঙ্গে গবেষণাফল-প্রাপ্ত তথ্যের সম্পর্ক সূচিত করা নেই। সম্ভবত নীহাররঞ্জন যাঁদের মনশ্চক্ষুর সামনে রেখে লিখেছিলেন তাঁরা "সাধারণ পাঠক" নামেই মোটামুটি পরিচিত, এবং সেইজন্য তিনি অন্যান্য ভাষায় বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে লেখা ইতিহাস গ্রন্থের রীতি অনুসরণ করেন নি। কিন্তু "সাধারণ" পাঠকের মনে এই অসাধারণ গ্রন্থপাঠের পর তথ্যসংগ্রহ ও বিচার সম্পর্কে একটা অ-"সাধারণ" আগ্রহ জাগা যখন একেবারেই অস্বাভাবিক নয়—এবং সেই আগ্রহ জাগরূক করা নীহাররঞ্জনের সুলিখিত রচনারই অনিবার্য উদ্দেশ্য—তখন তাঁর তথ্য ও সিদ্ধান্তের সঙ্গে বিভিন্ন বিদগ্ধ গ্রন্থ ও প্রবন্ধের সম্পর্ক পাদটীকায় সূচিত করা উচিত ছিল।

নীহাররঞ্জনের গ্রন্থে পুনরুক্তি দোষ মাঝে মাঝে পীড়া দেয়। এত বড় রচনায় পুনরুক্তি কতক পরিমাণে অনিবার্য হলেও একই উদ্ধৃতি একই সিদ্ধান্তের পোষণে একাধিকবার একই ভাবে দেখা দিলে অস্বস্তি লাগে। আচার্য যত্নাথ এই গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার-প্রকাশ চেয়েছেন; পুনরুক্তি বাদ দিয়ে এবং তথ্যসমাবেশকে কথঞ্চিৎ লঘু করলে রচনার হানি তো হবেই না, সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হতে পারে।

পাণ্ডিত্যের সঙ্গে প্রখর সমাজচৈতন্য একীভূত হয়েছে বলে নীহার-

রঞ্জনের বাংলার ইতিহাস রচনাক্ষেত্রে অনন্যপূর্ব রূপে দেখা দিয়েছে। কিন্তু তাঁর সমাজচৈতন্য সুসমঞ্জস সিদ্ধান্তে যেন উপনীত হতে পারে নি। তিনি অবশ্য বলেছেন—এবং বলে এই মান্ধাতাগন্ধী দেশের উপকারও করেছেন—যে যে-তথ্যের "কোন ব্যঞ্জনা নাই, যে-তথ্য শুধুই বিচ্ছিন্ন তথ্য মাত্র, কোন যুক্তিসূত্রে গ্রথিত নয়, ইতিহাসে তাহার কোনই মূল্য নাই"। সকল তথ্যের পশ্চাতে "কার্যকারণ-পরম্পরার অমোঘ নিয়ম" তিনি অন্বেষণ করেছেন। "ধনসম্বল", "শ্রেণীবিন্যাস", "দৈনন্দিন জীবন" প্রভৃতি হল তাঁর সমৃদ্ধ পরিচ্ছেদ-গুলোর আখ্যা। জনজীবনের পরিবর্তমান পর্যায়ের মধ্যে তিনি "ইতিহাসের ইঙ্গিত" খুঁজেছেন। কিন্তু সেই অন্বেষণে ব্যাপৃত হয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবৃতির জালে যেন তিনি জড়িয়ে পড়েছেন। বিভিন্ন শ্রেণীর খবর তিনি দিয়েছেন, জীবিকার্জনের বিভিন্ন উপায়ের তালিকা তাঁর কাছে পাই, আহারবিহার সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্য তিনি হাজির করেছেন, নাগরিকের বিলাসব্যসন ও দরিদ্রের বঞ্চনার প্রতিকৃতি তাঁর বর্ণনায় ফুটে ওঠে, কিন্তু সমাজপতি ও ইতরজনের পরস্পর সম্পর্ক সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা ধোঁয়াটে হয়ে যায়, উৎপাদনের উপায় ও উপকরণ বিষয়ে বহু তথ্য সংগ্রহ করেও ধনোৎপাদনে নিযুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর পরস্পর সম্পর্ক সম্বন্ধে সামান্য ইঙ্গিতের অধিক কিছু তিনি পাঠককে দেন না।

জানি বাংলার প্রাচীন ইতিহাস লিখতে হলে প্রতি পদক্ষেপে উপাদানের অভাবের জন্য আক্ষেপ করতে হয়। এ কথা নীহাররঞ্জনও জানিয়েছেন। কিন্তু জ্ঞান এবং অন্তর্দৃষ্টি যখন তাঁর নিঃসন্দিগ্ধভাবেই আছে, তখন তাঁর কাছে আমাদের প্রত্যাশা কম হবে কেন? তাঁর কাছে চেয়েছিলাম সেই গুণ যাকে নিছক পণ্ডিতেরা দুঃসাহসিকতা বলতেন, কিন্তু সেই দুঃসাহসিকতার বলে নীহাররঞ্জন নিশ্চয়ই আমাদের দিতে পারতেন প্রতিভাদীপ্ত অনুমান যা প্রতি বর্ণে নির্ভুল না হলেও প্রকৃতই "ইতিহাসের ইঙ্গিত" ফুটিয়ে তুলত।

বাংলা ও বাঙালীর সঙ্গে নাড়ীর টানে বাঁধা না থাকলে এমন বই লেখা কারও পক্ষে সম্ভব হত না। বিনয়বাহুল্য বর্জন করে নীহার-

রঞ্জন সেই দাবী করেছেন, অত্যন্ত ন্যায্যভাবেই করেছেন। সাধারণ বাঙালীর জীবনযাত্রা সম্বন্ধে নিতান্ত খুঁটিনাটি খবর নিয়ে তাই তিনি আবেগভরে আলোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর মনের মধ্যে যেন অনেকগুলো আলাদা কামরা রয়েছে—একটার দরজা খুললে অপরগুলো বন্ধ করতে হয়। তাই 'রাজবৃত্ত' অধ্যায়ে তিনি সাধারণ মানুষকে ঢোকাবার চেষ্টা করেও যেন পারেন নি। বিভিন্ন রাজশাসনের ভাগ্য পরিবর্তন ও উত্থানপতনের সঙ্গে জনসাধারণের যোগাযোগ কতটা ছিল বা না ছিল বোঝাতে পারেন নি। বাংলায় "গ্রামীণ" সভ্যতা সত্ত্বেও সমৃদ্ধ নগরজীবন কেন কি ভাবে দেখা দিল এবং নগরসমূহেরই উত্থান-পতন কিম্বা গুরুত্ববৃদ্ধি ও হ্রাস কেন ঘটল তার বিশ্লেষণ করেন নি।

ভারতবর্ষের কয়েকটী অঞ্চলের তুলনায় সংখ্যাল্প হলেও বাংলা দেশে বহুদিন থেকে শহরের অভাব ছিল না। তাদের বিবরণ নীহাররঞ্জন অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ভাবেই দিয়েছেন। কিন্তু কোন কোন যুগে বাণিজ্যসমৃদ্ধি এবং নগরশোভা যথেষ্ট বর্ধিত হলেও আমাদের "গ্রামীণ" সভ্যতা ও সমাজ অবাধ, অটুট থেকে গেল কেন, এ-প্রশ্নের অবতারণা তিনি করেন নি। আমাদের নগরপুঞ্জে মধ্যযুগীয় ইয়োরোপের মত বুর্জোয়াশ্রেণীর পূর্বপুরুষ কেন দেখা দিল না, বিপুল শিল্পবৈভব সত্ত্বেও আমাদের দেশে অবিনার্য গতিতে সমাজবিপ্লব দেখা দিল না, সে সম্বন্ধে আলোচনা তিনি করেন নি। তদানীন্তন শ্রেণী-বিন্যাস ও উৎপাদনব্যবস্থা এমন ছিল যে তার ফলে গ্রাম পরিবেষ্টিত নগরগুলির সত্তা যেন অস্বাভাবিক হয়েছিল; রাজা, রাজপুরুষ ও মুষ্টিমেয় শ্রেষ্ঠী ও ভূম্যধিকারীর বিলাসব্যসনের অনুরূপ সামগ্রী উৎপাদনেই যে শিল্প ব্যাপৃত হয়ে রইল; বহির্বাণিজ্যের প্রধান অঙ্গ যে হল বিলাস চরিতার্থকরণের উপকরণ এবং অন্তর্বাণিজ্যের বিকাশই যে তেমন হল না—ইত্যাদি বহু প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা তিনি করেন নি। প্রাচীনকালে রাষ্ট্র যে যুদ্ধায়োজন, রাজস্বসংগ্রহ এবং পূর্তকার্য বিনা বিশেষ কোন গুরুভার বহন করত না, এই তথ্যের উল্লেখ তিনি করেন নি। অথচ তা না করলে পল্লীসমাজের গঠন ও একান্ত আত্মনির্ভর সংকীর্ণতার কথা বোঝা যায় না, গ্রামের স্বল্পপরিসর

জীবনের জাড্যে জনমনের চেতনা ও বিক্ষোভ যে বাঁধা পড়েছিল, তা বোঝা যায় না।

নীহাররঞ্জনের কাছে অবশ্যই আমরা কৃতজ্ঞ, খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে খৃষ্টাব্দের ত্রয়োদশ, শতক পর্যন্ত বাঙালীর জীবনযাত্রার বর্ণনা তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় দিয়েছেন, বহু পণ্ডিতের গবেষণালব্ধ তথ্য বিচার করে তার সংক্ষিপ্তসার আমাদের জানিয়েছেন। কিন্তু যে সমস্ত প্রশ্নের কথা তাঁরই "ইতিহাসের যুক্তি" ও "ইতিহাসের ইঙ্গিত" পড়ে মনে হয়, সেগুলির সন্তোষজনক উত্তর দেন নি, প্রায়ই উত্তর দেবার প্রয়াসও করেন নি।

গুপ্তাধিকারের যুগ থেকেই আমরা বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে মোটামুটি স্পষ্ট ধারণা করতে পারি। কিন্তু সর্বভারতীয় আদর্শ সম্বন্ধে নীহাররঞ্জনের অতিরিক্ত অনুরাগ আছে বলেই বোধ হয় প্রাচীন যুগের বাঙালীর ইতিহাস রচনায় তাঁর মনোযোগ বাঙালীর তদানীন্তন জীবন থেকে যেন কিছুটা দূরে সরে গেছে।

প্রাচীন বাংলা যে বৌদ্ধ প্রধান ছিল, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রায় সমস্ত চিহ্নই সম্ভবত ব্রাহ্মণ-নেতৃত্বে বিলুপ্ত বা রূপান্তরিত করা হয়েছিল। সে-যুগের শ্রেণীসংগ্রামের এই যে নির্মম দৃষ্টান্ত আমরা পাই, তার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু নীহাররঞ্জন সে-কামনা পূরণ করেন নি; তথ্যসংগ্রহ পর্যাপ্ত নয় বলেই হয়তো করেন নি, কিন্তু ঐরূপ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার তাৎপর্য সম্বন্ধে কিছু সার্থক আলোচনা হয়তো অসম্ভব ছিল না।

খুব সম্ভবত একজন বৌদ্ধ বাঙালীর লেখা "আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্পে" রাজা শশাঙ্কের বিবরণ আছে এবং পরে প্রজারা অরাজকতার জন্য ভদ্র নামে একজন শূদ্রকে রাজপদে বরণ করেন বলে উল্লেখ আছে। এ-ধরনের তথ্যের বিচার এবং প্রজাপুঞ্জ কর্তৃক কোন ব্যক্তিকে রাজপদে বরণের তাৎপর্য সম্বন্ধে নীহাররঞ্জনের কাছে আমরা বহু শিক্ষণীয় সিদ্ধান্ত আশা করেছিলাম।

মাৎস্যন্যায়-জর্জরিত বাংলায় প্রকৃতিপুঞ্জ "দাসজীবিন্", অর্থাৎ অতি নীচ শ্রেণীর শূদ্র, প্রথিতযশা গোপালকে রাজপদে বরণ করে

ইতিহাসে নতুন এক যুগের সূচনা করে। এই বহুপ্রখ্যাত ঘটনার বিবরণ নীহাররঞ্জন অবশ্যই দিয়েছেন, কিন্তু এ-ঘটনার পূর্বমীমাংসার চেষ্টা তিনি করেন নি, জনজীবনের অসন্তোষ কি আকারে, কি প্রকৃতির নেতৃত্বে প্রকট হয়েছিল, তার সন্ধান করেন নি। হয়তো পাণ্ডিত্যের রীতি তাঁকে অনুমানের আশ্রয় নিতে দেয় নি, কিন্তু "ইতিহাসের ইঙ্গিত" এ-ক্ষেত্রে কি, সে-বিষয়ে কিঞ্চিৎ অনুমান হয়তো অবান্তর হত না।

"পঞ্চ-গৌড়েশ্বর" পালরাজগণ কিছুকাল উত্তর ভারতে সার্বভৌমত্ব উপভোগ করেন। কিন্তু সর্বভারতীয় আদর্শ এবং রাজ্যবিস্তারের অপূরণীয় কামনাই পালবংশের কাল হয়েছিল। তবে এ-কথা নিঃসন্দেহ যে কিছুকাল পালযুগে বাংলার আপামর জনসাধারণ প্রায় এক সূত্রে গ্রথিত হয়েছিল। ছড়া ও গানে তার কিছু কিছু নিদর্শন মেলে। পরের যুগের ব্রাহ্মণেরা হয়তো বৌদ্ধবিদ্বেষ বশত পালযুগের শৌর্যবীর্য ও গুণগরিমার চিহ্ন মুছে দেবার চেষ্টা করেছিল। এখন "ধান ভানতে মহীপালের গীত"-কে বদলে "ধান ভানতে শিবের গীত" গাওয়া হয়। "চৈতন্য চরিতামৃতে" দুঃখ করে বলা হয়েছেঃ "জোগীপাল ভোগীপাল মহীপাল গীত, শুনে সব লোকে আনন্দিত।"

দশম শতাব্দীর শ্রেণীসংগ্রামের কথা নীহাররঞ্জন যত ভালো করে বলতে পারেন তেমন হয়তো আর কেউ পারেন না, কিন্তু সে-চেষ্টা তিনি করেন নি। জানতে ইচ্ছা যায়, "আগডোম বাগডোম ঘোড়া-ডোম সাজে···সাজতে সাজতে পড়ল সাড়া, সাড়া গেল বামুনপাড়া" যে-ঘটনাবলীর স্মৃতি জাগিয়ে রেখেছে, তার প্রকৃতি কি রূপ ছিল? ধর্মঠাকুরের ভক্ত লাউসেনের যে বিবরণ পাওয়া গেছে, তা থেকে জানা যায় যে সম্রাট ধর্মপালের শ্যালিকাপুত্র কামরূপ-বিজয়ী লাউসেনের দক্ষিণ হস্ত ছিল কালু ডোম। ধর্মমঙ্গলে দেখা যায় ডোম সেনাপতি ইন্দ্রমেটে গৌড়ের শহর কোটাল, একজন চণ্ডাল চেকুরের শহর কোটাল, আর চেকুরের ইছাই ঘোষ সম্ভবত গোয়ালা। "আর্যমঞ্জুশ্রী" কথিত পালরাজাদের জাতি এবং তাদের সামন্ত ও কর্মচারীদের জাতি দেখে তখনকার বাংলার সামাজিক স্বরূপ কিছুটা বোঝা যায়। বাংলার

সামাজিক চেহারা সেনযুগ থেকে দারুণ বদলে গিয়েছে। কিন্তু সেই পরিবর্তন ও তার আনুষঙ্গিক অবশ্যম্ভাবী সংগ্রামের খবর আমরা তেমন জানি না, নীহাররঞ্জনও দেন নি।

পালবংশের পক্ষে সর্বভারতীয় প্রতিপত্তির মোহমুগ্ধ হওয়া সে-যুগে একেবারেই অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু তার মূল্য দিতে হল বাঙালীকে—বিপুলবিভব ও শক্তিসম্পন্ন পালবংশের পতন ঘটল। বাঙালীর ইতিহাস বাঙ্গালী নিজে গড়বার যে-চেষ্টা কিছুকাল করল তার অবসান হল।

আভ্যন্তরীণ অসঙ্গতি যে পালবংশকে দুর্বল করে তুলছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই। কৈবর্ত-বিদ্রোহ, বরেন্দ্রীতে কৈবর্তাধিপত্য (১০৭৫-১১০০ খৃঃ), দিব্যের ভূমিকা, ক্ষৌণীনায়ক ভীমের চরিত্র ও কীর্তি সম্বন্ধে তাই অনেক কিছু জানার রয়েছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষীয় ঐতিহাসিকেরা দিব্য ও ভীম সম্পর্কে উদাসীন ও বিরুদ্ধভাবপোষক বলে যদি নীহাররঞ্জন তাদের বিষয়ে আমাদের ঔৎসুক্য পূরণ না করেন তো বাস্তবিকই দুঃখ হয়। তথ্যকে বিকৃত না করে তদানীন্তন সমাজবিক্ষোভের আলেখ্য তিনি নিশ্চয়ই দেবার চেষ্টা করতে পারতেন।

বিদেশাগত, ব্রাহ্মণ্যবাদী, রাঢ় দেশের শূরবংশ এবং পূর্ববঙ্গের বর্মণেরা পালযুগের পর এসে বাঙালীর গলায় যেন লৌহশৃংখল পরাতে আরম্ভ করে। তারপর কর্ণাট থেকে সেনেরা এসে সেই পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ করে। তাই তুরস্কের শক্তিশেল যখন বাংলার বুকে বাজল, বাঙালী ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উচ্চবংশীয়রা তখন গৌড়দেশের জাঁক করে না, করে কেবল নিজের বর্ণের ও বংশের। আচার্য ভূপেন্দ্রনাথ দত্তর ভাষায় বলতে গেলে "তারপর আসে দেবীবরের মেলবন্ধনের পালা, আর রঘুনন্দনের সতীদাহ ও আচারের কড়াকড়ির ব্যবস্থা"। এই বিবর্তনের পিছনে আছে বিক্ষোভ, আছে সংগ্রাম, আছে প্রাচীন বাংলার শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যগুলির পরাজয়।

"পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থায়" বাঙালীকে চলতে হয়েছে। কিন্তু গ্রামীণ সংস্কৃতির জাড্য সত্ত্বেও বাঙালীর ইতিহাসে আছে চলনশীলতা, আছে সংগ্রাম, আছে নৈরাশ্য, আছে দুঃসাহসিকতা।

নীহাররঞ্জনের তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু তথ্য বিচারে তাঁর সমাজসচেতন মন যদি অস্পৃষ্টকল্পনা পাণ্ডিত্যের হিমজাল থেকে আরও বেশী মুক্ত হতে পারত, তো আমাদের কৃতজ্ঞতার অবধি থাকত না।

ভূমিকায় নীহাররঞ্জন লিখেছেন: "এ-গ্রন্থ যখন আরম্ভ করিয়াছিলাম তখন বাংলাদেশ অখণ্ড এবং বৃহৎ ভারতবর্ষের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক্ত; আজ গ্রন্থরচনা যখন শেষ হইল, রাষ্ট্রবিধাতাদের ইচ্ছায় ও কূটকৌশলে দেশ তখন দ্বিখণ্ডিত এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে তাহার অনাদিকালের নাড়ীর সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন। দুই হাজার বৎসরের ইতিহাসে বাংলাদেশ কখনও এত গভীর ও ব্যাপক দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয় নাই। ইহার ফলে আজ বাঙালী-জীবন যে-ভাবে বিপর্যস্ত হইয়াছে ও হইতেছে, সপ্তম-অষ্টম শতকের মাৎস্যন্যায় এবং ত্রয়োদশ শতকের রাষ্ট্র, সমাজ ও সংস্কৃতি বিপর্যয়েও তাহা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু রাষ্ট্রবিধাতাদের ইচ্ছা যাহাই হউক, ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে সীমানার এপার-ওপার লইয়া বাংলাদেশ ও বাঙালী এক ও অখণ্ড। এই গ্রন্থে আমি সেই এক এবং অখণ্ড দেশ ও জাতিরই ধ্যান করিয়াছি। অন্যতর ধ্যান সম্ভব নয়; বহুদিন পর্যন্ত তাহা সম্ভবও হইবে না।"

এই উক্তির সম্যক অনুধাবন ও উপলব্ধি আজ নিতান্ত প্রয়োজন। বৃহৎ ভারতবর্ষের সঙ্গে সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য রাখতে হলে বাংলার ঐক্য ও অখণ্ডতা বিনা তা প্রকৃতই সম্ভব নয়; বাংলার প্রাণবস্তু তথাকথিত রাষ্ট্রবিধাতারা নিষ্পিষ্ট করলে বাংলা ও বাঙালীর পক্ষে বৃহত্তর কোন সংঘের মধ্যেই স্থান করে নেওয়া সম্ভব নয়। ভাষা, বৃত্তি ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে ভারতভূখণ্ডে বাঙালী ও অন্যান্য যে সমস্ত জাতি বাস করে, তাদের প্রাথমিক জাতীয় ঐক্য ও সত্তা স্বীকৃত না হওয়া পর্যন্ত বিড়ম্বনা অবশ্যম্ভাবী। পাকিস্তান ও ভারত নামক রাষ্ট্রদ্বয়ের মধ্যে আসমুদ্র-হিমাচল ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করার মত স্বভাবধর্ম্মবিরুদ্ধ প্রক্রিয়া তখন অনিবার্য। গ্লানিমুক্ত নূতন ভারতবর্ষ নূতন অখণ্ড বাংলা বিভিন্ন ভারতবাসী জাতির অখণ্ড ঐক্যের পরিবেশেই নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারবে। "নান্যঃ পন্থাঃ"।*

---

*এই প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী এবং হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত "প্রগতি" গ্রন্থে প্রকাশিত ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ফুটবল প্রসঙ্গে

কিছুকাল আগে খবরের কাগজের এক কোণে ছোট্ট খবর বেরিয়েছিল যে, মোহনবাগানের স্বনামধন্য খেলোয়াড় গোষ্ঠবিহারী পালকে তাঁর অনুরাগীরা একটা অভিনন্দন জানাবেন। সে অনুষ্ঠান হয়েছিল কিনা, তার কোনও খবর অবশ্য কাগজ মারফৎ আর পাই নি। তারপর সেদিন "স্বাধীনতা"-র রবিবারের সংখ্যায় হাবুল সরকার মশায়ের লেখা ফুটবল সম্বন্ধে একটা চমৎকার প্রবন্ধ পড়লাম। তাই আগেকার দিনের ফুটবল খেলার কায়দা আর ময়দানের আবহাওয়া আজকের তুলনায় কেমন ছিল, সে বিষয়ে বহু পাঠকের আগ্রহ আছে ধরে নিচ্ছি।

আমরা যখন খেলা দেখেছি, তখন গোষ্ঠ পালের দোর্দণ্ড প্রতাপ চলেছে, কিন্তু হাবুল সরকার হলেন আরও পুরোনো দিনের গুণী। আমরা তাঁকে যে একেবারে খেলতে দেখি নি তা নয়। কিন্তু ফুটবল ভালোবাসতেন বলেই তিনি তখন কালেভদ্রে খেলতেন, আর তাঁকে নামতে দেখেছি মোহনবাগানের হয়ে দ্বিতীয়শ্রেণীর খেলায়—দর্শকরা তাঁকে লক্ষ্য করে বলাবলি করেছে যে আগেকার বাঘা খেলোয়াড় বলে আজও বুড়ো হাড়ে ভেল্‌কি খেলাতে পারে।

শিবদাস আর বিজয়দাস ভাদুড়ীর মত যাঁদের খেলার তারিফে প্রাচীন ক্রীড়ামোদীরা প্রায় বিশেষণ খুঁজে পান না, তাঁদের দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয় নি। মোহনবাগানের ১৯১১ সালের শীল্ড বিজয়ী মহারথীদের মধ্যে কয়েকজনকে মাঠে দেখা গেলে লোকে আঙুল দিয়ে দেখাত—যেমন দেখাত সেণ্টার ফরোয়ার্ড অভিলাষ ঘোষকে। উয়াড়ীর হয়ে একবার ঐ মহারথীদেরই অন্যতম 'কানু'-কে (জে. রায়) খেলতে দেখেছিলাম। সেই প্রথম যুগের নামজাদা খেলোয়াড়দের সম্বন্ধে হাবুলবাবু যদি মাঝে মাঝে "স্বাধীনতা" মারফৎ

আমাদের গল্প শোনান তো চমৎকার হয়। সঙ্গে সঙ্গে হকি আর ক্রিকেটের কথাও যেন তিনি বাদ না দেন।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আগেকার দিনের কথা ভাবতে গিয়ে তাকে আজকের তুলনায় ভালো মনে করা মানুষের একটা স্বভাব। তাই আজকের ছেলেরা ভাবতে পারে যে আগেকার ফুটবলের তুলনায় আজকের খেলা নিষ্প্রভ হয়ে গেছে, এ কথা যারা বলে তারা শুধু বুড়ো হয়েছে বা হচ্ছে বলে নিজেদের যুগে সব কিছু সরেশ আর আজ সবকিছু নিরেশ বলতে চাইছে। এদিক থেকে হাবুলবাবুর লেখাটা নিশ্চয়ই অনেকের চোখ খুলে দিয়েছে। গল্প করতে বসেও তিনি বেশ নিক্তির ওজন ব্যবহার করেছেন যখনই তুলনার কথা উঠেছে। মহামেডান স্পোর্টিংয়ের দুর্জয় খেলার বাহবা তিনি করেছেন অকুণ্ঠভাবে। আর বলতে সংকোচ করেন নি যে বর্তমানে অন্তত ফুটবলের একটা বিভাগে উন্নতি হয়েছে—গোলকীপারের খেলা আগের চেয়ে নিঃসন্দেহে উঁচু কায়দার।

তবে একথা অস্বীকার করা সম্ভব নয় যে আজকের ফুটবল খেলার মান আগের তুলনায় সত্যিই অনেক নীচে চলে গেছে। এক সময় গর্ব করতাম যে আমাদের পার্টি হল একদিক থেকে সবাইয়ের সেরা —পার্টিসভ্য হিসাবে আমাদের মধ্যে আছে নানান ধরনের মানুষ, এমনকি ধ্রুপদী গাইয়ে আর ফুটবল ইণ্টারন্যাশনাল খেলোয়াড়। এটা গর্ব করার বিষয় এই জন্য যে অন্যান্য পার্টিতে নাম লেখানো সভ্য থাকে অনেক, কিন্তু আমাদের পার্টিতে কাজ না করলে কারও জায়গা নেই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলব যে বীরেন ঘোষ (যিনি এরিয়ান্সের বি. ঘোষ নামে একদা বিখ্যাত ছিলেন) সাত বছর বন্দী হয়ে কাটাবার পর থেকে পার্টির কাজে লেগে রয়েছেন। আজ তিনি যুবসংঘের একজন নেতা। তাঁর মত 'উইং' ফরোয়ার্ড, দু'পা যাঁর চলত সমান নৈপুণ্যে, শটের জোর যাঁর ছিল প্রচণ্ড, এবং (বাঙালীর পক্ষে) ঈষৎ স্থূল শরীরে ক্ষিপ্রগতি যাঁর ছিল অসাধারণ, তাঁর জুড়ি ঠিক আজকে দেখা যায় না।

লিখছি বলে খেলা সম্বন্ধে যে আমি একটা বিশেষজ্ঞ, তা

একেবারেই নয়। খেলায় কোন কালেই আমি সুবিধা করতে পারি নি, আর চোখ নেহাৎ খারাপ বলে খেলার জগতে আশা করার কোন রাস্তাই আমার ছিল না। কিন্তু আমরা সেই যুগে মানুষ হয়েছি, যখন ভাইয়েরা প্রায় সব মিলে আর মাঝে মাঝে পাড়ার দু'চারজন বন্ধুকে নিয়ে বাড়ির ছাদে কিম্বা গলির রাস্তায় বাতিল টেনিস বল কিম্বা এক পয়সা দামের নেকড়ার বল নিয়ে দিনক্ষণ বিচার না করে মাতা গেছে, ভালো খেলছে এমনি ছোট এক ভাইয়ের নাম দেওয়া হয়েছে রবি গাঙ্গুলী (যিনি মোহনবাগানের, এবং সর্বভারতীয়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'রাইট ইন' ছিলেন, অন্তত আমাদের সময়ে)। দুপুরে তিনতলার ছাদে ধুপ ধাপ শব্দ হওয়ায় গুরুজন বিরক্ত হয়েছেন, কিন্তু খেলা তবু একেবারে বন্ধ কখনও হয় নি। এখন খেলা ব্যাপারটা বেশ যেন অভিজাত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে—'ক্লাস ফাইভে'-র ছেলেরাও অন্তত তিন নম্বরের বল ছাড়া উঠোনে খেলতে নামা অমর্যাদাকর মনে করে।

ময়দানে খেলা দেখছি আমরা ১৯২১-২২ থেকে, স্কুলে যখন পড়ি সেই সময়। একটু লায়েক হবার পর দু'চারজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ভালো লীগ আর শীল্ড খেলার অনেকগুলো দেখার চেষ্টা করা গেছে। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত আমি থেকেছি বাইরে—তারপর থেকে খেলা দেখার সময় বিরল হতে শূন্যে এসে দাঁড়াবার উপক্রম করেছে।

আজকাল অনেক সময় খেলা দেখতে গিয়ে বিমর্ষ হয়ে ফিরতে হয়। কোন কোন দিক থেকে বিচার করলে খেলার বৈজ্ঞানিক কৌশলে হয়তো কিছুটা উন্নতি হয়েছে! বুট পরে খেলা ব্যাপারটা অবশ্য অগ্র-গতিরই পরিচায়ক (যদিও যে দেশে ছেলেবয়স থেকে বুট পরে আমরা খেলার সম্ভবনা রাখি না, সেখানে বুট পরা ফুটবলের ভবিষ্যত সম্বন্ধে ভাবিত হতে হবেই)। ব্যক্তিগতভাবে আজকালকার কোন কোন খেলোয়াড় রীতিমত বাহবার যোগ্য তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু খেলার প্রাণ যেন চলে গেছে, যে প্রাণ আছে তা বেশ খানিকটা বিকৃত বলেই আশঙ্কা করি।

আগেকার বড় খেলোয়াড়দের নাম করতে গেলে মুশকিলে পড়তে

হবে। অনেক ছড়িয়ে লিখলে তবে সেদিনকার ছবি ঠিকভাবে আঁকা যায়। তার সময় বা সামর্থ্য আমার নেই। তবে একথা ঠিক যে কতকগুলো নাম না করলেই নয়। গোষ্ঠ পালের নামই তো ছিল চীনের প্রাচীর—ক্যালকাটার লেফট উইং নাইট কি রকম গোষ্ঠকে দেখেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করত, তা অনেকেরই স্মরণ হবে। হাফব্যাকদের মধ্যে ননী গোঁসাই, সুধাংশু বসু, চৌকস বলাই চ্যাটার্জী (যদিও তাঁর খেলা আমার পছন্দ হত না), মণি দাস, মতি সেনগুপ্ত, তুলসী দাস, কিছুটা পরের যুগের নূর মহম্মদ প্রভৃতির নাম লিখতে লিখতে মনে পড়ছে। দুখীরামবাবুর হাতে গড়া যে সব খেলোয়াড়রা এরিয়ান্স এবং অন্যান্য ক্লাবে নাম করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'ছনে' (এস. মজুমদার), যিনি সে যুগে বুট পরে খেলতেন অবলীলাক্রমে। ফরোয়ার্ড লাইনে 'উইং' হিসাবে সামাদের তুলনা কোথাও কখনও পাওয়া শক্ত। তদানীন্তন ই. বি. আর., মোহনবাগান, মহামেডান স্পোর্টিংয়ে এই আশ্চর্য খেলোয়াড় খেলেছিলেন। এক বছরে মোহন বাগানের ফরোয়ার্ড লাইনে ছিলেন সূর্য চক্রবর্ত্তী (তিনি এরিয়ান্স এবং ইষ্টবেঙ্গলে আগে এবং পরে খেলেছিলেন), রবি গাঙ্গুলী, মোনা দত্ত, কুমার এবং সামাদ; এর সঙ্গে তুলনা করা যেত শুধু রসীদ, রহিম, রহমৎ প্রমুখ ফরওয়ার্ড-বিভূষিত মহামেডান স্পোর্টিং-এর। কুমারের মত কুশলী ও সব সময়ে মাথা ঠাণ্ডা খেলোয়াড় আর দেখা গেছে কিনা জানি না; বল উইংয়ে ঠেলে দেওয়ার কায়দায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। মোনা দত্তের মাথার হেড আর পায়ের শট ছিল প্রচণ্ড। খেলার কায়দাও ছিল সুন্দর; শরৎ সিংহ বা রহমানের নামও এখানে করা উচিত।

অনেক নাম বাদ পড়েছে, সুতরাং নামের ফিরিস্তি না বাড়ানোই হয় তো উচিত। মোহনবাগানের খেলোয়াড়দের উল্লেখ বোধ হয় বেশি হয়ে গেছে—তার এক বড় কারণ হল এই যে প্রধানত মোহন-বাগানকে কেন্দ্র করে আমাদের স্বাদেশিকতা, আমাদের ক্ষুব্ধ, আহত স্বাজাত্যাভিমান প্রকাশ পেত; এতে তখনকার দ্বিতীয় প্রধান ক্লাব এরিয়ান্সকে কিংবা পরবর্তী ইষ্টবেঙ্গল ও মহামেডান স্পোর্টিং, কিংবা

কুমারটুলী, হাওড়া ইউনিয়ন, ভবানীপুর প্রভৃতির মত দলকে খেলো বলা যায় না একটুও।

তবে এটা অবিসম্বাদিতভাবে ঠিক যে মোহনবাগানের যারা অনুরাগী, তারা মোহনবাগান পল্লী সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র আগ্রহ রাখত না। মোহনবাগানের পরিচালকদের অনেক কাণ্ড তারা রীতিমত অপছন্দ করত, কিন্তু ফুটবল মাঠে ১৯১১ সালের শীল্ড বিজয়ী মোহনবাগানকে দেশের গৌরব বলেই তারা মনের মধ্যে অমন চওড়া একটা জায়গা দিয়েছিল।

এর কারণও ছিল যথেষ্ট। ১৯২৩ সালে মোহনবাগান শীল্ড ফাইন্যালে ক্যালকাটার কাছে পরাজিত হল। তিনদিন ধরে অসম্ভব বৃষ্টিপাত হয়েছিল, মাঠ জল কাদায় একেবারে ডুবেছিল। এক রকম জোর করে সেই অবস্থায় খেলা হয় (আজকের কোন 'টিম' সে মাঠে খেলতে রাজী হত না) আর বিপর্যয় ঘটে। এর পেছনে বিদেশী প্রভু-জাতির কারসাজি আমরা দেখেছিলাম। আর সেটা যে আমাদের ভুল নয়, তা বারবার প্রমাণ হয়েছে। ক্যালকাটার মেম্বারদের বেঞ্চিগুলো তখন ভর্তি থাকতো, আর মোহনবাগানের পরাজয়ে সাদামুখোদের উল্লাস আমরা বহুবার দেখেছি। ক্লেটন নামে এক রেফারী ছিলেন ; বুদ্ধিমান লোক, খেলার আইনকানুন তাঁর নখাগ্রে, কিন্তু ভারতীয় বিদ্বেষে ভরপুর—অথচ তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলার লোক তখন হোমরা-চোমরাদের মধ্যে ছিল না।

১৯৩৬ সালে একটা ঘটনা ঘটে—যার মধ্য দিয়ে এই রেফারী বিভ্রাট ব্যাপারের মর্মার্থ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গোষ্ঠ পাল মোহনবাগানের ক্যাপ্টেন হিসেবে ছিলেন ধীর, স্থির, সুবিবেচনার প্রতীক ; কোন দিন কেউ তাঁকে ফাউল খেলতে দেখে নি, রেফারীর নির্দেশ অমান্য করতে তো নিশ্চয়ই দেখে নি। সেদিন তিনি ক্যালকাটার সঙ্গে এক খেলায় একেবারে ধৈর্য হারিয়ে ইচ্ছা করে হ্যাণ্ডবল করলেন, মাটিতে শুয়ে পড়লেন, ছখানা গোল নিজেদের বিরুদ্ধে করে দিলেন। পক্ষপাতী রেফারীর দুষ্কর্ম বহু বছর সহ্য করার পর তাঁর এই বিদ্রোহ যারা দেখেছে, তারা তা ভুলবে না। ইংরেজ খেলোয়াড় অনেক সময় অবশ্য

আমাদের চেয়ে ভালো খেলতো, কিন্তু ন্যায়যুদ্ধ তাদের সঙ্গে আমাদের প্রায়ই হত না—এটা অবধারিত সত্য, পক্ষপাতী মনোভাব নয়।

'কিউ' করে টিকিট কেনার রেওয়াজ তখন আজকের মত হয় নি। টিকিটঘরের সামনে ভিড়ের মধ্যে হুমড়ি খাওয়া, মাঝে মাঝে পুলিস ঘোড়সওয়ারের তাড়া খাওয়া ইত্যাদি প্রায়ই ভাগ্যে জুটতো। একবার বেশ মনে আছে ঘোড়সওয়ার বাহিনীর আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হওয়ার পর আবার জড় হতে গিয়ে দেখি যে পাশেই আমাদের প্রেসিডেন্সী কলেজের দুইজন স্বনামধন্য অধ্যাপক। তাঁদের মধ্যে আজও একজন জীবিত। নাম করার সাহস নেই। সাড়ে চার আনার গ্যালারীর টিকিট কিনে ঢুকে দেখি সামনেই প্রশান্ত মূর্তিতে বসে আছেন দুইজন সহকর্মীকে নিয়ে রিপণ কলেজের অধ্যক্ষ সুপণ্ডিত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ মহাশয়। আজকাল হোমরাচোমরারা নিমন্ত্রিত হয়ে অন্যত্র বসেন, মাঠেরই শোভা বর্ধিত করেন, খেলা দেখে উপভোগ করার জন্য প্রায়ই নয়। যাক সে কথা।

আজকে খেলার রেষারেষি অন্য একটা ঢঙ নিয়েছে, যেটা আমাদের কাছে খারাপ লাগে। আগের যুগে খেলার মাঠে বাঙ্গালীর (বা কদাচিৎ বাইরের কোন অবাঙ্গালী ভারতবাসীর) কৃতিত্ব দেখে আমাদের বুক দশ হাত হত, পরাধীনতার জ্বালা ভোলবার জন্য দরকার হয় অনেক রকম প্রলেপ, আর এই খেলা ব্যাপারটা তেমনই একটি প্রলেপ জোগাত। তখন তাই বোম্বাইয়ে Quadrangular ক্রিকেটে সাহেবদের গো-হারাণ হারাচ্ছে বলে ভিঠল্, সি. কে. নাইডু, ওয়াজির আলি প্রভৃতির বাহবা শুনে আমরা স্বস্তি পেতাম। আর কেল্লার গোরাদের কিম্বা অপিসের সর্বশক্তিমান সাহেবদের মধ্য থেকে বাছাই করা খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে আমাদেরই কৃশকায় কিন্তু ক্ষিপ্রগতি ও বুদ্ধিমান খেলোয়াড়দের সাফল্য আমাদের মনে স্বস্তি আনত। মোহন-বাগানের পরাজয়ে বাড়িতে হাঁড়ী চড়া বন্ধ ইত্যাদি রটনার পেছনে যে সত্যবস্তু ছিল, তার ধারণা পর্যন্ত আজ অনেকের কাছে অসম্ভব।

আজকের রেষারেষির ঢং যে কুৎসিত হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে, তার একটা কারণ নিশ্চয়ই এই যে খেলা দেখার বিড়ম্বনা কমছে না। বিশ

বছর আগে মানুষ যা সইত, আজ আর তা সে সইতে পারে না। তাই স্টেডিয়াম না হওয়া পর্যন্ত শুধু যে ক্রীড়ামোদীদের অস্বাচ্ছন্দ্যের অবধি থাকবে না তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে যারা খেলা দেখে অসম্ভব অবস্থায়, তাদের 'নার্ভ' হবে খারাপ—এত খারাপ যে মনমেজাজ বিগড়ে গেলে রেফারীর উপর চড়াও হওয়া বা খেলোয়াড়দের মধ্যে যারা প্রিয়পাত্র তাদেরই উপর চটে তাঁবু পোড়াতে যাওয়া দৈনন্দিন ঘটনা হবার জোগাড় আজ হচ্ছে। খেলায় যাদের আগ্রহ আছে তাদের তাই সকলের আজ এই 'স্টেডিয়াম' ব্যাপারের দিকে নজর দিতে হবে। যে শহর হল ফুটবল পাগল, সেখানে 'স্টেডিয়াম' নেই—এর রহস্যভেদ করলে আজকের সমাজ জীবনে যে কত গ্লানি কত দিকে ছড়িয়ে রয়েছে তা খেলার দৃষ্টিকোণ থেকেই বুঝতে পারব।

কেরলে কয়েকদিন

ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে দিন ছয়েক মাত্র ছিলাম ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন রাজ্যে। কিন্তু ঐ কটা দিনের কথা সহজে ভোলবার নয়।

গিয়েছিলাম রাজনীতিক কাজে—নির্বাচন তখন পুরো দমে চলছে, আমাদেয় পার্টি, কম্যুনিষ্ট পার্টির তরফ থেকে সেই নির্বাচনী লড়াইয়ে যোগ দিতেই গিয়েছিলাম। একথা আজ সবাই জানে যে ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন রাজ্যে কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের প্রসার খুব হয়েছে, আর কম্যুনিষ্ট পার্টির কদর সেখানে সাধারণ লোকের মধ্যে রীতিমত বেশী। কিন্তু শুধু সেই কারণে যে সেখানে কদিন ঘুরে আসাটা সহজে ভোলবার নয়, তা বলছি না।

জোর করেই অবশ্য বলব যে কোন একজন কম্যুনিষ্টের পক্ষে ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে গেলে তার বুক দশ হাত না হওয়াই আশ্চর্য। বিশেষ করে নির্বাচনের হিড়িক যখন চলছে, তখন কম্যুনিষ্ট পার্টি আর তার লাল ঝাণ্ডা সম্পর্কে সেখানকার সাধারণ লোকের মমত্ববোধ আর উৎসাহ উদ্দীপনা যে কত, তা জানার সুযোগ সহজে এবং খুব বেশী আসে। তাই কম্যুনিষ্ট হিসাবে ঐ সময় সেখানে ঘুরে আসার কথা নিশ্চয়ই মনে রেখে দেবার মত একটা ব্যাপার।

ব্যাঙ্গালোর থেকে কোচিন যাবার পথে এরোপ্লেন নামে কইম্বাটোরে। ছোট্ট বিমান ঘাঁটি, সেখান থেকে কইম্বাটোরের কল-কারখানা দেখা যায় না। কিন্তু কইম্বাটোরের আগে আর পরে দেখা যায় পাহাড়। পাহাড়ের পর পাহাড়ের সারি, কবিতায় যে পাহাড়কে 'ধ্যানগম্ভীর' বলা হয়েছে তার যেন হদিস্ স্পষ্ট করে মেলে আকাশ থেকে। আর যেতে যেতে মনে হয় এই পাহাড় থেকেই পাথর সংগ্রহ করে সুদূর দক্ষিণের অপূর্ব মন্দির এবং মন্দির-নগর তৈরী হয়েছে, যার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য যেন ডানা মেলে আকাশের তারাকে স্পর্শ করেছে,

আর সঙ্গে সঙ্গে অতি সাধারণ জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী যোগাযোগ রেখেছে।

কোচিন পৌঁছাবার আগে থেকে দৃশ্য একেবারে বদলে যায়—সেখানে পাহাড় নেই, বরং আছে জলাভূমি। সমুদ্র থেকে হাজার শাখা দেশের ভিতরে ঢুকে পড়েছে, আকাশ থেকে মনে হয় যেন জালি-করা রয়েছে চারদিকে। দূরে সমুদ্র, ঢেউ চোখে পড়ে না—নীচে জলের রেখা আর ঘন সবুজের ছড়াছড়ি।

প্লেন থেকে নেমেই শুরু হল ছোটাছুটি। এর্ণাকুলম শহরটাকে কেন্দ্র করে বেরুতে হল সভার পর সভা করার কাজে। যেতে হল দক্ষিণে কুমারিকা পর্যন্ত আর অন্যদিকে কোচিনের উত্তর সীমানায়। মোটর গাড়ীতেই যাতায়াত, তা নইলে তাড়াতাড়ি নানা জায়গায় যাওয়া সম্ভব নয়। তবে মাঝে মাঝে জল পার হতে হয়েছে; তখন হয় অপর পারে গিয়ে গাড়ী বদলানো, নয়তো পূর্ব বাংলার মত গাড়ী-শুদ্ধ 'বার্জে' চাপিয়ে পার হওয়া।

ছ'দিনে প্রায় একশো ছোট-বড় সভায় বক্তৃতা করতে হয়েছিল। যতগুলো সভার আয়োজন সম্বন্ধে পাটি ওয়াকিবহাল ছিল, সেগুলো ছাড়াও বহু সভা মাঝপথে করে যেতে হত—হঠাৎ গাড়ী থামিয়ে লাল ঝাণ্ডার জয় রব তুলে একদল দাবী করল মালা পরতে হবে আর দুটো কথা বলে যেতে হবে। এ-রকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল বার বার। মালারও বৈচিত্র্য ছিল যথেষ্ট; বুনো ফুলের মালা থেকে আরম্ভ করে মোটা লাল পৈতার মত গোছা, কিম্বা চমৎকার সুগন্ধি আর রূপোলি বা সোনালি কাজ করা মালার বোঝা বইতে হত প্রত্যেক জমায়েতে। গাড়ীতে লাল নিশান দেখে রাস্তার মজুর আর মাঠের চাষী আর ভিটায় বিশ্রামরত গরীব আওয়াজ তুলে মনের উৎসাহ জানিয়েছে। মালয়ালম্ ভাষায় 'কমরেড' শব্দের তরজমা করেছে 'সখা'; কী ভাগ্যি যে মেয়ে-কমরেডদের বেলায় 'সখী' শব্দটা নাকি চালু নয়! "সখা—জিন্দাবাদ" এতবার শোনা গেল যে 'জিন্দাবাদ' কথাটার ভারত-পরিক্রমা বেশ মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল।

নিজের দেশের সৌন্দর্য সম্বন্ধে কেরলীয়েরা খুবই সচেতন। বাইরে

থেকে কেউ এলে তাকে শুনতেই হবে প্রশ্ন: "আমাদের দেশ কেমন লাগছে?" উত্তর সম্বন্ধেও প্রশ্নকর্তাদের মনে কোন সন্দেহ নেই—কেরলভূমির নিসর্গ শোভায় বিদেশী যে অভিভূত হবে, এ তারা ধরেই নিয়েছে। দেশটা সত্যই ভারী সুন্দর। একেবারে দক্ষিণে কন্যাকুমারী মন্দিরের নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসী তামিলভাষী; ঐ অঞ্চলের প্রাকৃতিক রূপ অনেকটা তামিলনাদেরই মত। সেখানকার পাহাড় রুক্ষ; মানুষের চেহারাতেও কমনীয়তার ভাব কম। কিন্তু ত্রিবান্দ্রমের অল্প কিছুটা দক্ষিণ থেকে দেশের ছবি বদলে যায়; পাহাড়ে গাছপালা বেশী, ঘাস গজায় যথেষ্ট, চারদিকের রঙে তামিলনাদের শুষ্কতার কথা ভুলিয়ে দেয়। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের যে অঞ্চল সমতল, সেখানে জলের ভাগ বেশী; শাখাপ্রশাখা দিয়ে দেশের মধ্যে সমুদ্রের জল ঢুকে এসেছে; নারকোল গাছ অসংখ্য, জলের ধারে নারকোল গাছের সারির আর শেষ নেই। নদী আছে অল্প, আর তার অধিকাংশে বালির ভাগ কম নয়। আল্‌ওয়াই নদীর ধারে আল্‌ওয়াই শহরে যে সভা হয়েছিল, তার কথা স্পষ্ট মনে ভাসছে—পাশে বালির নদী, দূরবিস্তৃত, ছোট্ট টিলা ভেঙে সভাস্থলে নামতে হল, তারায় ভরা আকাশ, তার কোলে অল্পায়তন শহরের রাস্তায় আলো টিমটিম করছে, ত্রিশ হাজারের শহরে সভা হলেও জমায়েতে বোধ হয় দশ হাজার হাজির। দূর থেকে অনেকেই হেঁটে এসেছে বক্তৃতা শোনার জন্য, ঠিক যেমন যাত্রা শোনার জন্য বাংলার পল্লী অঞ্চলে এখনও বহুজন এসে উপস্থিত হয়। যাত্রামোদীদের মত এই বক্তৃতা-শ্রোতাদেরও প্রত্যাশা হল আমাদের কাছে কিছুটা অদ্ভুত। ২।৩ ঘণ্টা সভা চলার পর, কিম্বা এক জন বক্তা সারাক্ষণ চীৎকার করে যাওয়া সত্ত্বেও, তাদের ধৈর্যচ্যুতি তো নেই-ই, বরঞ্চ তখনই তারা বেশ স্থির হয়ে বসেছে, আরও অনেকক্ষণ পালা চলবে ধরে নিয়েছে আমাদের পক্ষে ব্যাপারটা কষ্টকর, কিন্তু স্থানীয় বক্তারা এ-ব্যাপারে অভ্যস্ত, তিন থেকে পাঁচ ঘণ্টা একটানে বক্তৃতা করে না যেতে পারলে আসল বক্তা বলে সুনাম সেখানে সাধারণত হয় না।

গভীর রাত্রে সভা করা তাই সেখানে একেবারেই কঠিন বলে মনে

করা হয় না। তাই ছাত্রদের এক সভা হল কায়মকুলমে, রাত প্রায় সাড়ে এগারোটায়। একেবারে দুপুর রাতে কোট্টায়ামে সিমেণ্ট শ্রমিকদের সভা হল। টিলার উপর সভা, শ্রোতারা বসেছে টিলারই থাকে থাকে। প্রাচীন গ্রীক নাট্যশালার মত ব্যাপার বললেই চলে। নাট্যশালার কথা মনে পড়ল বিশেষ করে, কারণ সিমেণ্ট কারখানার মজুরেরা নাচ দেখালেন, ঢোলক এবং অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র নিয়ে গান শোনালেন, নাচের সময় হাতে নিলেন মস্ত বড় তীর ধনুক। ত্রিবান্দ্রম্ শহরে ত্রিশ হাজারের সভা হয়েছিল, তার পাশে নিয়ন্ আলো জ্বলছে নিভছে আর পরিচ্ছন্ন বাস্ যাতায়াত করছে—তার চেয়ে অনেক ভালো লেগেছিল এই সিমেণ্ট শ্রমিকদের সরল, অনাড়ম্বর বৈঠক।

আলেপ্পি শহরের কাছে কালাভুর বলে এক জায়গার সভা বেশ মনে আছে। সমুদ্র থেকে বেশী দূর নয় বলে সভাস্থল বালিতে ভরা বিশ হাজার লোক বসে আছে। প্রায় সবাই শ্রমিক, মেয়েদের সংখ্যা কম নয়, অনেকেই শিশু কোলে নিয়ে এসেছে। জমায়েতের মধ্যে দিয়ে যেতে হল সাজানো মঞ্চের দিকে—সবাই হাত ধরতে চায়, হাত ধরার মধ্য দিয়ে মনের আবেগ বোঝাতে চায়। এমনি সভায় গিয়ে কতবার মনে হয়েছে, আমার দেশের মানুষের আজ কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের কাছে কত প্রত্যাশা, আর এখনও সে-প্রত্যাশার কত অনুপযুক্ত আমরা!

"ঐক্যম্ জয়ীক্যম্ জনগণ পরিক্যম্"—এই রকম একটা আওয়াজ প্রায় সর্বত্র শুনেছি। আর যেখানে মনে এসেছে সম্পূর্ণ হতাশা, সেখানেও সাধারণ লোকের নিশ্চিতি লক্ষ্য করেছি—আমরা যদি এক হয়ে দাঁড়াই তো জয়ী আমরা হব-ই। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের বিচিত্র, সুন্দর পরিবেশে সর্বত্র এই আশ্বাস যেন ছড়িয়ে ছিল।

দূর পাহাড়ের কোল পর্যন্ত সোনালি ধানের উপর ঢেউ-খেলানো হাওয়ার মোহে পড়েও কিন্তু সেখানে ভুলতে পারি নি একটা দৃশ্যের কথা। দৃশ্যটি অতি সাধারণ, অতি নগণ্য। ক্র্যাঙানোরে যখন নামলাম নৌকায় খাল পার হয়ে, তখন আমি যাঁর জিম্মায় ছিলাম

সেই কমরেড ওয়ারিয়র বললেন; "নারকোলের ছিবড়ে নিয়ে যারা কাজ করে, তাদের দেখবেন তো চলুন"। বললাম নিশ্চয়ই দেখব, কারণ এই ছিবড়ে (coir) হল কেরলের একটা প্রধান সম্পদ। নিয়ে গেলেন রাস্তা থেকে একটু দূরে এক জায়গায়, যেখানে দশ থেকে ষাট বছরের প্রায় জন দশ বারো মেয়ে কাজ করছিলেন একগাদা নারকোলের ছিবড়ে নিয়ে। দশ ঘণ্টা কাজ করে তাঁরা নাকি মাত্র সাড়ে তিন আনা পান, কিন্তু তার চেয়েও মর্মান্তিক লাগল যখন তাঁরা আমায় বললেন তাঁদের হাত ছুঁয়ে দেখতে। হাতের এমন দশা যে হতে পারে তা আমার ধারণা ছিল না—একেবারে ভাঙাচোরা উঁচুনীচু, কড়া খোন্দলে ভরা হাত—যে হাত নিয়ে আদর করতে মন যায়, সেই হাত হয়ে উঠেছে বীভৎস। কাছাকাছি দেখলাম দুটি ১৭।১৮ বছরের ছেলে একটা চরকার মত যন্ত্র নিয়ে নারকোল দড়ি পাকাচ্ছে আর ক্রমাগত একদিক থেকে আর এক দিকে হেঁটে যাচ্ছে। তাদের বুক, হাত ছড়ে গিয়ে শক্ত ইঁটের মত হয়ে গিয়েছে বলে ছুঁলে কোন অনুভূতি সেখানে নেই। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের নিসর্গ শোভা ভুলতে পারি কিন্তু ক্র্যাণ্ডানোরের সেই মেয়েদের ভাঙা হাতের স্পর্শ ভুলব না।

মনে আছে ক্রুদ্ধ হয়ে এক মিনিট মাত্র তারপর বক্তৃতা করেছিলাম সভায়—যেখানে অন্তত আধঘণ্টা আমার গলাবাজি তারা চেয়েছিল। হয়েছিল রাগ আর লজ্জা, নিজের দেশের জন্য লজ্জা, আর যে হোমরা-চোমরার দল বলে যে আমাদের দেশের লোক পরিশ্রমে নারাজ তাদের ওপর ঘৃণা আর তাদেরও সম্পর্কে লজ্জা। আমার বক্তৃতা তারজমা করছিলেন তরুণ সাহিত্যিক কমরেড জনার্দন কুরূপ, তিনি বললেন যে অনুবাদ করার সময় কান্নায় তাঁর কণ্ঠ রোধ হয়ে আসছিল।

বেজায় তাড়াহুড়ো করে লিখছি, তাই গুছিয়ে কিছু বলতে পারলাম না। কিন্তু ছবির মত চোখের সামনে ভাসছে কেরলভূমির অন্তরঙ্গ নিসর্গশোভা, আর মনে হয় যেন দেখতে পাচ্ছি সকালবেলা ছোট ছেলেমেয়েরা দলে দলে স্কুলে যাচ্ছে, বইয়ের ব্যাগ ঝুলিয়ে

খেয়াঘাটের দিকে। হঠাৎ রাস্তার মাঝে যারা জোর করে বক্তৃতা করাচ্ছে, তাদের মধ্যে দেখি ছোট্ট একটা ছেলে, পরনে কিছু নেই, গলায় ঝুলছে খ্রীষ্টান ক্রসের মাদুলী, রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে অনেক মেয়ে, পরিষ্কার পোষাক, লালিত্যে ভরা চেহারা—চোখ-ঝলসানো সুন্দরী দেখি নি, কিন্তু অসুন্দর মেয়ে প্রায় চোখেই পড়ে নি, বেঢপ আকৃতির একটিও মেয়ে দেখি নি ; সহজ স্নিগ্ধ কমনীয়তা কেরলের স্ত্রীকুলের সাধারণ সম্পদ মনে হয়েছে। হঠাৎ দেখেছি মিশকালো রং, কাফ্রীদের মত কোঁকড়ানো, শক্ত চুল—এ অঞ্চলে বহু শতাব্দী পূর্বে ব্যবসাব্যপদেশে যে বিদেশীরা আসত, তাদেরই স্মৃতিচিহ্ন দেখতে পেয়েছি। মেয়েদের মধ্যে যারা প্রাচীনপন্থী, তাদের কেউ কেউ এখনও বুক খুলে রাখে, কাপড় দিয়ে ঢাকে না। কিন্তু তাদের সংখ্যা খুব কম। আর সেদিকে সাধারণত কারও নজর যায় না। আর বাংলাদেশ থেকে গিয়ে হিংসা হয়েছে এই দেখে যে যাতায়াতের ব্যবস্থা ওখানে কত ভালো, পাকা রাস্তার সংখ্যা কত বেশী, ছোট মফঃস্বল শহরেও থাকার বন্দোবস্ত কত পরিষ্কার। আরও হিংসা হয়েছে এই জন্য যে সেখানে আমাদের আন্দোলন নানা স্তরের সাধারণ মানুষের কত কাছে এসেছে, কত অন্তরঙ্গ হয়েছে—এদিক দিয়ে আমাদের কাজ অনেক বাকী। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনেও এখনও অনেক কিছু বাকী থেকে গিয়েছে, কিন্তু আমাদের এখানে বাকী-র বোঝা যেন অসহ্য।

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

প্রায় চার মাস বাইরে থাকার পর কলকাতায় ফিরে হঠাৎ একদিন মনে হল, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করে আসি। তখনই অবশ্য রাশ টেনে মন জানিয়ে দিল যে তিনি আর নেই, আর কখনও তাঁর সৌম্য উপস্থিতির প্রশান্তি আস্বাদ করতে পারব না।

খুব বেশী কাল তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। ১৯৪৩ সালের আগে কখনও তাঁকে দেখেছি বলে মনে হয় না। তার আগে তাঁর অভিনয়ের কথা অবশ্য শুনেছি, আর তার চেয়েও বেশী শুনেছি তাঁর চরিত্রের খ্যাতি। কিন্তু থিয়েটারে নিতান্ত কালেভদ্রে গিয়েছি বলে তাঁর অভিনয়ও তখন দেখি নি (পরেও দেখেছি অতি অল্প)।

প্রথম তাঁকে দেখলাম ৪৬নং ধর্মতলা স্ট্রীটে, যেখানে আমরা সোভিয়েট সুহৃৎ সমিতি আর প্রগতি লেখক সংঘের এককালে নামজাদা আস্তানা বানিয়েছিলাম। প্রগতি লেখকদের ডাকে তিনি এসেছিলেন আলোচনা সভায়, "সাহিত্যে প্রগতি" শীর্ষক ছোট্ট একটি প্রবন্ধ তিনি পড়লেন। পড়া শুনে চমক লেগেছিল। কণ্ঠস্বরের ওজস্বিতার জন্য নয়, বিষয়বস্তুর উপর অসংকোচ অধিকার ও নিপুণ পরিবেশন ক্ষমতা দেখে। পরে যখন তদানীন্তন সাপ্তাহিক "অরণি"-তে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়, সেটা ইংরেজীতে তরজমা করেছিলাম, তাঁর কাছ থেকে মঞ্জুরী পেয়েছিলাম কিনা মনে নেই, কিন্তু একান্ত আগ্রহেই তরজমা করেছিলাম।

বাংলাদেশে মাত্র তিন কি চারজনকে দেখেছি যাঁরা মার্কস্‌বেত্তা বলে নিজেদের জাহির করেন না। কিন্তু সহজ, স্বচ্ছ, অন্তরঙ্গ ভাবে মার্কস্‌বাদের অন্তর্বস্তুকে যেন আয়ত্ত করে নিয়েছেন। ভুল যে তাঁরা করেন নি বা করেন না, তা একেবারেই নয়। কিন্তু সহজ বোধের সঙ্গে মার্কস্‌বাদের সামঞ্জস্য তাঁরা করেছেন অনায়াসে, কষ্টকল্পনা পরিহার করে, বিদ্যাভিমানস্পৃষ্ট না হয়ে। মনোরঞ্জনবাবু ছিলেন তাঁদেরই একজন—আর হঠাৎ তাঁকে দেখলাম, তাঁর কথা তাঁরই তেজস্বী কণ্ঠে শুনলাম বলে প্রথম পরিচয়ের দিনই চমক লেগেছিল, আর চমকের সঙ্গে সঙ্গে একটা সহজ আকর্ষণ অনুভব করেছিলাম।

তারপর নানা সূত্রে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে—তাঁর

উপস্থিতির মধ্যেই এমন এক স্থৈর্য ছিল যা মনের চাঞ্চল্যকে প্রশমিত করার ক্ষমতা রাখত। বাংলা রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের বিড়ম্বনা সম্বন্ধে তিনি সজাগ ছিলেন, সেই সঙ্গে সজাগ ছিলেন নতুন সমাজে অভিনয় ও অভিনয়বৃত্তির ভূমিকা বিষয়ে—তিনি ছিলেন তেমনই একজন মানুষ যাঁরা যখন বর্ষণ চলতে থাকে তখন শুধু অন্ধকারই দেখেন না, ইন্দ্রধনুকেও চাক্ষুষ করতে পারেন। তাই আবেগকে নিয়ন্ত্রিত করা যেন তাঁর স্বভাব হয়ে গিয়েছিল। এমন লোকের সম্পর্কেই মহাভারতে বলা হয়েছে যে এঁরা হলেন স্থিতপ্রজ্ঞ, এঁরা অপরের আদর্শস্থল।

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের জীবনবৃত্তান্ত লিখতে বসি নি। তাঁর জীবনের অনেক কথাই আমার অজানা। তবে মনে হয় যে প্রথম জীবনে স্বদেশের শৃঙ্খল মোচনের যে প্রতিজ্ঞা তিনি বহু সমসাময়িকের সঙ্গে নিয়েছিলেন, সেই প্রতিজ্ঞারই পরিণতি থেকে অনেকের মত তিনি অপসরণ করেন নি! প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন শুধু যে রাষ্ট্র-বিপ্লব, তা তিনি স্বীকার করতে পারেন নি—পারলে জীবনে সহজ স্বস্তি তিনি পেতেন, খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে অর্থেরও অধিকারী হতেন। যথার্থ বিপ্লবে যে মৌলিক পরিবর্তন আসে সমাজে, অর্থ ব্যবস্থায়, জীবনের প্রতি ব্যঞ্জনায়—সেই পরিবর্তনের প্রতিই তিনি আকৃষ্ট হন। এই আকর্ষণকে চরিত্র ও কর্মের অঙ্গীভূত করতে তাঁর নিশ্চয়ই যথেষ্ট সময় ও প্রযত্ন লেগেছিল। কিন্তু একবার চিত্ত স্থির করার পর আর তাঁকে পিছনের টানে বিচলিত হতে হয় নি। মার্কস্‌বাদীদের খাতায় নাম লেখানোর তাঁর প্রয়োজন হয় নি—চেনা ব্রাহ্মণের মত তাঁর আর পৈতার দরকার হত না। কিন্তু মার্কস্‌বাদকে তিনি আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন, খানিকটা নিজের অজ্ঞাতেই করেছিলেন। তাঁর পরিচ্ছদে প্রায় সর্বদা থাকত খদ্দর, তাঁর ব্যবহারে সর্বদা থাকত সহজ সৌজন্য, তাঁর চিন্তায় থাকত পরিচ্ছদেরই মত পরিচ্ছন্নতা, বিপ্লব কামনায় তাঁর আগ্রহ ছিল অধীর, কিন্তু বস্তুনিষ্ঠা ও মনস্তত্ত্ববোধ তাঁকে দিয়েছিল স্থিতধী-র গুণাবলী—এমন মানুষ বড় সহজে আর চোখে পড়বে না।

বড় সুখী হয়েছিলাম যখন তিনি যেতে পেরেছিলেন সোভিয়েট দেশে। যেদিন একজন সোভিয়েট প্রতিনিধি দিন দুপুরে অন্ধকার

সিঁড়ি বেয়ে তাঁর চারতলার ফ্ল্যাটে তাঁকে আমন্ত্রণ করতে এসেছিলেন, সেদিন আমি উপস্থিত ছিলাম। নানা বাধা সত্বেও তিনি যে চলচ্চিত্র-প্রতিনিধিদলের নেতা হয়ে সোভিয়েটে যেতে পেরেছিলেন, এতে আমি নিজে তাঁর আনন্দে অংশ দাবী করেছি। আর আনন্দ তিনি যে পেয়েছিলেন প্রচুর সে দেশে গিয়ে, তা আমরা জানি—সে আনন্দের ভাগ সবাইকে পরিবেশন করার একান্ত আকুলতা তাঁর ছিল।

সৌজন্য আর প্রকৃত সংস্কৃতি যে তাঁর কত বেশী ছিল, তার পরিচয় খুব স্পষ্ট করে পেয়েছেন তাঁরা যাঁরা সোভিয়েটে তিনি যে দলের নেতৃত্ব করেছিলেন সেই দলের ভ্রমণ সম্বন্ধে ফিল্ম দেখেছেন। তিনি নেতা, দলের কেউ কেউ সামান্য কথাটা ভুলে গিয়ে তাঁকে পেছনে ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছে—তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই, সকলের আগে গিয়ে দাঁড়াবার জন্য ব্যাকুলতা নেই, যা তাঁর করণীয় তা করেছেন হৈ-চৈ বাদ দিয়ে, সহজ সৌষ্ঠব নিয়ে। ফেরার সময় বাংলায় বলেছিলেন তাঁর সোভিয়েট বন্ধুদের যে আমরা বাঙালীরা প্রিয়জনের কাছে বিদায় নেবার সময় বলি 'আসি', কখনও বলি না 'যাই'—আবার আসবো বলে তিনি সোভিয়েট দেশ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। সোভিয়েট দেশ শুধু নয় তাঁর স্বদেশ থেকে যখন তিনি বিদায় নিলেন জানুয়ারীর এক শেষ-রাত্রে, তখনও বোধকরি তাঁর অনুক্ত বিদায়বাণী ছিল 'আসি'—তাই যখনই তাঁকে স্মরণ করি, তিনি আসেন আমাদের কাছে, তাঁকে দেখতে না পেয়ে দুঃখ হয়, কিন্তু তাঁর মন ও মমতার সঙ্গে যাদের পরিচয় হয়েছিল তাদের কাছে তাঁর মূর্তি, তাঁর স্মৃতি কখনও ম্লান হবে না।

কথা তাঁর সম্বন্ধে বলা যায় প্রচুর, কিন্তু কথা বাড়াব না। অল্পে তাঁর সুখ ছিল না, তাই স্বস্তির সহজ সন্ধানে তিনি প্রবৃত্ত হন নি। জীবনকে, শুধু নিজের জীবনকে নয়, সর্বসাধারণের জীবনকে গ্লানিমুক্ত করাই ছিল তাঁর প্রথম ও প্রধান কামনা। সে কামনা চরিতার্থ হতে বিলম্ব হচ্ছে বলে যদি আমরা গ্লানি-ই অনুভব করতে থাকি তো তাঁর স্মৃতিকে অসম্মান করা হবে। নূতন জীবনের অনিবার্য আবির্ভাব সম্বন্ধে যে নিশ্চিতি দারুণ দুর্দিনেও তাঁর মনকে ভাঙতে পারে নি, সেই নিশ্চিতিই আমাদের শক্তি দিক, মর্যাদা দিক, নিত্যকর্মে সার্থকতা এনে দিক।

"সাহিত্যপত্র" ও স্বদেশ জিজ্ঞাসা

'সাহিত্যপত্র' নবকলেবরে প্রকাশ হচ্ছে জেনে খুসী হয়েছি। এই কথাটা উপলক্ষ করেই এ-লেখার অবতারণা।

প্রথমেই স্বীকার করে রাখি যে 'সাহিত্যপত্র'-এর প্রতি আমার এক প্রকার পক্ষপাতিত্ব আছে। এর কারণ তার কোন কোন কর্তৃপক্ষীয়ের সঙ্গে সৌহার্দ্য নয়, তবে একটা প্রধান কারণ অন্তত হল এই যে পত্রিকার নামকরণটি আমার বড় মনোমত লেগেছে।

আমি নিজে যে প্রকৃত সাহিত্যিক নই, তা বিলক্ষণ জানি। এটা বিনয়ের কথা নয়, যা আমার কাছে অকাট্য তারই পুনরাবৃত্তি। এসব ব্যাপারে প্রমাণ সাবুদ হাজির করা একটা বিড়ম্বনা, নিষ্প্রয়োজনও বটে। তবে লিখতে গিয়ে কয়েকটা কথা মনে পড়ে যাচ্ছে যা আমার ঐ উক্তিকেই সমর্থন করবে।

ছাপার হরফে নিজের লেখা দেখতে চাওয়া বোধ হয় মানুষের একটা সহজ মার্জনীয় অপরাধ। আমারও যে সে উচ্চভিলাষ ছিল না বা নেই, তা সম্ভব নয়। কিন্তু সাহিত্যিক যদি বাস্তবিক হতাম তো নিজের লেখা সম্বন্ধে একটা অত্যন্ত সঙ্গত মমতা নিশ্চয়ই থাকত, ছাপার হরফে লেখা যা কিছু বেরিয়েছে তার একটা হদিস বোধ হয় রাখতাম। সম্ভবত সাংবাদিকতার আবহাওয়াতে মানুষ হয়েছিলাম বলে শীঘ্রই লায়েক হয়ে উঠে ছাপার অক্ষরে যা বেরোয়, সে-সম্বন্ধে নাকতোলা মনোভাব পোষণ করা আরম্ভ করেছিলাম। আমার মনে হয় যে খাঁটি সাংবাদিকরা নিজেদের সব চেয়ে সরেশ লেখারও নকল রেখে দেন না। আমি খাঁটি সাংবাদিক বা নিছক সাহিত্যিক, এ-দুইয়ের একটাও নই বলে নিজের লেখার কিছু নকল আছে, অধিকাংশ নেই।

বলতে চাইছিলাম অন্য একটা কথা। আমার প্রথম লেখা বোধ হয় ছাপা হয়েছিল প্রেসিডেন্সি কলেজের ম্যাগাজিনে। আর সেটা

ছিল ইংরেজীতে। তারও আগে বেশ মনে আছে দেশপ্রেমের ঐতিহাসিক বনিয়াদের খোঁজে প্রাচীন ভারতবর্ষের গরিমা সম্বন্ধে একটা দীর্ঘ এবং উচ্ছ্বসিত প্রবন্ধ লিখি (তার ললাটের লিখন কি ছিল স্মরণ নেই, লেখাটার সন্ধান বহুকাল রাখি নি), কিন্তু এ লেখাটাও যে ইংরেজিতে এবং যথারীতি ম্যাক্সমূলর প্রভৃতির রচনা থেকে উদ্ধৃতি-কণ্টকিত ছিল তা বলা বাহুল্য। ইংরেজী ভালো জানি বলে যত জাঁকই থাকুক, নিজের মায়ের কোলে বসে শেখা ভাষা নিশ্চয়ই আরও অনেক নিজস্ব, কিন্তু প্রথম যে লেখা আমার ছাপা হল তা বিদেশী ভাষায়। তারপর প্রথম যে বাংলা লেখা প্রকাশ হল ঐ কলেজ-পত্রিকাতেই, তা ছিল একটা অনুবাদ—অধ্যাপক ভিন্তরনিৎস্-এর সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে একটা বক্তৃতার অনুবাদ। সাহিত্যিকত্ব থেকে আমার স্বাভাবিক দূরত্ব বোধহয় এ থেকে প্রমাণ হবে।

এমন কি, ছাত্রাবস্থা কাটাবার পর যখন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-এর বৈঠকখানায় "পরিচয়"-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচিত হলাম, তখনও প্রায় উপরোধে ঢেঁকি গেলার মত আমার প্রথম লেখা হল একটা সমালোচনা—এঙ্গেল্‌স্-কৃত "অ্যাণ্টিড্যুরিং" গ্রন্থের সমালোচনা। সাহিত্যের রাজ্যে প্রবেশপত্র তখন মেলে নি, আজও না।

তবে কতকগুলো অপ্রাসঙ্গিক কারণে নানা প্রকৃতির সাহিত্যিকদের সঙ্গে যোগাযোগ আমার ঘটেছে, আর তারই জোরে আজও 'সাহিত্যপত্র'-এর কাছ থেকে লেখার তাগাদা পাচ্ছি। এতে আমি খুসী, 'সাহিত্যপত্র' যদি খুসী হয় তো আরও ভালো।

কখনও যে সাহিত্য সম্বন্ধে কথা বলার স্পর্ধা রাখি নি, তা নয়। তবে যখনই কিছু বলেছি—আর বহুজনকে শোনাতে গেলে গলাটা আমার উচ্চগ্রামেই ওঠে—তখন নিজের মূলধনে ঘাটতির কথা মনে রেখেই তা বলেছি। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে আমার মত অন্তেবাসীদের কথা শোনার কিছু লোক আছে, হয়তো বা লেখকদের পক্ষেও অন্তত এক কান দিয়ে তা শোনার দরকার আছে, আর তাই হল স্বাভাবিক ও সঙ্গত।

মনে পড়ছে যে অনেকদিন আগে আজও বর্তমান এবং বহুল-প্রচারিত এক মাসিকপত্র যখন প্রকাশ হয়, তখন সপ্তাহে পাঁচ ছ'দিন অন্তত তার আয়োজন কি ভাবে চলছিল দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। তখন আমার বয়স নিতান্ত অল্প, কিন্তু তখনই সাহিত্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে মহারথী বলে বিখ্যাত কয়েকজনকে খুব কাছে থেকে দেখেছি। মনে আছে যে আমার পিতামহকে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রতিদিন পদধূলি নিয়ে প্রণাম করতেন (প্রায় রোজ দেখা হওয়া সত্ত্বেও নিতেন বলে উল্লেখ করছি), আরও মনে পড়ে যে আমাকেই সঙ্গে নিয়ে শরৎচন্দ্র নেবুতলার গলিতে চরকায় কাটা ভালো সরু সুতোর খোঁজে বেরিয়েছেন আর অফিসে ফিরে নিজের নির্দিষ্ট ঈজি-চেয়ারে যখন শুয়ে পড়েছেন, তখন "বঙ্কিমচন্দ্রের শূন্য সিংহাসনের অবিসম্বাদী অধিকারী" বলে বসুমতীর বিজ্ঞাপনপত্রের বর্ণনা নিয়ে তাঁর সামনেই হাসিঠাট্টা চলছে। বয়ঃপ্রাপ্তির পর থেকেই সে মাসিকের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিন্ন হয়েছে, কিন্তু পুরোনো সে সব দিন ভুলতে পারি নি।

'পরিচয়'-এর খ্যাতি প্রবাসে থাকতেই কানে এসেছিল, তাই দেশে ফিরে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-এর অবারিত আতিথ্যে বিশেষ আনন্দ পেয়েছিলাম। কিন্তু তাঁর বৈদগ্ধ্যে পুলকিত ও ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হলেও "পরিচয়" পত্রিকার একজন গৌণ অথচ মোটামুটি নিয়মিত লেখক হয়েও সম্পর্কটা কেমন যেন আত্মীয় হয়ে উঠতে পারে নি। মনে পড়ে যে তখনকার "পরিচয়"-এর বিজ্ঞাপনে 'অভিজাত পত্রিকা' বলে বর্ণনায় বিরক্তি লেগেছে—পরবর্তী যুগে 'অভিজাত'-এর পরিবর্তে 'অভিনব' শব্দের আবির্ভাব সম্ভবত আরও কুশ্রী মনে হয়েছে। যাই হোক, বেশ কিছুকাল ধরে প্রায়ই "পরিচয়"-গোষ্ঠীতে যোগদান সত্ত্বেও একটা বাধা যেন অতিক্রম করে উঠতে পারি নি।

তখনকার "পরিচয়" বাংলাসাহিত্যে ও সমাজে একটা প্রভাব বিস্তার করেছিল সন্দেহ নেই। জরাগ্রস্ত চিন্তাকে পরিহার করার সযত্ন প্রয়াস ঘটেছিল "পরিচয়"-এর মাধ্যমে। স্বদেশ ও বিদেশের কর্ম ও সাধনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা উদ্রিক্ত করা হল সেদিনের "পরিচয়"-এর স্মরণীয়

অবদান। মার্কস্‌বাদকে সাধ্যমত জানতে, বুঝতে এবং বাস্তবে প্রয়োগ করতে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যারা উৎসুক হয়েছিল, "পরিচয়" শুধু তাদের সুযোগ দেওয়া নয়, সমাদরও করেছে। রাজনৈতিক বন্দীশিবিরে "পরিচয়" তখন অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষিত হত। সাহিত্য বিষয়ে পরীক্ষা ব্যাপারে "পরিচয়" ছিল অগ্রণী, সঙ্গে সঙ্গে খরস্রোত জীবনের মূল ব্যঞ্জনার সন্ধানে তার শ্রান্তি ছিল না।

কিন্তু আমার তখনই বার বার মনে হত যে কোথায় কি যেন একটা খটকা সেখানে লেগে রয়েছে। এ-কথা পরিষ্কার করে বোঝানো শক্ত, তাই একদিনের একটা দৃষ্টান্ত দেব। আমার সঙ্গে সেদিন ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, যাঁকে ভুলে যাওয়া অপরাধ হলেও আজ প্রগতিবাদীরা পর্যন্ত ভুলে যাচ্ছেন। সুধীনবাবুর বইয়ে বোঝাই, আরামচৌকীতে সাজানো বৈঠকখানায় যথারীতি কয়েকজন হাজির হয়েছিলাম এক শুক্রবার। উপস্থিতদের মধ্যে যাঁকে বলতে পারি প্রমুখ, তিনি বিদ্যা, বুদ্ধি ও বাচনভঙ্গীর ঔজ্জ্বল্যে সকলের শ্রদ্ধেয়। সম্ভবত সুরেনবাবু আর আমাকে উগ্রপন্থার অনুরাগী জেনে তিনি কথায় কথায় মহাত্মা গান্ধীর উল্লেখ করলেন এবং অতি ক্ষিপ্র গতিতে ও তীব্র বাক্য প্রয়োগে তাঁর চরিত্র ও কর্মের উন্নাসিক বিশ্লেষণ শোনাতে চাইলেন। দুষ্টগ্রহ আমার ওপর ভর করেছিল নিশ্চয়ই, নইলে তাঁর চেয়ে আমি গান্ধীজী সম্বন্ধে অনেক বেশী বিরূপ হলেও একেবারে অধৈর্য হয়ে বললাম কেন, যে এত উৎকটভাবে শ্রদ্ধা ও বিনয়-রহিত হয়ে গান্ধীজী সম্পর্কে আলোচনা একান্ত অকর্তব্য? আলোচনায় তখনই ঘোর স্তব্ধতা নেমে এল, বৈঠক প্রায় ভাঙল, পরদিন দীর্ঘ পত্র লিখে আমি মার্জনা চাইলাম, উত্তর পেলাম সংক্ষিপ্ত, অপ্রসন্ন কয়েক পঙ্‌ক্তির পত্রে। স্পষ্ট বুঝলাম যে "পরিচয়" গোষ্ঠীতে প্রকৃত স্বীকৃতি লাভ করতে হলে যে মেজাজ দরকার তা আমার নাগালের বাইরে।

এক বাদশাহের নতুন, আশ্চর্য পোষাক সম্বন্ধে সুপরিচিত একটা গল্প আছে। সভার সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে পোষাক দেখার জন্য, দুনিয়া জোড়া নাম এমন এক দরজি নাকি সে জামা বানিয়েছে, সবুর

কারও যেন সইছে না। বাদশাহ এলেন, কুর্নিশ করতে করতে দরজি আসছে সঙ্গে, আর অঙ্গভঙ্গী করে সবাইকে জামার তারিফ করতে বলছে—সবাই দেখল বাদশাহের পরনে পোষাক বলে কোন কিছুর বালাই নেই, তিনি একেবারে নগ্নগাত্র, কিন্তু সেকথা তখন বলে কার সাধ্য, সবাই 'বাহবা' দিয়ে উঠল না-দেখা জামার জাঁকজমকের জন্য।

সেদিনের "পরিচয়" যা করেছে, তাকে অস্বীকার করার বিন্দুমাত্র প্রবৃত্তি আমার নেই। যদি বলি "পরিচয়" সম্পর্কে আমার একটা মমতা জন্মেছিল, তাহলে কেউ যেন অবিশ্বাস না করেন। কিন্তু কোথায় একটা খোঁচা যেন মনে লেগে রইল, আর ভাবলাম যে ঐ বাদশাহের পোষাকের মতই "পরিচয়"-এর পরিচয় আমি পেলাম না।

তারপরে 'অভিনব পত্রিকা' বলে প্রচারিত হয়ে "পরিচয়" যখন প্রধানত আমারই সহকর্মীদের কতৃত্বে এল, তখনও কিন্তু আমার মনের খেদ গেল না। কোথা থেকে কতকগুলো কাঁটা এসে গলায় ফুটে রইল, অস্বস্তি এসে যেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে বসল। মনের এবং মর্মের যে ভাষা সাহিত্যপত্রিকায় খুঁজছিলাম, তা মিলল না। তবুও ডুবে না গিয়ে যে ভেসে থাকতে পেরেছি, তার কারণ এই যে প্রকৃত সাহিত্যিক মন আমার নয়, মুক্তা আহরণের জন্য গভীর জলে ডুব দিতেই আমি যাই নি।

একবার কয়েকজনের সহযোগিতায় 'লোকায়ত' নামে মাসিক প্রকাশের আয়োজনে নেমেছিলাম। মুখবন্ধ লেখার ভার ছিল আমার ওপর—লিখলাম, ফর্মা ছাপা হল, কিন্তু কতকগুলো দুর্ঘটনায় পরিকল্পনাই পরিত্যক্ত হল। নিজের লেখা আমার প্রায়ই ভালো লাগে না, কিন্তু ঐ মুখবন্ধ লিখে পরিতৃপ্তি পেয়েছিলাম বলেই বোধ হয় তার নকল আমার কাছে আজও নেই।

আপাতত, বাংলা সাময়িকীর মধ্যে "পরিচয়" এবং 'সাহিত্যপত্র'-এর সঙ্গেই আমার সম্পর্ক। যদি বলি, 'Sufficient unto the day.......' আর বাকীটা উহ্য রেখে দিই তো আশা করি মার্জনা মিলবে।

আগেই বলেছি 'সাহিত্যপত্র' নামটি বড় ভালো। কিন্তু শুধু নামে

কি আসে যায়? তবে এখনও 'সাহিত্যপত্র' সন্ত্রস্ত, কুণ্ঠিত, কিন্তু ঐতিহ্যভার মুক্ত বলেই হয়তো ভবিষ্যতে স্বচ্ছন্দ পদচারণায় সমর্থ হবে। এ-কথা বলছি বোধ হয় এইজন্য যে মাঝে মাঝে 'সাহিত্যপত্র'-এর পদক্ষেপকে অস্বাচ্ছন্দ্যের পরাকাষ্ঠা মনে হয়েছে।

বিনয়বর্জিত এই রচনার জন্য বার বার ক্ষমা ভিক্ষা না করে উপায় নেই, বিশেষ করে 'সাহিত্যপত্র'-এরই ঔদার্যের কাছে ক্ষমা চাইব। আর আশা করব যে বাংলা মাসিক সাহিত্যের ইতিবৃত্ত স্মরণ করে তার দোষগুণ সম্বন্ধে অবহিত হয়ে, যথাসাধ্য স্বদেশজিজ্ঞাসা পূরণ করার প্রতিজ্ঞা যেন 'সাহিত্যপত্র' নিতে চেষ্টিত হয়।

"বঙ্গদর্শন" থেকে "পরিচয়" পর্যন্ত যে পরম্পরা চলে এসেছে, তার প্রধান শিক্ষা আমার চোখে এই যে পত্রিকামাত্রেরই প্রয়োজন হল লক্ষ্য, সংকল্প ও প্রযত্ন। লক্ষ্যের অবিকল সংজ্ঞাসন্ধানের মত দুর্বুদ্ধি যেন না হয়, কিন্তু লক্ষ্য যথাজ্ঞান স্থির হওয়া চাই। আর নিয়ত প্রয়াস ও পরিকল্পনা যেন পত্রিকার অন্তর্ভুক্ত রচনায় প্রাণ সঞ্চার করে।

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে আজ আমরা এমন এক পরিবেশে রয়েছি, যখন জীবনের জটিলতা অভূতপূর্ব স্তরে উপনীত হয়েছে। এমন ঘটনা ঘটেছে এবং ঘটছে, যাতে পায়ের তলার মাটি পর্যন্ত যেন সরে গিয়েছে। সৎ এবং অসৎ, এই দুই বর্গের ভেদ করতে গিয়ে যেন খেই হারিয়ে গিয়েছে। মনের মধ্যে যেসব পাহাড় আছে সেগুলো যে এত এবড়ো-খেবড়ো, তা যেন আগে জানতাম না। সহজ সাধনায় প্রশান্তি আসতে পারে জানি কিন্তু তাতে তুষ্ট নই একেবারে; প্রকৃত প্রজ্ঞার জন্য আকুলতার অবধি নেই, অথচ তার সম্ভাবনা যেন শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে।

বাইশ-তেইশ বছর আগে সিড্নী আর বীট্রিস ওয়েব্ পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণার পর সোভিয়েট দেশে যে 'নতুন সভ্যতা'-র সন্ধান পেয়েছিলেন, যার শাসনব্যবস্থাকে তাঁরা 'জগতের সবচেয়ে সর্বব্যাপী ও সমানাধিকারমূলক গণতন্ত্র', বলে বর্ণনা করেছিলেন, হিটলারী আক্রমণের নিদারুণ অগ্নিপরীক্ষায় যার সোনা-ই দুনিয়া দেখেছিল, খাদ

প্রায় খুঁজে পায় নি, সেই সোভিয়েট এবং তার কীর্তির মধ্যে কলঙ্কের রটনা এল—দুর্মুখ, দুরাশয়, বৈরীর মুখ থেকে নয়, সোভিয়েট দেশ থেকেই তা উৎসারিত হল। মানস-সরোবরে যেখানে জলের স্থিরতা হল একান্ত অপরিহার্য সেখানেই তরঙ্গ-ভঙ্গের আঘাত পড়ল।

'তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা', এ কথা কবিকণ্ঠ থেকে অতি-দুঃসময়েই উচ্চারিত হয়েছিল। আজকের সংকট অতিক্রান্ত হবে, সন্দেহ নেই। শুধু আমাদের ওপর একটা দায়িত্ব থেকে যাবে, যদি সাহিত্য আমাদের কাছে কোন সত্যগুণের দাবী রাখে। ফরাসী ভাষায় কথা আছে: 'Souffrir passe; avoir suffert ne passe jamais' (যন্ত্রণা কেটে যায়, কিন্তু যন্ত্রণাভোগের স্মৃতি কখনও যায় না)—তাই আজকের অনুভূতির ছবি এবং ছাপ যথাসময়ে দেখা দেবে, এ-বিষয়ে আমার সংশয় নেই। জানি না এ সম্পর্কে 'সাহিত্যপত্র'-এর ভূমিকা নিয়ে কেউ অবহিত কি না।

জোর করেই বলতে ইচ্ছা হচ্ছে যে সেই ছাপ মোটেই শুধু বিলাপ হবে না—বিলাপও বাঁচার একটা অঙ্গ, কিন্তু তা সব চেয়ে বড় কথা নয়। গত যুদ্ধের মধ্যে তেইশ বছর বয়সে নিহত ইংরেজ বৈমানিক রিচর্ড্ হিলরি, যিনি "The Last Enemy" লিখেছিলেন, তিনি "হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে, ক্রুদ্ধ অবস্থায়" (কথাগুলো হিলরি-র) একটা চিঠিতে বলেন: "Humanity is irony from the neck up, I guess that's the first thing you've got to realise if you want to fight for it. You'll get nothing out of it, and if you don't find virtue being its own reward sufficient, you have to be human enough to be amused by it, otherwise God help you." এর অনুবাদ শুধু দুরূহ নয়, পীড়াপ্রদও বটে। 'সাহিত্যপত্র'-এর পাঠকেরা অনুবাদের দরকার বোধ করবেন না জানি বলে বেঁচে গেলাম। কিন্তু এই হিলরি-ই অবিচল মনে যুদ্ধে প্রাণ দিতে ইতস্তত করেন নি। মৃত্যু অনিবার্য জেনেও যেমন বাঁচতে হয়, অনেক সময় যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী

জেনেও যেমন শান্তির জন্য লড়তে হয়, তেমনই 'irony', এমন কি 'tragic irony'-র অকাট্য অস্তিত্ব সত্ত্বেও মানুষের মহিমা ক্ষুণ্ণ হয় না।

শিরদাঁড়া খাড়া বলে মানুষ প্রাণিজগৎ থেকে স্বতন্ত্র, কিন্তু সর্বদাই এক ঋজু ভঙ্গীতে যদি কেউ থাকে তো তা হয় হাস্যকর। প্রগতি প্রকৃষ্ট গতি বটে, কিন্তু সর্বদাই সুসন্নিবদ্ধ, অবক্র, সরলপথে সে-গতি ঘটে না। যে-নিউটন "প্রিন্সিপিয়া" লিখে জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিপ্লব আনলেন, নরকের ভূগোল সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা থেকে তিনি নিবৃত্ত হন নি। যে-ভারতবর্ষে মানুষের গরিমা প্রজ্ঞা ও বোধিকে পর্যন্ত আয়ত্ত করে "শৃণ্বন্তু বিশ্বে" বলে আহ্বান জানিয়েছে সেখানেই দেখি পূতিগন্ধ ও পাতকের প্রাচুর্য। তাই যেখানে যুগ যুগান্তের ক্লেদ অপসৃত করার দুস্তর প্রয়াস হবে বা হয়েছে, সেখানে সর্বক্ষেত্রে সর্বদা মানুষের মন যে এক উঁচু তারে বাঁধা থাকবে, এ অসম্ভব।

'সাহিত্যপত্র'-এ হয়তো এসব কথা অবান্তর, কিন্তু আমার শুধু আশা যে বাংলার যাঁরা লেখক, তাঁদের কাছ থেকে আজ আগের চেয়ে অনেক বেশী ধ্যানের দাবী যেন তাঁরা মানেন। এদিক দিয়ে 'সাহিত্যপত্র' কি করে, জানবার ঔৎসুক্য রয়ে গেল।

স্বদেশ-জিজ্ঞাসা বিষয়ে নিরন্তর অভিনিবেশের যে আজ কত প্রয়োজন, তা বলে উঠতে পারছি না। বিদেশকে অস্বীকার করি না, এক মুহূর্তের জন্যও নয়—"What does he know of India, who only India knows ?" হঠাৎ মনে পড়ছে, লণ্ডনে বর্লিংটন্ হাউসে আধুনিক ফরাসী ছবির প্রদর্শনী—গোগ্যাঁর একটা ছবি, দক্ষিণ সাগর দ্বীপের নিতম্বিনী, হাতে কটা আম, আর সতত সঞ্চরমান এই বিশ্ব যেন সেখানে অপলকে স্থির হয়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে আসছে কোণারকের স্থাপত্যের হীরকদীপ্তি, কি কাশ্মীর শত স্তম্ভের মৌন মায়া। আর ভাবছি আমাদের মৃত্যুঞ্জয় ভারতবর্ষের কথা, যার মানুষ অবিদ্যা ও অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হয়েও কত মার্জিতচিত্ত, যার জীবনে ক্রূরতা ও ক্লেদের অভাব না থাকলেও শুচি, স্নিগ্ধ সৌকর্যের স্থান কত বিরাট।

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে পাঞ্জাবের গ্রীক রাজা বৌদ্ধ মেনাণ্ডরের "মিলিন্দপহ্ন"-এর কথা সেদিন পড়ছিলাম। দেখলাম তাঁর রাজধানী সকল-নগর (বর্তমানে শিয়ালকোট) সর্ব ধর্মের প্রচারকদের অভ্যর্থনায় ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হত। হর্ষবর্ধন তার প্রায় সাড়ে সাতশো বছর পরে ধর্মসভায় তর্ক শুনে, হিউয়েন্‌সাং-এর যুক্তিতে মুগ্ধ হয়ে, মহাযান বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করেন। বারবার দেখা যায় যথোপযুক্ত সৌজন্য ও সৌষ্ঠব নিয়ে বিতণ্ডা হচ্ছে, আর দক্ষিণ-ভারতের তামিল নরপতিরা জৈনধর্ম ছেড়ে শৈব বা বৈষ্ণব ধারার আশ্রয় নিচ্ছেন। আর অষ্টম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্য আসমুদ্র হিমাচল পরিক্রমায় বৌদ্ধ আচার্যদের বাকযুদ্ধে পরাজিত করলেন, পুরী, দ্বারকা, শৃঙ্গেরী ও বদরিনাথে মঠ স্থাপন করে একযোগে 'অবাঙ্‌মনসোগোচর' ব্রহ্মচিন্তা এবং মায়াময় মূর্তিপূজাকে ভারতমানসে সন্নিহিত করলেন। এ-সমস্ত ব্যাপার ঘটেছে প্রখর তর্কের পর, শুধু সংহারশক্তির চাপে নয়। সংহারের দৃষ্টান্ত যে নেই, তা নয়—পরশুরাম তো তাঁর কুঠারের আঘাতে একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন। সপ্তম শতাব্দীতে রাজা শশাঙ্ক বাংলার বৌদ্ধদের নিধনকল্পে লেগেছিলেন, আরও বহু উদাহরণ সহজলভ্য। কিন্তু চিত্তের একটা বিশিষ্ট উৎকর্ষ এদেশে হয়তো ঘটেছিল, তাই দেখি কবীর, নানক, রামানন্দ, দাদূ, চৈতন্য, রামদাস, মাণিক্য বচ্‌কর প্রমুখ ভারতীয় সাধকের মন ধর্মগত সংকীর্ণতাকে প্রায় সম্পূর্ণ পরিহার করতে পেরেছিল। সেণ্ট ফ্রান্সিসের মত মধ্যযুগীয় ইয়োরোপের যাঁরা সাধক, তাঁদের চরিতকথা মনোমুগ্ধকর নিশ্চয়ই, কিন্তু ক্যাথলিক চার্চের "dogma" সম্বন্ধে কবীর কিম্বা চৈতন্যের মতো মনের মুক্তি নিয়ে তাঁরা কথা বলেছেন কিনা সন্দেহ।

হয়তো এর একটা দুর্বল দিক আছে, যার ফলভোগ আমরা করেছি বিদেশী আক্রমণকারীর হাতে বারবার পর্যুদস্ত হয়ে। হয়তো যে-একাগ্রতা নিয়ে মুসলমান আক্রমণকারী আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার জ্বালিয়েছে, কিম্বা নালন্দা ও বিক্রমশিলাকে একেবারে ধ্বংস করেছে, যে-একাগ্রতা নিয়ে ক্যাথলিকরা আর তাদের বিপক্ষ পরস্পরকে আগুনে পুড়িয়েছে, সে-একাগ্রতারও একটা দাম আছে। ভয়ঙ্করের

শুধু যে রূপ আছে, তা নয় ; হয়তো তার একটা মূল্যও আছে। এটা ভালো কি মন্দ, তা আলাদা কথা ; কিন্তু জীবনের ইতিবৃত্ত মানুষকে এটাও হয়তো শিখিয়েছে।

খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব মানুষের 'আদিম পাপ' সম্বন্ধে কিম্বদন্তী সৃষ্টি করে এই পরস্পরবিরোধী ধারার একটা ব্যাখ্যা দিয়েছে। কর্মফল ও জন্মান্তরবাদ জীবন রহস্যকে সর্বগ্রাহ্য ও সহজবোধ্য করার প্রয়াস করেছে। মনন ও সৎকর্ম কর্তৃক সংসাররজ্জু ছিন্ন করে নির্বাণলাভের বাণী এসেছে গৌতম বুদ্ধের শ্রীমুখ থেকে। আবার জীবন ত্যাগ করে যেমন জীবনকে জয় করা যায়, তেমনই সমাজের অভ্যস্ত ধারা খণ্ডন করেই সমাজ জীবনকে প্রকৃষ্টতর স্তরে স্থাপনের সংকল্প বর্তমান যুগে হয়েছে। মহাভারত যেমন আকুমারীহিমাচল পরিব্যাপ্ত হয়েছিল, এই নতুন এবং দুর্জয় সংকল্পও তেমনই সমগ্র জগতে বিস্তৃত হয়েছে। অমোঘ এর শক্তি, পশ্চাৎগমনও এর কাছে হল অগ্রধাবনেরই প্রস্তুতি।

কবির কর্ণকুহরে বিশ্ববীণার রব প্রবেশ করে থাকে—অসঙ্গতির মধ্যে সঙ্গতি স্রষ্টার শিবনেত্রের সমক্ষে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সর্ব-সাধারণের মনে আজ আভাস এসেছে যে বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ শুধু নয়, তার সজাগ বোধিপ্রাপ্তিরও দিন সমাসন্ন হয়ে আসছে। যদি মনে হয় এ-সব ভুল কথা, তো নিরুপায়। কিন্তু অন্ধকার দেখেই শঙ্কিত যারা হয়, তাদের কাছ থেকে অগ্রগমন প্রত্যাশা করাই ভ্রম। আর ভোরের আলো ফুটে ওঠার অব্যবহিত পূর্বেই নাকি অন্ধকার সব চেয়ে ঘন হয়ে আসে।

মহামতি লেনিন

বহুদিন আগে প্রখ্যাত ভারতীয় বিপ্লবী হরদয়াল প্রবাসে 'গদর' পার্টি সম্পর্কিত কাজে ব্যস্ততার মধ্যে স্বনামধন্য রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'মডার্ণ রিভিউ' মাসিকপত্রে কার্ল মার্কস্ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখেছিলেন এবং ঐ অনন্য মনীষীকে 'মহর্ষি' বলে বর্ণনা করেছিলেন। মার্কস্-এর প্রতিভাদীপ্ত শ্মশ্রুগুম্ফজালমণ্ডিত মূর্তি ঋষিজনোচিত সন্দেহ নেই। কিন্তু হয়তো হরদয়ালের নামকরণের প্রধান কারণ ছিল এই যে দৈবশক্তিতে একান্ত অবিশ্বাসী ঐ আশ্চর্য মানুষটি ছিলেন পুরাণকথিত ঋষিদের মতো তেজস্বী এবং যেন ঋষিদেরই মতো ত্রিকালদর্শী। মার্কস্-এর জীবন ছিল একপ্রকার তপশ্চর্যা—তবে তাঁর তপস্যা ছিল অধ্যাত্মচিন্তা নিয়ে নয়, ছিল জটিল, সতত সঞ্চরণশীল বাস্তব নিয়ে অনুশীলন, মনন, নিদিধ্যাসন ; ছিল তত্ত্ব ও কর্মের সমন্বয়-প্রয়াস ; ছিল সত্যনিষ্ঠ বিশ্ববীক্ষা। ভারতীয় মানসে মার্কস্-এর 'মহর্ষি' আখ্যা প্রকৃতই শোভন ও সার্থক।

বিপ্লবীশ্রেষ্ঠ লেনিনের জন্মশতবার্ষিকী এখন সর্বত্র অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তিনি ছিলেন নিঃসন্দেহে মার্কস্-এর সর্বগরিষ্ঠ শিষ্য। আমার পরিচিত এক তরুণ লেখক সম্প্রতি লেনিনের জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহ করতে নেমে ঐ অমিতশক্তিধর মানুষটির চরিত্রগুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত মন্তব্য বন্ধুমহলে করায় শুনেছি উগ্রমতি কেউ কেউ উপহাস করেছেন এই বলে যে শেষকালে বইটা 'মহাত্মা' লেনিনের জীবনী হয়ে না দাঁড়ায়! কথাটার পেছনে যে কটাক্ষ তার প্রধান কারণ এই যে ইতিহাসের নিরাসক্ত বিধানে গান্ধী এবং লেনিনের জন্মশতবার্ষিকী প্রায় একই সময়ে উদ্‌যাপিত হচ্ছে। ঐ দুই মহাপুরুষ সম্বন্ধে কিন্তু হয়তো বলা চলে—'মিল নেই, মিল নেই, তাই বাঁধিলাম রাখী'। আত্মার অবিনশ্বরত্ব দূরে থাক্, দেহব্যতিরেকে আত্মার অস্তিত্বেই লেনিনের বিশ্বাস ছিল না, কিন্তু মার্কস্‌কে যেমন 'মহাত্মা' বলা

হয়েছে, তেমনই লেনিনকে কেউ 'মহাত্মা' আখ্যা দিলে প্রত্যবায় ঘটে না। তবে 'মহাত্মা' বাক্যটির ব্যাখ্যা যেভাবে হয়ে থাকে, সেজন্য কথাটা না হয় নাই ব্যবহার করা গেল। 'মহামতি লেনিন' বলাই শ্রেয়।

আমাদের রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন লেনিনের প্রায় নয় বৎসর আগে। আকৈশোর বিপ্লব প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত লেনিন এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে লালিত রবীন্দ্রনাথের জীবনে সৌসাদৃশ্য সন্ধানের প্রয়োজন নেই। কিন্তু মনে পড়ছে যে বাংলা ১৩০০ সালের ফাল্গুন মাসে, যখন রবীন্দ্রনাথের বয়স প্রায় তেত্রিশ এবং লেনিনের বয়স প্রায় চব্বিশ, তখন লেখা হয়েছিল 'এবার ফিরাও মোরে' :

'কবি, তবে উঠে এসো—
যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহ সাথে,
তবে তাই করো আজি দান।
বড়ো দুঃখ বড়ো ব্যথা—
সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূন্য,
বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই,
আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য,
আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট।
এ দৈন্য মাঝারে কবি,
একবার নিয়ে এসো
স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।'

মার্কস্ এবং এঙ্গেলস্ সমাজ বিষয়ে সর্বপ্রথম প্রকৃত সবল, বাস্তব, বিজ্ঞানানুগ পর্যালোচনা করে মানুষকে সর্বত্র জায়মান বিপ্লবের বারতা শুনিয়েছিলেন। 'স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি' আনার চেষ্টা অলীক

প্রমাণ করে তাঁরা আকাশচারী সমাজবাদের বিরোধিতা করেছিলেন, শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় শুভ-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির সদিচ্ছায় সমাজ পরিবর্তন অসম্ভব ঘোষণা করেছিলেন। তরুণ বয়সেই লেনিন বিপ্লবের এই নবমন্ত্র গ্রহণ করে নির্ভয় অক্লান্ত প্রয়াসে লিপ্ত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথও উত্তরজীবনে 'স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি'-কে আর গ্রহণ করতে পারেন নি। স্বর্গে যিনি বিরাজমান সেই ভগবানকে তিনি 'প্রশ্ন' করেছিলেন: 'যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু নিভাইছে তব আলো, তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?'—এর কিছু পূর্বেই তিনি গিয়েছিলেন লেনিনের দেশে, যেখানে না গেলে ভারতের চারণ কবিরূপে তাঁর তীর্থপরিক্রমা সম্পূর্ণ হত না, যেখানে তিনি দেখেছিলেন 'ঐতিহাসিক মহাযজ্ঞ", যেখানে 'সভ্যতার পিলসুজ' জ্বালিয়ে রেখে মানুষের শান্তি ছিল না, অসমসাহস অভিযান চলছিল 'প্রদীপের নীচের অন্ধকার' সর্বত্র দূর করার।

মানুষের উপর মানুষের অত্যাচার দেখে একান্ত ব্যথিত রবীন্দ্রনাথ তাই মানুষের উপর আস্থা হারাতে শেষ পর্যন্ত অস্বীকৃত ছিলেন। আর তাঁরই অনুজ, 'রুশ দেশের কমরেড লেনিন' মেহনতী মানুষকে নিয়ে লড়াইয়ে নেমেছিলেন, ইতিহাসের সবচেয়ে সুদূরপ্রসারী বিপ্লবের প্রস্তুতি ও পরিচালনায় অগ্রণী হয়েছিলেন, 'বদ্ধ অন্ধকার' থেকে 'মুক্ত বায়ু' হবে যে-সমাজ, 'আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু' নিয়ে যেখানে হবে মানুষের বসবাস সেই নব-সমাজের লেনিন ছিলেন প্রধান হোতা, তার মুখ্য নির্মাতা সর্ববিশ্বের 'জনগণপথপরিচায়ক' নেতা।

কার্ল মার্কস্ এবং তাঁর আজীবন সহচর ফ্রেডরিক এঙ্গেলস্ পরস্পর পত্রালাপে একবার বলেন যে বিপ্লব সারা জগতে ছড়িয়ে না পড়লে ইয়োরোপের 'একটা ছোট্ট কোণে' শত্রুর পক্ষে তাকে পিষে মারা সহজ হবে। তাঁরা তাই এশিয়া-আফ্রিকার মতো পিছিয়ে-পড়া অঞ্চল সম্বন্ধে গবেষণা করতেন, মার্কস্-প্রতিষ্ঠিত প্রথম ইণ্টারন্যাশনাল-এর সঙ্গে কলকাতার পর্যন্ত যোগাযোগের একটু সূচনা সেই দুরূহ সময়ে ঘটেছিল। তাঁদেরই শ্রেষ্ঠ শিষ্য লেনিন তাই অসংখ্য কাজ এবং অসম্ভব ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের ভারতবর্ষের মতো দেশ নিয়ে গভীর

চিন্তা না করে পারেন নি। এদেশের মুক্তিপ্রচেষ্টা বিষয়ে লেনিনের কথা এবং কাজ নিয়ে তাই গোটা বই লিখলেও সব কিছু বলা হয় না। শুধু বলা যেতে পারে যে ইতিহাসে একটা অত্যন্ত সুঘটন ঘটল যখন লেনিন এবং তাঁর বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে বিপ্লব সংসাধিত হল রাশিয়ার জারের সাম্রাজ্যে। এশিয়া আর ইয়োরোপের বিরাট একটা এলাকা জুড়ে পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশ আয়তনের উপর ছিল সেই সাম্রাজ্য। তাই শুধু ইয়োরোপে নয়, সারা দুনিয়াতেই যেন এই মূল্যোৎপাটনকারী বিপ্লব একটা ভূমিকম্প ঘটিয়ে দিল। ক্রমশ জগতের যত পরাধীন দেশের মুক্তি-সংগ্রামের সঙ্গে আগুয়ান সোশালিস্ট বিপ্লবের যোগসূত্র গ্রথিত হতে লাগল। অভ্রভেদী হিমালয়কে লঙ্ঘন করে যেন সমাজবাদের অভিযান ছড়িয়ে পড়তে চলল আমাদের এই দেশে। ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যশাহীর ক্রমবর্ধমান সঙ্কটের সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই ভাবতে শুরু করলেন যে স্বাধীনতার স্বাভাবিক ও সঙ্গত পরিণতি হল সোশালিজম্, আর নিজেদেরই মনে প্রশ্ন তুললেন—সোশালিজম্ যদি বোখারা আর সমরকন্দে এসে খাপ খেয়ে যেতে পারে তো কাশী আর কাঞ্চীতেই বা বাধাটা কি?

লেনিনের বুঝ্‌তে একটুও দেরি হয় নি যে জগৎ জুড়ে সাম্রাজ্য-শাহীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে সোশালিস্ট বিপ্লবের সঙ্গে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক অপরিহার্য। ১৯০৩ সালে তাঁর বিখ্যাত 'ইস্ক্রা' ('স্ফুলিঙ্গ') কাগজের প্রথম সংখ্যাতেই তিনি লিখলেন ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ এবং পরাধীন ভারতবর্ষের দুর্দশা বিষয়ে। ১৯০৭ সালে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের ছয় বৎসর কারাদণ্ডের প্রতিবাদে বোম্বাইয়ে ছয়-দিনব্যাপী হরতালকে অভিনন্দন করে তিনি ইয়োরোপের মেহনতী মানুষকে উল্লসিত হয়ে জানালেন যে এশিয়ায় তাদের সাথীরাও এগিয়ে চলছে। ১৯১৩ সালে তিনি লিখলেন বিখ্যাত প্রবন্ধ—'বিশ্ব-রাজনীতিতে দাহ্য উপাদান'—যাতে বর্ণিত হল পারস্য, তুরস্ক, চীন এবং সর্বোপরি ভারতবর্ষের কথা। জীবনের শেষ প্রকাশিত রচনায় (১৯২৩) এ দেশ সম্বন্ধে তাঁর আশার উল্লেখ করলেন—বললেন, রুশ, চীন এবং ভারতবর্ষ এই তিন দেশে বাস

করে জগতের অধিকাংশ লোক, এরা মাথা তুললে নব সমাজকে রোধ করে কে?

অক্টোবর বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পর থেকে ভারতবর্ষের মুক্তিযোদ্ধারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন লেনিনের প্রতি—বিদেশে থেকে যাঁরা লড়ছিলেন তাঁরা চেয়েছিলেন বিপ্লবের পীঠস্থান মস্কোর দিকে। লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ছুটে গিয়েছিলেন মহেন্দ্র প্রতাপ, বরকতুল্লাহ, ডাবত্নল্লাহ, সিন্ধী, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখেরা। খিলাফৎ ও অসহযোগ সংগ্রামের একটা ঢেউ নিয়ে গিয়েছিল বহু ভারতীয় মুসলমানকে পামীর অতিক্রম করে সোভিয়েট দেশে, যেখানে তাঁদের মধ্যে একদল প্রবাসে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন মেক্সিকো থেকে আগত মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নেতৃত্বে। সাম্রাজ্যবাদী প্রচারে বলশেভিকদের দুর্বৃত্ত দানবরূপে চিত্রিত করা সত্ত্বেও এদেশের সাধারণ মানুষ আসল ব্যাপার বুঝতে বিলম্ব করে নি। ১৯২০-২১ সাল থেকেই লেনিন সম্বন্ধে বাংলা এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় বই বেরিয়েছে, সব কিছু না জেনেও আমরা বুঝেছি সাম্রাজ্যতন্ত্রকে মারবে যে-শক্তি, যেন সোভিয়েটের 'গোকুলে বাড়িছে সে'।

১৯২০ সালে কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের দ্বিতীয় কংগ্রেসে লেনিন সযত্নে এবং একান্ত ধৈর্যসহকারে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের অতিবামচিন্তামূলক প্রস্তাব সংশোধন করে দিয়ে ভারতবর্ষের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের সঙ্গে কমিউনিস্টদের সখ্যসূত্রের সন্ধান দেন। ১৯২২ সালে কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের চতুর্থ কংগ্রেসে লেনিন যে পাঁচজন ভারতীয়কে বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তাঁরা হলেন মানবেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে, নলিনী গুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসু ও চিররঞ্জন দাস (দেশবন্ধুর পুত্র)। উল্লেখযোগ্য এই যে পাঁচজনের মধ্যে চারজনই বাঙালী।

বিপ্লবীশ্রেষ্ঠ লেনিনের কাছে কোন যাদুমন্ত্র ছিল না, ছিল মানুষ সম্বন্ধে মমতা, ছিল শ্রমজীবী জনতার অমোঘ সংঘশক্তি সম্বন্ধে অগাধ বিশ্বাস, ছিল সেই জনতার সংগ্রামী হাতিয়ার হিসাবে কমিউনিস্ট

পার্টির ভূমিকা সম্বন্ধে নিশ্চিতি। ছিল জ্ঞান ও কর্মের অসাধারণ সমন্বয়প্রতিভা আর এ সবের ভিত্তিভূমিরূপে সমাজ বিবর্তনের গতিপ্রকৃতি বিষয়ে মার্কস্‌বাদের শিক্ষাকে আত্মস্থ করে পরিবর্তমান পরিস্থিতিতে তার সার্থক প্রয়োগে অভূতপূর্ব পারদর্শিতা। লেনিনের কর্মে ও চরিত্রে ঘটেছিল অসামান্য ধীশক্তির সঙ্গে বিপ্লবের পথে অজস্র প্রতিবন্ধককে পরাভূত করে বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করার তুলনাহীন নৈপুণ্যের সমাবেশ। প্রকৃতই বলা যায় যে একান্ত মুষ্টিমেয় ইতিহাসস্রষ্টাদের মধ্যে তিনি একজন প্রধান। আজকের যুগের যদি কোন যুগন্ধর থাকেন তো নিঃসংশয়ে তিনি হলেন লেনিন।

লেনিনের স্মৃতি নিয়ে ম্যাক্‌সিম গোর্কির রচনায় আছে যে একদিন বেঠোফেন-এর সঙ্গীত শুনতে শুনতে তিনি বলেছিলেন: 'আপাসিওনাতা'-র চেয়ে মহিমামণ্ডিত কিছু আছে বলে আমি জানি না; আমি চাই রোজই একে শুনি; এ-সঙ্গীত যে আশ্চর্য, অতি-মানবীয়। হয়তো বড্ড সাদাসিধে কথা বলে ফেলছি, কিন্তু আমি সর্বদা ভাবি। গর্বভরে ভাবি মানুষ কত আশ্চর্য জিনিস সৃষ্টি করে।' গোর্কি লিখছেন যে কিছু পরে, চোখ দুটি একটু কুঁচকে লেনিন বললেন: "কিন্তু আমি তো খুব বেশি এমন জিনিস শুনতে পারি না —এতে স্নায়ুর উপর ছোঁওয়া লাগে, বোকার মতো কথা বলতে ইচ্ছা করে। মিষ্টি কথা মুখে আসে, ইচ্ছা করে সেই মানুষগুলির মাথায় হাত বুলোতে যারা এই জঘন্য নরকে বাস করেও এমন সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে—কিন্তু আজ তো কারও মাথায় হাত বুলোবার সময় নয়, হাতটাতে হয়তো কামড়েই দেবে কেউ! আজ যে মাথায় বাড়ি দিতে হবে, নির্মম হতে হবে, যদিও আমাদের আদর্শ বলে যে কারও উপর জবরদস্তি ঠিক নয়। হুঁ, হুঁ, আমাদের কাজ যে বেজায় কঠিন!" কর্তব্যসাধনে পরাঙ্মুখতা লেনিনের চরিত্রে ছিল না, কিন্তু সন্দেহ নেই যে মানুষ লেনিন ছিলেন একদিকে কুসুমের মতো কোমল, তেমনই আবার যথাযথ ক্ষেত্রে ছিলেন বজ্রের মতো কঠোর। তাঁর স্থিতপ্রজ্ঞ চরিত্রে এই উভয় বৈশিষ্ট্যের একটা সহজ সামঞ্জস্য ঘটেছিল এবং সেজন্যই তাঁর অবর্তমানে সোভিয়েট বিপ্লবের নেতৃত্বে

মাঝে মাঝে যে বিকৃতি দেখা দিয়েছে তা লেনিনের জীবদ্দশায় দেখা দেয় নি।

সমাজবাদী বিপ্লবের নেতা, সোভিয়েট রাষ্ট্রের স্থাপয়িতা ও সর্বপ্রধান স্থপতি, সর্ববিশ্বের জন-অভ্যুত্থানের সর্বমান্য ও সর্বসম্মত পথপ্রদর্শক, মার্কস্‌বাদী চিন্তার ধারাতে অগ্রসর করে নিয়ে নতুন সমসুযোগের সমাজনির্মাণে সর্বাগ্রগণ্য প্রতিভারূপে লেনিনের অবদান ইতিহাসে ভাস্কর হয়ে রয়েছে। জওয়াহরলাল নেহরু আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন যে লেনিনের শক্তির উৎস হল ইতিহাসের ছন্দের সঙ্গে মিলিয়ে পা ফেলে এগোবার মতো জ্ঞান এবং একাগ্রতা। আর লেনিন জানতেন যে বিপ্লবের অপরাজয়ত্বের মূল কারণ হল এই যে সাধারণ মানুষ যখন বাস্তবিকই আত্মশক্তি বলে নব সমাজ গঠনে প্রবৃত্ত হয় তখন তার চেতনা হয় উদ্বুদ্ধ, তার মর্যাদাবোধ হয় প্রখর, তার কর্মক্ষমতা ও উদ্যোগ হয় অপরিসীম। মেহনতী মানুষ তার মহিমার প্রমাণ দেবে বিপ্লবে এবং বিপ্লবোত্তর কর্মকাণ্ডে—এই ছিল তাঁর অটল বিশ্বাস, এজন্যই তিনি একবার বলেছিলেন, 'প্রতিটি রাঁধুনী যেন রাষ্ট্র চালাবার ক্ষমতা আয়ত্ত করে'।

মস্কো শহরের রেড স্কোয়ারে লেনিনের মরদেহ আজও রক্ষিত, দিনের পর দিন বিরামহীন জনতা সেখানে আসে, নীরবে অপেক্ষা করে, সূচীভেদ্য স্তব্ধতার মধ্য দিয়ে একে একে লেনিনকে দেখে যায়, আর হয়তো লেনিনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ভাবার চেষ্টা করে—

রুশ দেশের কমরেড লেনিন
জাগ্রত সে পাথরে শয়ান।
জনযোদ্ধারা হুঁশিয়ার
দুনিয়াই আমাদের স্থান॥

(ল্যাংস্টন হিউজ অবলম্বনে বিষ্ণু দে-র রচনা)।

এঙ্গেল্‌স্‌ স্মরণে

দেড়শো বছর আগে, ১৮২০ সালের ২৮শে নভেম্বর তারিখে, জার্মানীর বারমেন শহরে ফ্রেড্‌রিক এঙ্গেলস্‌-এর জন্ম হয়েছিল। মার্কস্‌বাদ বলে অভিহিত যে বিশ্ববীক্ষা আধুনিক জগতে যুগান্ত এনেছে, তার মূল প্রবক্তারূপে কার্ল মার্কস্‌-এর সঙ্গে এঙ্গেলস্‌-এর নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে নিত্যকাল ধরে কীর্তিত হবে।

কার কাছে যেন শুনেছিলাম এঙ্গেল্‌স্‌ সম্বন্ধে, যে তিনি হলেন যেন 'কাব্যের উপেক্ষিতা'। মার্কস্‌-এর নামে জগৎ জুড়ে যে জয়-জয়কার, তার ছিটেফোঁটা মাত্র নাকি এঙ্গেল্‌স্‌-এর ভাগ্যে জুটে থাকে, অথচ মার্কস্‌বাদ বিশ্বজনের সামনে উত্থাপনা ব্যাপারে এঙ্গেল্‌স্‌-এর ভূমিকা বিরাট।

কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। এঙ্গেল্‌স্‌ নিজেই শেষজীবনে এক চিঠিতে (১৪ জুলাই, ১৮৯২) এ-ধরনের কথার সুন্দর জবাব দিয়ে গেছেন। বন্ধু মেহ্‌রিংকে তিনি লেখেন যে, 'আমার কৃতিত্বের প্রাপ্য যে প্রশংসা তার বেশি' দিলে তিনি ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকেন। চিঠিতে আরও রয়েছে : "চল্লিশ বছর ধরে মার্কস্‌-এর মতো মানুষের সঙ্গে কাজ করার সৌভাগ্য ঘটলে নিজের জীবনকালে কেউ যতটা স্বীকৃতি পাওনা মনে করতে পারেন তা না পাওয়াই স্বাভাবিক। তারপর মহত্তর মানুষটির তিরোভাব যখন ঘটে, তখন স্বল্পতর ব্যক্তিটি সহজেই অতিরিক্ত সুখ্যাতি পেয়ে থাকেন। বর্তমানে আমার ক্ষেত্রে এই ব্যাপারই ঘটেছে। তবে জানি যে অবশেষে ইতিহাস সবকিছু ঠিক করে দেবে, আর তখন ঘটে যাবে ব্যক্তির পঞ্চত্বপ্রাপ্তি। কোনো বিষয়ে কোনো কিছুই তখন আর জানার উপায় থাকবে না।"

শুধু স্বভাবসিদ্ধ বিনয়পরবশ হয়ে নয়, প্রকৃত সত্যদ্রষ্টা ছিলেন বলেই এঙ্গেল্‌স্‌ এমন কথা বলতে পেরেছিলেন। আত্মচিন্তা তাঁর কখনও ছিল না, নিজের সমাধিটুকুও তিনি চান নি। দেহাবশেষ ভস্ম

করে সমুদ্রের জলে ছড়িয়ে দেবার ইচ্ছাই তিনি বন্ধুদের কাছে প্রকাশ করে গিয়েছিলেন। 'কোনো বিষয়ে কোনো কিছু জানার' বাইরে তিনি চলে গেছেন। কিন্তু পৃথিবীর মানুষ কখনও তাঁকে ভুলবে না। মার্ক্স্‌-এর মহত্তর প্রতিভার কথা তাঁর মতো অকুণ্ঠে কেউ কখনও বলেনি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও অবিসম্বাদিত যে মার্ক্স্‌বাদের জনক তাঁরা উভয়েই। এজন্যেই এঙ্গেল্‌স্‌-এর মুখ দিয়েই বেরিয়েছিল মার্ক্স্‌বাদ সম্বন্ধে একটি কথা—"Our Doctrine" (আমাদের তত্ত্ব)—যার প্রথম প্রবচন ও বাস্তবে রূপায়ণের প্রয়াস করেছিলেন ঐ দুই মহাপুরুষ মিলে।

অভিন্নহৃদয় সৌহার্দ্য ও সহকারিতার যে উদাহরণ মার্ক্স্‌ ও এঙ্গেল্‌স্‌-এর জীবনে মেলে তার তুলনা ইতিহাসে নেই। মার্ক্স্‌ জন্মাবার দুই বৎসর পরে এঙ্গেল্‌স্‌ জন্মেছিলেন। প্রথম যৌবনে উভয়ের শিক্ষার ধারা প্রায় একই খাতে প্রবাহিত হয়েছিল। হেগেল্‌-এর প্রভাবে পড়া এবং তা থেকে বেরিয়ে আসা, ফরাসী বিপ্লবের পরবর্তী ঐতিহাসিক অধ্যায়ের সঙ্গে একাত্মতা অর্জন, সাহিত্য শিল্প এবং মনীষার সর্ববিধ ব্যঞ্জনায় অপার আগ্রহ, যে সমাজ সত্য 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ' তাকে জানার একাগ্র আকুলতা, উভয় মনস্বীর জীবনে লক্ষ্য করা গিয়েছিল। প্রথম যৌবনেই উভয়ের পরিচয়, ১৮৪৪ সাল থেকে সর্বকর্মে উভয়ের অন্তরঙ্গ সহযোগিতা, তৎকালীন জার্মানীর খণ্ডবিপ্লবে উভয়ের অংশগ্রহণ, ক্রমশ হেগেল-এর তত্ত্বকে অতিক্রম করে নূতন জগজ্জয়ী চিন্তার উন্মেষ, সংগঠন ব্যাপারে ক্লান্তিহীন চিন্তা ও সিদ্ধান্তে উপনয়নের ঐকান্তিক প্রয়াস ছিল উভয় মনস্বীর প্রথম জীবনের বৈশিষ্ট্য। পিতার কর্মব্যপদেশে ইংলণ্ডে অবস্থান এঙ্গেল্‌স্‌কে বিপ্লবী কর্মধারা থেকে তিলমাত্র বিচ্যুত করতে পারে নি—২৪।২৫ বৎসর বয়সে ইংলণ্ডের শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা সম্বন্ধে প্রামাণিত তথ্যসমৃদ্ধ তত্ত্বালোকিত গ্রন্থে শ্রেণীসংঘর্ষ ও তার অবসান-সংঘটনের আলেখ্য তিনি এঁকে ছিলেন। অসামান্য পাণ্ডিত্যের সঙ্গে তীক্ষ্ণ ও অক্লান্ত লেখনীধারণের ক্ষমতা তাঁকে প্রথম জীবনেই জার্মান সাম্যবাদ চিন্তার নির্ধারণ ও প্রচারে পুরোধারূপে দাঁড় করিয়েছিল। ১৮৪৭-৪৮ সালে যে

'কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার' তৎকালীন দুনিয়াতে বজ্রনির্ঘোষের মতো শোনা গিয়েছিল, যার রচনায় ছত্রে ছত্রে কাল মার্ক্‌স্‌-এর অগ্নিগর্ভ ভাতি সুস্পষ্ট, তার ভিত্তিভূমি স্থাপিত হয়েছিল এঙ্গেল্‌স্‌-কৃত খসড়ায় 'The German Ideology'-র মতো পূর্বতন রচনায়, যেমন, তেমনই 'কমিউনিষ্ট ইশ্‌তেহারে' তার রচয়িতা হিসাবে নাম রয়েছে উভয় মনীষীর—কাল মার্কস্‌ এবং ফ্রেড্‌রিক এঙ্গেলস। দু'জনাই হলেন ইতিহাসের নব পর্যায়ে যুগ্ম পথিকৃৎ।

মার্কস্‌ তাঁর মহাগ্রন্থ 'ক্যাপিটাল'-এর প্রথম ও সবচেয়ে মহার্ঘ খণ্ড সমাপ্ত করে বন্ধুকে লিখেছিলেন: "এইমাত্র পাণ্ডুলিপি শেষ করলাম। তোমাকে আলিঙ্গন জানাই, কারণ তোমার সহায়তা বিনা এ কাজ সম্পূর্ণ হতো না।" বিপ্লবী মার্কস্‌-কে দেশ থেকে দেশান্তরে আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুরে অবশেষে ইংলণ্ডে বসবাস করতে হয়েছিল। কিন্তু প্রথম জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে বাস করার পর তাঁকে কালাতিপাত করতে হয়েছিল অবর্ণনীয় দারিদ্র্যে, পত্নী অভিজাতকন্যা হয়েও হাসিমুখে স্বামীর সহধর্মিনী হয়ে সকল কষ্ট তুচ্ছ করেছিলেন, পুত্রকন্যাকে চোখের সামনে চিকিৎসা ও পথ্যের অভাবে মরতে দেখতে হয়েছিল তাঁদের, দৈনন্দিন জীবননির্বাহের বিড়ম্বনার অবধি ছিল না। তবুও যে মার্কস্‌ হার মানতে বাধ্য হন নি, তার হেতু হল বন্ধু এঙ্গেল্‌স্‌-এর নিয়ত সহায়তা। শুধু অর্থ দিয়ে নয়, সর্বতোভাবে মার্কস্‌-এর একাত্ম হয়ে সহকারিতায় তিনি নিরন্তর লিপ্ত ছিলেন। উভয় বন্ধুর পরস্পরলিখিত পত্রগুলি যেমন এক মহাকাব্যের উপাদান—তাতে আছে জীবনযাত্রা বিষয়ে টুক্‌রো টুক্‌রো খবর, আর অনেক বেশী আছে দুই মনীষীর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড নিয়ে যে চিন্তা, মানুষের সমাজ-জীবনে মৌলিক পরিবর্তন আনার যে আগ্রহ এবং মনীষাদীপ্ত যে প্রজ্ঞা তার চমৎকার প্রতিকৃতি।

সাম্যবাদের প্রচারে নিয়ত নিযুক্ত ছিলেন এঙ্গেল্‌স্‌—সঙ্গে সঙ্গে মূলগত তত্ত্ব নির্দ্ধারণ ব্যাপারে মার্কস্‌-এর সহযোগীরূপে তাঁর ভূমিকা ছিল এত স্পষ্ট যে বহির্জগতের চোখে প্রায়ই এঙ্গেলস্‌কে উভয়ের মধ্যে অগ্রণী বলেই মনে হওয়া অসঙ্গত ছিল না। যুদ্ধবিদ্যা

বিষয়ে তিনি গভীর অধ্যয়ন করেছিলেন ; বন্ধু মহলে তাঁর ডাক-নাম ছিল 'জেনারল', তাছাড়া মার্কিন বিশ্বকোষের মতো গ্রন্থে সামরিক বিষয়ে লেখার আহ্বানও তাঁর কাছে আসত। কৃষি-সমস্যা সম্বন্ধে মূলগত মার্কস্‌বাদী চিন্তার প্রথম প্রকাশ তাঁর রচনায়। মার্কস্-এর বহু অমূল্য চিন্তাফল যখন সাধারণ পাঠকের নাগালের প্রায় বাইরে, তখন সেই গভীর চিন্তার জটিল জাল কিছু পরিমাণে সরিয়ে, বক্তব্যের প্রখরতাকে অক্ষুণ্ণ রেখে, অথচ যথাসম্ভব সরল ভাষায় তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছিলেন এঙ্গেলস্ তাঁর 'এ্যাণ্টি ডুরিং' গ্রন্থে (১৮৭৮), যার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 'বৈজ্ঞানিক ও আকাশচারী সমাজবাদ' নিয়েই অধিকাংশ মার্কস্‌বাদীর হাতেখড়ি ঘটেছে। পরিবার, ব্যক্তিগত স্বত্ব ও রাষ্ট্রের উদ্ভব বিষয়ে তাঁর গ্রন্থ মার্কস্‌বাদী চিন্তার সমুজ্জ্বল রত্নবিশেষ। বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ও আগ্রহ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক বিকাশের সম্যক্ উপলব্ধিতে সহায়তা করার সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়। তাঁর লিখিত বিভিন্ন পত্রাবলীতে যে মনীষার দীপ্তি তা ইতিহাসে অম্লান থাকবে।

১৮৭০ সাল থেকে ম্যাঞ্চেস্টারে কাজকর্ম ছেড়ে সম্পূর্ণ সময় বিপ্লবী প্রচেষ্টায় নিয়োগ করা এবং মার্কস্-এর সন্নিধানে থাকার উদ্দেশ্যে এঙ্গেলস্ লণ্ডনে বসবাস আরম্ভ করেন। পূর্ব হতেই সর্ব-ব্যাপারে তিনি ছিলেন মার্কস্-এর দক্ষিণহস্ত ; 'প্রথম আন্তর্জাতিক' গঠন ও পরিচালনে তাঁর অবদান ছিল বিপুল। বিশ্বের দেশে দেশে সাম্যবাদের বারতা তখন বিস্তৃত হতে চলেছে। ভারতবর্ষ থেকে 'প্রথম আন্তর্জাতিক'-এর দফতরে চিঠি গেছে ১৮৭১ সালে। মার্কস্-এর মতোই এঙ্গেলস্ ভারতবর্ষ নিয়ে বহু আলোচনা করেছেন, লিখেছেন, ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি লিখেছেন, পরে আশা প্রকাশ করেছেন ভারতবর্ষে আসন্ন বিপ্লব নিয়ে। সাম্যবাদের ঐ দুই মহান্ প্রবক্তা বিপ্লবকে কখনও পাশ্চাত্যের সংকীর্ণ গণ্ডীতে বেঁধে রাখেন নি, তাঁরা চেয়েছেন জগজ্জনের মুক্তি, আজীবন অক্লান্ত কাজ তদুদ্দেশ্যেই করে চলেছেন।

১৮৮৩ সালে মার্কস্-এর মৃত্যুর পর এঙ্গেলস্ হলেন সাম্যবাদী

সংগ্রামের অবিসংবাদী অধিনায়ক। তাঁর ব্রত হল মার্কস্-এর অপ্রকাশিত রচনাবলী অবিকৃতভাবে (অথচ বোধগম্য অবস্থায় সজ্জিত করে) প্রকাশ করা। তাঁর লক্ষ্য হল মার্কস্‌বাদের বিপ্লবী চরিত্রকে বিকৃত করে ফেলার যে প্রবৃত্তি বহু বিদ্বান অথচ অদূরদর্শী, কিম্বা সুবিধাবাদী নেতার মধ্যে দেখা দিয়েছিল, তাকে রোধ এবং পরাস্ত করা। জীবনের শেষ অধ্যায়ে মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতা তাঁকে পেতে হয়েছিল। জার্মান সমাজবাদীদের মধ্যে, এমনকি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বলে খ্যাত কাউট্‌স্কির মধ্যেও যে দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল তারই ফলে মার্কস্-এর ঐতিহাসিক রচনার কদর্থ করার চেষ্টা হলে এঙ্গেলস্-এর নিজস্ব প্রবন্ধেরই অংশবিশেষ ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দেওয়া হল, মার্কস্‌বাদের বিপ্লবী সত্তাকে ক্রমশ নিস্তেজ করে দেওয়ার অপচেষ্টা দেখা গেল। মৃত্যুশয্যা থেকেই এঙ্গেলস্ এই অপকর্মের প্রতিবাদ তেজস্বীস্বরে অনুগামীদের জানিয়েছিলেন। কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত জার্মান সমাজবাদী মহলে এই বিকৃতির ভয়াবহ ফলাফল ইতিহাসকে লক্ষ্য করতে হয়েছে।

মার্কস্-এর মতোই এঙ্গেলস্-এর অন্তরে সাহিত্যবোদ্ধা শিল্প-পিপাসু একটি মানুষ সর্বদা ছিল। জগদ্ধিতে জীবন উৎসর্গ করে-ছিলেন তাঁরা; সর্বমানবের সর্ববিধ অনুভূতি নিয়েই তাঁদের আগ্রহ তাই দেখা গেছে। সাহিত্য শিল্প বিষয়ে এঙ্গেল্‌স্-এর বক্তব্য নিয়ে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ সমুচিত। এখানে তার আলোচনা সম্ভব নয়।

"আমাদের মধ্যে মার্কস্ ছিলেন একমাত্র সর্বাগ্রগণ্য প্রতিভা, তুলনায় আমরা সবাই নিষ্প্রভ"—একথা বলেছিলেন এঙ্গেল্‌স্। এ নিয়ে বিতর্ক অবান্তর। মার্কস্ ছিলেন প্রকৃতই অলোকসামান্য মানুষ। কিন্তু তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু ও সহযোগী এঙ্গেল্‌স-এর যে সুবিপুল কীর্তি, তার দীপ্তি কখনও ম্লান হবে না।

ভারতচেতনা, সমাজবাদ ও মানবিকতা

'গঙ্গামৌক্তিকহারিণী', 'হিমবৎসেতুপর্যন্তং' বিস্তৃত এই মহাজনপদের প্রতি গভীর অনুরাগে আপ্লুত বহু বর্ণনা ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্যে আছে। 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী', রামায়ণের এই পুণ্যবাক্য সকলেরই স্মরণে পড়বে। 'নগাধিরাজ' হিমালয়কে 'দেবতাত্মা' এবং পৃথিবীর 'মানদণ্ড' যিনি বলেছিলেন, সেই কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসের রচনায় যে ভারত-চিত্রণ আছে, তাতে মানুষ এবং প্রাণি-জগৎ এবং নিসর্গবর্ণনা অপার মমতায় সিঞ্চিত বললে অত্যুক্তি হয় না। 'ছিন্নপত্র'-এ ১৬ই মে ১৮৯৩ তারিখের এক অদ্ভুত সুন্দর চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : 'আমি প্রায় রোজই মনে করি এই তারাময় আকাশের নিচে আবার কি কখনো জন্মগ্রহণ করব! যদি করি, আর কি কখনো এমন প্রশান্ত সন্ধ্যাবেলায় এই নিস্তব্ধ গোরাই নদীটির উপরে বাংলাদেশের এই সুন্দর একটি কোণে এমন নিশ্চিন্ত মুগ্ধমনে পড়ে থাকতে পারব! হয়তো আর কোনো জন্মে এমন একটি সন্ধ্যেবেলা আর কখনো ফিরে পাব না। তখন কোথায় দৃশ্য পরিবর্তন হবে, আর কি রকম মন নিয়েই বা জন্মাব! এমন সন্ধ্যা হয়তো অনেক পেতেও পারি, কিন্তু সে-সন্ধ্যা এমন নিস্তব্ধভাবে তার সমস্ত কেশপাশ ছড়িয়ে দিয়ে আমার বুকের উপর এত সুগভীর ভালোবাসার সঙ্গে পড়ে থাকবে না। আশ্চর্য এই, আমার সবচেয়ে ভয় পাছে আমি য়ুরোপে গিয়ে জন্মগ্রহণ করি!…"

তবু মনে হয় ভারতবর্ষ যেন তার অগণিত সন্তানের কাছে যে ভালোবাসা তার প্রাপ্য তা পায়নি। শঙ্করাচার্য নাকি বলেছিলেন, কোটি গ্রন্থে যা বলা হয়েছে তার সারাংশ হল এই যে ব্রহ্ম সত্য এবং জগৎ মিথ্যা। একেই ভারত-মানসের নির্যাস মনে করা নিশ্চয়ই ভুল, কিন্তু যে মাধ্যাকর্ষণ জগৎ ও জীবনকে চলমান রেখেছে তাকে অস্বীকার ও অতিক্রম করার প্রয়াস ভারতবর্ষের চিন্তা ও কর্মকে কম প্রভাবিত

করেনি। হিন্দু মনে বুঝি দেশাভিমান এজন্যও কিছু পরিমাণে ব্যাহত হয়েছে। আর ভারত-জনতার অপর বহুলাংশ মুসলমান চেতনায় দেশের চেয়ে জগৎজোড়া ইসলামী ভ্রাতৃবোধের টান প্রায়ই থেকে গেছে বেশি। এই দোটানার মধ্যে পড়ে বর্বভারানত আমাদের এই দেশ যেন তার সন্তান-সন্ততির কাছে ভালোবাসা পেয়েছে কম। ইংলিশ চ্যানেল থেকে ডোভার-এর সাদা খড়ির টিবি দেখে বিদেশফেরৎ ইংরেজের যেভাবে বুক ভরে ওঠে, অনুরূপ অবস্থায় ভারতবাসীর অনুভূতি বোধ হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে তেমন তীব্র নয়। এই যে বঞ্চনা এতে ভারতবর্ষের ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই, ক্ষতি শুধু আমাদেরই।

তবুও একথা সত্য যে, স্বল্পকালের জন্য বিদেশযাত্রার পরও দেশে ফিরে মনে হয় যে স্বদেশ ভিন্ন আমাদের কোথাও প্রকৃত অবস্থান নেই, বুঝতে পারা যায়, স্বদেশের মায়া কত নিবিড়, অনুভূতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে আমাদের সত্তার শিকড় যে ভূমি স্পর্শ করছে তা হল শুধু স্বদেশেরই ভূমি, চেঁচিয়ে বলতে চায় মন যে ভারতবর্ষের প্রতিটি ঘাসের ডগাকে ভালোবাসি, কায়-মনোবাক্যে এদেশ হল নিজস্ব। মনে পড়ে যাচ্ছে ১৯৪১ সালে দেশ-বিভাগকে সমর্থন করে বক্তৃতা প্রসঙ্গে কলকাতার প্রাক্তন মেয়র আবদুল রহমান সিদ্দীকি বলেছিলেন: "হিন্দু যখন মরে তখন তার শবদাহ করে দেহের ভস্ম ফেলে দেওয়া হয় নদীতে, যার প্রবাহ তাকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়, কে জানে? কিন্তু মুসলমান যখন মরে, তখনও তার চাই দৈর্ঘ্যে ছ' ফুট আর প্রস্থে তিন ফুট এ-দেশের মাটি। জীবনে-মরণে এ-দেশ হল আমাদের!" এর মধ্যে শুধু বক্তৃতার বাহার আর রাজনীতির চাল ছিল না, ঢের বেশি ছিল সানন্দ স্বীকৃতি যে দেশের মাটির মায়াজাল এড়াতে কেউ চাইতেই পারি না।

আজকাল বিদেশে বহু ভারতীয় স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেছেন। পূর্বে যেতেন মুষ্টিমেয়; এখন যাতায়াত সহজ ও দ্রুত এবং পাশ্চাত্যের যেখানে কুবেরের অধিষ্ঠান সেখানে অর্থাগমও মোটামুটি সুসাধ্য (কারও কারও পক্ষে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার

সুযোগও কিছু পরিমাণে অধিক) বলে মাঝে মাঝে একটু যেন অশোভন ভাবেই বিদেশগমন এবং সেখানে অবস্থানের হিড়িক পড়েছে। সন্দেহ নেই তাদের মধ্যে অনেকে বিদেশের প্রাচুর্য ও সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্যের পরিবেশে থেকেও বিলাপ করেন স্বদেশের জন্য, এমন মুহূর্ত কম আসে না, যখন মন যেন হাহাকার করে ওঠে। জানি অন্তত একজন প্রতিভাধরের কথা যিনি ইংলণ্ডে আছেন চল্লিশ বৎসরাধিককাল, স্বর্গ আর মর্ত্যের মধ্যে আটক ত্রিশঙ্কুর মতো উভয় সংকটাপন্ন জীবন, ফিরতে বাস্তবিকই চান কি চান না তা স্থির করাই হয়ে উঠল না, অথচ জানেন (তাঁর নিজের কথায়) যে বর্ণসচেতন ঐ দেশের পোকাগুলোও তাঁর মরা হাড়ে মুখ দেবে না।

হয়তো বিদেশ যাওয়া ভালো অন্তত একটা কারণে, যে তাহলে মানি বা না মানি, এদেশের মায়া যে কত গভীর, কত গাঢ়, কত অন্তরঙ্গ তা মাঝে মাঝে বুঝতেই হয়। ইংলণ্ড বিষয়ে তার সাম্রাজ্যদর্পী কবির কথাই একটু পাল্‌টে বলা যায়:

'What does he know of India,
Who only India knows?'

তাই প্রকৃতই দেশে দেশে যাঁর দেশ ছিল সেই রবীন্দ্রনাথ জগৎপরিক্রমার পর নিজের দেশের সত্তার সঙ্গে সন্নিবিষ্ট হতে পেরেছিলেন, একেবারে জীবনের অন্তিমে যা বলেছিলেন, তাতে যেন প্রতিধ্বনিত হয়েছিল বহুপূর্বের অন্তরবার্তা: "হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি দেখা দিলে আজ কি বেশে! দেখা দিলে আজ পূর্ব গগনে, দেখা দিলে আজ স্বদেশে!"

* * *

ইতিহাসের গতি ইয়োরোপের সঙ্গে এবং মূলত ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্ক ঘটিয়েছিল। সে-সম্পর্ককে কিছু পরিমাণে আত্মীয় করার প্রচেষ্টা বারবার হয়েছে, কিন্তু সাফল্য ঘটেছে বলা চলে না। 'Albion's distant shore' নিয়ে মাইকেল মধুসূদনের দীর্ঘশ্বাস সততা বর্জিত ছিল না। হয়তো সেদিনের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ মনোভাব সমাজের ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র এক ভগ্নাংশে উদ্ভট ও

সঙ্গতিরহিত ছিল না। মাইকেল নিজেই গৌড়জনকে "আশার ছলন" তাঁকে কতদূর ভুলিয়েছিল তা বলে গেছেন। কিন্তু সেই ছলনের পুলকে আজও সাহিত্যকৃতির সাহস ও শক্তি নিয়ে কতিপয় ভারত-সন্তান মুগ্ধ হয়ে চলেছেন, বিচিত্র এই দেশের কোন কোন অঞ্চল থেকে সাধুবাদও পাচ্ছেন। মনোমোহন ঘোষের মতো ইংরেজী ভাষায় বিশুদ্ধ কবির দুর্দশা থেকেও শিক্ষা অনেকে নিতে পারেন নি। বিলাতের স্কুলেই সবাইকে চমকে দিয়ে পিছনের সারি থেকে কিশোর মনোমোহন শেকস্‌পীয়র থেকে উদ্ধৃতি শুনিয়েছিলেন :

Mislike me not for my complexion.

The shadow'd livery of the burning Sun!

'আমাকে কোল দাও' বলে ভারতবর্ষ যখনই পাশ্চাত্যের দরজায় দাঁড়িয়েছে, তখনই বারবার অনেক ধাক্কা তাকে খেতে হচ্ছে—মাঝে মাঝে পিঠ চাপড়ানো হলেও তা ধাক্কা বই আর কিছু নয়। আজও তাই যখন আমরা মনকে চোখ ঠারি এই ভেবে যে বন্ধুতার ভিত্তিতে আমরা ইংরেজ শাসনের হাত থেকে রাষ্ট্রশক্তি তুলে নিয়েছি, তখন প্রায়ই আমাদের হুঁশ ফিরে আসে আর দেখি যে এদেশ স্বাধীন হয়েছে, তাদের জাতিদর্পে আঘাত পড়েছে, এ-বস্তু ইংরেজের বরদাস্ত নয়। মাঝে মাঝে পাকিস্তানের দিকে তারা ঢলে পড়ে, কিন্তু তা পাকিস্তানকে ভালোবেসে নয়, এখনও পাকিস্তানের দুর্বলতাকে ব্যবহার করে ভারতকে বিব্রত করা চলে, দক্ষিণ এশিয়ায় বিস্তৃত ভূভাগে গণ-মুক্তির অগ্রগতিকে রোধ করা যায়।

এমনভাবে গোড়ায় গলদ একটা থেকে গেছে যে যতই মনের দিক থেকে, মর্মের দিক থেকে আত্মীয়তা স্থাপনের চেষ্টা করি না কেন, কেবলই দেখা যাবে 'সে গুড়ে বালি'। যতই প্রাণপণে ছেলেমেয়েদের পড়ানো হোক্ না কেন এমন স্কুলে যেখানে শিক্ষার বাহন হল ইংরেজী (আর শিক্ষকরা সবাই বা অধিকাংশ শ্বেতাঙ্গ বা আধা-শ্বেতাঙ্গ হলে তো আহ্লাদ বেশি), যতই চিত্র-বিচিত্র পত্রিকা পাঠ এবং Beat ও তদ্বিধ সঙ্গীত-চর্চার নেশা ঘোর সৃষ্টি করুক না কেন, যতই যাদের পকেট ভারি, discotheque ইত্যাদি অভিনব

প্রমোদ-গৃহে যাতায়াত তাদের ঘটুক না কেন, ভারতবর্ষের দ্রুত পরিবর্তমান জীবনে তাদের প্রভাব হবে অকিঞ্চিৎকর। অনুবীক্ষণ বিনা যাদের সন্ধান মেলে না, দেশকে তারা পথের নিশানা দেখাতে পারবে না, কিন্তু হয়তো পারবে সাময়িক ক্ষতি ঘটাতে, বিভ্রম সৃষ্টি করতে পারবে, দেশের কক্ষচ্যুতি কিছুকাল জীইয়ে রাখতে সাহায্য করবে। ইতিমধ্যে অবশ্য সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হব, কারণ এতকালের গোলামী মনোবৃত্তি (যার বিপক্ষে একদা মহাত্মা গান্ধী সারা দেশকে লড়বার ডাক দিয়েছিলেন) সহজে যাবে না। বাঙালীর মতো ভাষাভিমানীরাও তাই দেখি ইংরেজী সম্বন্ধে এমন গরুড়পক্ষী সুলভ ভক্তি দেখিয়ে নিজের ভাষাকে কার্যতঃ অবজ্ঞা করেন যে বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে ১৯৭০ সালে বাংলা ভাষা 'সংরক্ষণ' সমিতির পত্তন করতে হয়। তাই দেখি অধুনা ক্ষমতাচ্যুত ব্রিটিশ 'লেবর' সরকারের এক মন্ত্রী লর্ড সভায় হয়তো একটু সকৌতুকে কিছুকাল আগে বলেছিলেন যে লণ্ডনের গরিব এলাকায় শ্বেতাঙ্গ গুণ্ডারা দল বেঁধে পাকিস্তানীদের (এবং ভারতীয়) বেদম প্রহার করছে বটে, কিন্তু তার সুরাহা হবে, কারণ মার যারা খাচ্ছে তাদের যে 'উপভাষা' (অর্থাৎ বাংলা) সেটা কয়েকজন ব্রিটিশ পুলিশ শিখে নিচ্ছে এবং তাদের নালিশ তখন তারা বুঝতে পারবে!

মোপাসাঁর গল্প এ-যুগে বোধহয় বড় কেউ পড়ে না, কিন্তু তাঁর একটি কাহিনী আছে ফরাসী সেপাইয়ের কাফ্রী মেয়ে বিয়ে করার সাধ নিয়ে। তখনকার ফ্রান্সে বিয়ের আগে বাপ-মায়ের অনুমতি দরকার হ'ত আর ঐ সেপাইয়ের মা ছেলের আগ্রহ দেখে চেয়েছিলেন ভাবী বধূকে কিছুদিন পরখ করে নিতে। ফরাসী গ্রাম্য পরিবারে এসে মেয়েটি সবাইকে আপন করতে পেরেছিল। কিন্তু মায়ের মন ক্রমাগত খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগল—'এ-বৌ যে বড্ড বেশি কালো, আর একটু কম কালো হলে চালিয়ে দিতে পারতাম, কিন্তু একে নিয়ে ঘর করতে পারি না।' শেষ পর্যন্ত বিয়ে হল না—বর্ণব্যাপারে পাশ্চাত্যের সবচেয়ে সুসভ্য দেশের মনে এবং আত্মায় যে গলদ তারই ইঙ্গিত দিলেন মোপাসাঁ। যে ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে

অধুনা Franz Fanon প্রভৃতির লেখায়। এবং ফরাসী আধিপত্যের বিপক্ষে আলজীরিয় ও অন্যান্য পদানত দেশের বিদ্রোহ ও সংগ্রামে।

তবু তো ইয়োরোপের সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে তারা জানে যে বর্ণবিদ্বেষ ব্যাপারে ইংরেজ হল ইয়োরোপে অদ্বিতীয়—আজ যে দক্ষিণ আফ্রিকা, রোডেসিয়া প্রভৃতির সঙ্গে তার মিতালি, সেটা আকস্মিক নয়। সে দেশে সবাই অনুদার একথা অবশ্য সত্য নয়; শ্রেণীকর্তৃত্বের কালিমামুক্ত হলে সে দেশের শ্রমজীবীরা যে আজকের ব্যাপক সংকীর্ণ মনোভাব থেকে নিস্তার পাওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা রাখে তার প্রভূত প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু মোটের উপর সে-দেশের মানসিক আবহাওয়াতে আছে সকল বিদেশী সম্পর্কেই কিঞ্চিৎ অনীহা এবং অ-শ্বেতকায়দের সম্পর্কে প্রায়-নিরপনেয় অবজ্ঞা। অল্পাধিক পরিমাণে একথাই পাশ্চাত্য জাতিগুলির ক্ষেত্রে সত্য। ঐ অবজ্ঞার বাহ্যরূপে তফাৎ আছে। কিন্তু "the lesser breed without the law" সম্বন্ধে নিজেদের অকাট্য উৎকর্ষ এবং দূরত্ব তাদের কাছে প্রায় তর্কাতীত। ধর্মপ্রচারে কিম্বা প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধানেও এটা দেখা গেছে, রাজকার্যে তো বটেই। Franz Fanon-এর মতো চিন্তাশীল লেখক তাই বলেছেন ইয়োরোপের শক্তিপ্রসার এবং তজ্জনিত দম্ভ তার ঐতিহ্যসমৃদ্ধ মানবিকতাকেই ক্রমাগত খণ্ডিত ও বিকৃত করে এসেছে।

* * *

সমাজবাদী বিপ্লব পশ্চিম ইয়োরোপের অগ্রগামী অঞ্চলে না ঘটে পশ্চাৎপদ রাশিয়ায় হয়েছিল বলে মার্কসীয় তত্ত্ব অসিদ্ধ কল্পনা করে যারাই উল্লাস বোধ করুন না কেন, বিপ্লব যে দুনিয়ার এক-ষষ্ঠাংশ জুড়ে এশিয়া এবং ইয়োরোপে পরিব্যাপ্ত এলাকায় প্রথম সংসাধিত হয়েছে এটাকে ইতিহাসের একটা বিশেষ সুঘটন মনে করাই উচিত। মার্কস্-এঙ্গেলস্-এর পত্রাবলী থেকে জানা যায় যে ১৮৫৮ সালেই তাঁরা আশংকা প্রকাশ করেছিলেন যে বিপ্লব যদি শুধু পৃথিবীর 'ছোট্ট একটা কোণে' (অর্থাৎ ইয়োরোপে) সংকীর্ণ থাকে তো সমূহ বিপদ, কারণ তাকে পিষে মারার সরঞ্জাম বাকি দুনিয়া থেকে নিয়ে পুঁজি-পতিরা আবার সর্বনাশ ঘটাতে পারে। লেনিনের নেতৃত্বে অক্টোবর

বিপ্লব যখন এল, তখন প্রাক্তন জার-সাম্রাজ্য থেকে ধনতন্ত্রের বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে সর্বদেশে সর্বাধিক পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের সম্ভাবনা সুপ্রসারিত এবং সাফল্য ক্রমান্বয়ে সুনিশ্চিত হতে থাকল। খাস সোভিয়েট দেশে নানা জাতি, নানা বর্ণ, নানা ভাষা, নানা পরম্পরার অস্তিত্ব বিপ্লবের রূপায়ণকে বিশিষ্ট চরিত্র দিল, যা ছিল "জাতিপুঞ্জের কারাগার" সেখানে জাতিগত অবহেলা, অবমাননা, নির্যাতনের পূর্ণ অবসান হল, 'সবার পরশে পবিত্র-করা তীর্থ নীরে' নব-সমাজের অভিষেক ঘটল। বর্তমান যুগে সর্বাগ্রগণ্য পাশ্চাত্যে যে মানবিকতা লোভজটিল সমাজকর্তৃত্বের অকল্যাণে বিকৃত ও খণ্ডিত হয়েছিল, সেই মানবিকতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা বিপ্লবের প্রসাদে সম্ভব হল।

সোশালিজম্-এর মন্ত্রবলে সবাই অচিরে বদলে গেল ভাবা বাতুলতা। নূতন সমাজ জন্ম নেয় প্রাচীন সমাজের গর্ভে; তাই সকল জন্মচিহ্ন তৎক্ষণাৎ দূর হবার তো নয়। ইতিহাস তো কখনও পুরোনো শ্লেটের উপর যা কিছু লেখা তাকে অবিলম্বে সম্পূর্ণ মুছে ফেলে এগুতে পারে না। প্রাচীনের টান তো অবহেলা করার মতো ব্যাপার নয়; উত্তরাধিকারের বোঝা সভ্য মানুষের ক্ষেত্রে তো ভারি কম নয়; পরম্পরার প্রভাবকে গুণগত দিক দিয়ে অতিক্রম করা তো দুষ্কর কর্ম। রবীন্দ্রনাথের মতো ঋষি অনুভব করেছিলেন, তাঁর সাধনার মাধ্যমে, কেমন করে 'এখনও নিজেরই ছায়া রচিছে কত যে মায়া', দেখেছিলেন কিভাবে 'এখনও মন যে মিছে, কেবলই টানিছে পিছে'। সমাজবাদী বিপ্লবও হল একপ্রকার সাধনা, তার সিদ্ধিপথে কণ্টকের তো অভাব নেই। সেক্ষেত্রে শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ স্বর্গরাজ্য প্রত্যাশা করা বাতুলতা, অনৈতিহাসিক কল্পনা-বিলাস মাত্র।

তবে বলা যায়, কতকটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই বলা যায়, যে সমাজবাদী পরিবেশেই (তার বহু বিচ্যুতি ও অপূর্ণতা সত্ত্বেও) মানবিকতার জয় ঘটেছে এবং ঘটবে। 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য নির্বিশেষে বিঘোষিত এই মহাবাণী সর্বজনের জীবনে বাস্তব সার্থকতা পেতে পারে

শ্রেণীকলুষমুক্ত সমাজব্যবস্থার মাধ্যমে। এজন্যই "রাশিয়ার চিঠি"-তে চল্লিশ বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ 'ঐতিহাসিক মহাযজ্ঞ'-এর কথা বলেছিলেন, দেশবাসীকে ডাক দিয়ে শুনিয়েছিলেন যে মানুষের স্বভাবের গভীরে প্রোথিত রিপু লোভকে উৎপাটিত করার জন্য বহু বর্ণ বহু জাতি বহু ভাষাভাষী অগণিত সাধারণ মানুষকে নিয়ে চেষ্টা চলছে, সর্বজনের সুখ স্বস্তি ও প্রকৃত স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চলছে, শিল্প সাহিত্যের সিংহদ্বার যাতে সবার সামনে খুলে দেওয়া যায় তার প্রযত্ন চলছে। প্রায় একই সময়ে সমৃদ্ধ আমেরিকায় কুবেরের স্ফীতোদর মূর্তি তাঁর বিস্বাদ লেগেছিল; তাঁর মন পড়েছিল অন্যত্র, যেখানে লক্ষ্মীর কল্যাণী মূর্তিতে মানুষের জীবন প্রতিষ্ঠা ছিল সমাজের কাম্য। তারই অনুসরণে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ' আখ্যা দিয়ে সোভিয়েট দেশ সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

ঐশ্বর্যের চোখ-ঝলসানো রূপে ধাঁধা লাগা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু ভারত-মানসের সঙ্গে তার আত্মিক যোগ নেই। বিত্তাহরণের মহত্ত্ব আমাদের কাছে প্রশ্নাতীত। প্রকৃতির কল্যাণে আমাদের পক্ষে জীবনযাত্রায় বিলাসপ্রকরণ বাহুল্য, কিছুটা অসঙ্গত। নিছক অর্থ এবং সম্পদের মোহে দিগ্‌ভ্রান্ত হওয়া ভারত-সত্তার অপমান। সর্বস্তদ্ব্‌দ্ধিমাপ্নোতু সর্বঃ সর্বত্র নন্দতু" এই হল ভারতবর্ষের শাশ্বত প্রার্থনা।

এর সঙ্গে মৌলিক সঙ্গতি রয়েছে সমাজবাদী ব্যবস্থার। এজন্যই সমাজবাদী জগতে মানুষের স্বীকৃতিতে শ্রেণীভেদ ও গাত্রবর্ণের স্থান নেই, এজন্যই সেখানকার আকাশে-বাতাসে আত্মীয়তার স্পর্শ পূর্বদেশগত আমরা সবাই পেয়ে এসেছি। এজন্যই সেখানকার প্রত্নতত্ত্ব আমাদের মতো জরদ্‌গব দেশকে যাদুঘরের নিদর্শন হিসাবে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে না। এজন্যই সেখানকার সাহিত্য ও শিল্পবিচারে আমরা অন্য গ্রহের নিম্নতর প্রাণী নই। এজন্যই মানবপরিবারে আমাদের মতো আপাতভাগ্যহত দেশের স্থান ও মর্যাদা সম্বন্ধে সমাজবাদী জগতে প্রশ্ন নেই। এজন্যই পণ্ডিত

সুন্দরলালের মতো মহাজন সমাজবাদী দেশে গিয়ে বলতে পেরে-
ছিলেন প্রকৃতই 'বসুধৈব কুটুম্বকং' বাক্যটি সেখানে সার্থক।

১৩৪৮ সালে ১লা বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ তাঁর যে অন্তিম ও অতুলন ভাষণ দিয়েছিলেন, তাতে ব্যক্ত করেছিলেন তাঁর আশা যে মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্ব দিগন্ত। এখানে 'পূর্ব' বাক্যটির সংকীর্ণ ভৌগোলিক ব্যাখা অসঙ্গত; 'পূর্ব' বলতে তিনি বুঝিয়েছিলেন সূর্যোদয়ের নবপ্রভাতের মতো নব-জীবন প্রতিষ্ঠা ও গঠনের কথা। এই 'পূর্ব-দিগন্তে' অচলায়তনের স্থান নেই। —মহাত্মা কবীর বলেছিলেন সাধনার যুদ্ধ বিষয়ে: 'আকাশে বাজছে রণদামামা, যুদ্ধের নাগাড়া বাজছে'। এই সংহত, সংযত, সৌষ্ঠবমণ্ডিত, শক্তিমান্ সংগ্রাম ভারত-সাধনারই অঙ্গ। সর্ববিধ সামাজিক প্রত্যবায় দূর হোক, মানবিকতা প্রকৃত প্রস্তাবে জীবনের অঙ্গীভূত হোক, নির্দয় হস্তে নিজেদের সকল পাপ থেকে মুক্তির প্রচেষ্টা চলুক—তবেই ভারত-চিন্তা সার্থক হবে, তবেই বাস্তবে বলা চলবে, 'সর্বঃ সর্বত্র নন্দতু'।

সর্বঃ সর্বত্র নন্দতু

শঙ্করাচার্যের নামে প্রচলিত সব কিছু প্রকৃতই তাঁর নিজের রচনা কি না তা বলা শক্ত। যাই হোক্, তাঁর লেখা বলে সুপরিচিত একটি উক্তিতে আছে, কোটি গ্রন্থে যা বলা হয়েছে আধখানা শ্লোকে তাকে এভাবে বলা যায় যে, ব্রহ্ম সত্য এবং জগৎ মিথ্যা, জীব ও ব্রহ্মে কোন তফাৎ নেই।

ভারতবর্ষের ঐতিহ্যে নিরাসক্তির যে একটা স্থান আছে তা নিঃসন্দেহ। 'ঘরে-বাইরে'-তে যে সন্দীপের "মাংসবহুল আসক্তির" কথা শুনি, তাকেও রবীন্দ্রনাথ বলিয়েছেন যে আমাদের গর্ভধারিণী এই মহাদেশ নিরাসক্তির যে মোহে আমাদের টেনে রেখেছে তা থেকে নিষ্কৃতি বুঝি সম্ভব নয়। স্বদেশজ এই নির্লিপ্তি রবীন্দ্রনাথকেও কম আকর্ষণ করে নি। দ্বেষ-রাগ, লোভ-মোহ, মদ-মাৎসর্য, ধর্ম-অর্থ, কাম-মোক্ষকে পর্যন্ত অতিক্রম করে চিদানন্দ রূপ পরিগ্রহের যে কথা নির্বাণ ষটকে আছে, তা সংসারের মায়া-প্রপঞ্চে বন্দী মনকেও এদেশে কিয়ৎ পরিমাণে টানার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু এটাও সত্য যে 'ব্রহ্ম সত্য ও জগৎ মিথ্যা' এই উক্তিকে ভারতবর্ষের প্রাচীন চিন্তার সারকথা বললে মস্ত ভুল ঘটে, আমাদের সাংস্কৃতিক পরম্পরার একটা বিরাট অংশকে অস্বীকার করা হয়। রবীন্দ্রনাথ একবার মুগ্ধ মনে ঋগ্বেদের এক আশ্চর্য বচন উদ্ধৃত করেছিলেন: "প্রাণের নেতা, আমাকে আবার চক্ষু দিও, আবার দিও প্রাণ, আবার দিও ভোগ, উপরন্তু সূর্যকে আমি সর্বদা দেখব, আমাকে স্বস্তি দিও।"

ভারতবর্ষ কিছু একটা সৃষ্টিছাড়া আজব দেশ নয়—সাধারণ মানুষের মনের কামনা ভারতবর্ষে অন্য সব দেশ থেকে ভিন্ন, তা হতে পারে না। দুঃখের বন্ধনকে আমরা যুগ যুগ ধরে মেনে নিয়েছি, অভ্যর্থনা করেছি, এ কি সম্ভব? আমাদের দেশের মহাপুরুষরা এ জীবন সম্বন্ধে ভাবেন নি, শুধু পরমার্থের কথা ভেবেছেন, তা শোনা

যায় বটে—কিন্তু তা সত্য হতে পারে না। হলে এতকাল ধরে পৃথিবীর বুকে বহু ক্লেশ ও বিড়ম্বনা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের দেদীপ্যমান্ মূর্তি দেখা যেত না।

মহেঞ্জোদড়ো, হরপ্পা প্রভৃতি স্থানে এদেশের সবচেয়ে প্রাচীন যে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে, তার মধ্যে তদানীন্তন জীবনের বস্তুনিষ্ঠা অত্যন্ত স্পষ্ট। বৈদিক যুগে যাগযজ্ঞ, হোম ইত্যাদির উদ্দেশ্য পারলৌকিক সদ্‌গতির চেয়ে ইহজীবনে সাফল্যই ছিল ঢের বেশি। শতায়ু হব, "পশ্যেম শরদম্ শতম্।" একশো শরৎঋতু দেখব, এ ছিল সকলের কামনা। সকল ইন্দ্রিয় দিয়ে জীবন উপভোগ বিষয়ে কোন সংকোচ ছিল না। দর্শনের বিকাশ যখন ঘটল, তখন প্রচণ্ড প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাস্তববাদী লোকায়ত দর্শন কিছুতেই নিষ্পিষ্ট হল না। সাংখ্যকার বলতে কুণ্ঠিত হলেন না যে, প্রমাণের অভাবে ঈশ্বর হলেন অসিদ্ধ; জৈন ও বৌদ্ধ চিন্তাতেও ঈশ্বর স্থান পেলেন না। কোন এক কল্পনাসৃষ্ট জগৎকর্তার নাম উচ্চারণ না করেই গৌতম বুদ্ধ তাঁর নবধর্ম প্রচার করলেন। যে দেশের নগরসভ্যতা চৌষট্টি কলার ছটায় সমৃদ্ধ ছিল, যে দেশের মহাকাব্যে জীবনের সর্ববিধ ব্যঞ্জনাই ব্যক্ত হয়েছে, যে দেশের অর্থশাস্ত্র কৌটিল্যের সর্বতোব্যাপ্ত দৃষ্টির ফলশ্রুতি, যে দেশের শিল্পকৃতি বহুবিধ মানসিক বাধাকে অগ্রাহ্য করে "মৌনের স্তম্ভিত আবেগ, নিষ্ঠার কঠোর শান্তি, বৈরাগ্যের উদার গাম্ভীর্য" এবং সঙ্গে সঙ্গে অষ্টপ্রাহরিক জীবনেরও সুগভীর রূপায়ণ করেছে, সে দেশ কখনও জগৎকে, জীবনকে, বাস্তবকে তুচ্ছ করে নি। শুধু যখন আমাদের ইতিহাসে নিদারুণ দুর্দিন এসে বাসা বেঁধেছে, তখনই আমাদের চিন্তায় তার ছায়া পড়েছে—বাস্তব যখন নির্মম, তখন তার দিকে চোখ বুজে অবাস্তবের ধ্যানে সান্ত্বনার অন্বেষণ আরম্ভ হয়েছে। এ শুধু আমাদের দেশের বৈশিষ্ট্য নয়। তুলনীয় পরিস্থিতিতে সব দেশেই অল্পাধিক পরিমাণে এ ঘটনা দেখা গিয়েছে।

সমাজের আদিম স্তরে সকলকেই সমান পরিশ্রম করতে হত। নতুবা, জীবনধারণ সম্ভব ছিল না। ক্রমশ মানুষের উৎপাদন

শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন উদ্‌বৃত্ত ভোগ করার অধিকার কিছু ব্যক্তি সমাজপতি হয়ে নিতে লাগল, দেখা দিল শ্রেণী-কর্তৃত্বের গ্লানি। কিন্তু সে গ্লানিকে কখনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন যাঁরা তাঁরা প্রসন্ন মনে মেনে নিতে পারে নি। বৈদিক ঋষি চেয়েছিলেন: "সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম"। কল্পনা করেছিলেন মধুময় পরিবেশ: "মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ"। উপনিষদের ঋষি ভেবেছেন সমসমাজের কথা—"ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"—বলেছেন লোভ বর্জন করো। "মা গৃধঃ"। দুন্দুভিনিনাদের মতো শুনিয়েছেন মানবজীবনের মর্মবাণী: "দাম্যত, দত্ত, দয়ধ্বম্"—নিজেকে সংযত করা, যথাশক্তি আত্মদান করা, মানব করুণায় সত্তাকে সিঞ্চিত করার কথা বলেছিলেন।

মহাভারতের উদ্যোগপর্বে ঋষি শম্বর বলছেন—

পতিপুত্রবধাদেতৎ পরমম্ দুঃখমব্রবীৎ।
দারিদ্র্যমিতি যৎ প্রোক্তং পর্যায়মরণং হি তৎ॥

"বিবাহিত স্ত্রীলোকের পক্ষে পতি বা পুত্রের মৃত্যুর চেয়ে দারিদ্র্য আরও মর্মান্তিক, কারণ দারিদ্র্য নিয়ে আসে পর্যায় মরণ (তিলে তিলে পুড়িয়ে মারে)।" চিরজীবী বলে বর্ণিত বক ঋষিকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন যে, অতি দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর ধারণা হয়েছে যে সবচেয়ে বড়ো দুঃখ হল গর্বিত ধনীর হাতে দরিদ্রের লাঞ্ছনা। ধ্রুব উপাখ্যানে কথিত আছে যে বালক ধ্রুব যখন কঠোর তপস্যায় রত, তখন দেবরাজের মর্যাদা হারাবার আশংকায় ইন্দ্র গিয়ে ব্রহ্মার কাছে ধরণা দিয়ে ধ্রুবকে তপস্যা থেকে নিরস্ত করতে বলেন। ব্রহ্মা যখন তদুদ্দেশ্যে ধ্রুবকে বর দিতে চান, তখন কিশোরকণ্ঠ থেকে অবিস্মরণীয় উত্তর আসে—স্বস্ত্যস্তু বিশ্বস্য বরং ন যাচে", 'বিশ্বের স্বস্তি হোক্, আমি বর যাচ্ঞা করি না।' কার্ল মার্কস্-এর 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে এক বহুবিশ্রুত বাক্য আছে: "পৃথিবীতে টাকা যখন জন্ম নেয়, তখন যদি তার গালে রক্তের এক গভীর দাগ থাকে তো বলা চলে যে পুঁজির জন্ম সময়ে তার মাথা থেকে

পা পর্যন্ত প্রতি অঙ্গে প্রতি লোমকূপ থেকে রক্ত আর ক্লেদ ঝরতে থাকে।" এরই সঙ্গে তুলনীয় মহাভারতের কথা :

ন ছিত্বা পরমর্মাণি, ন কৃত্বা কর্ম দুষ্করং।
ন হত্বা মৎস্যঘাতীয়ং প্রাপ্নোতি মহতীং শ্রিয়ং॥

"অপরের মর্ম ছেদন না করলে, অন্যায় কর্ম না করলে, ধীবর যেমন মাছ ধরে তেমনই মানুষ না মারলে বিপুল অর্থসম্পদ সম্ভব নয়"।

বাল্মীকি রামায়ণে বলা হয়েছে, মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কিছু নেই ("ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ")। আর রামচন্দ্রের মুখ থেকে শোনানো হয়েছে, জীবন দিয়েছে কর্মভূমি, শুভকর্মই সকলের কর্তব্য ("কর্মভূমিম্ ইমাম্ প্রাপ্য কর্তব্যং কর্ম যৎ শুভং")।

গৌতম বুদ্ধ গৃহত্যাগ করেছিলেন জীবের দুঃখ দূর করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে। রাজপ্রাসাদের নিখুঁত তত্ত্বাবধান সত্ত্বেও জীবনের যন্ত্রণাকে তাঁর দৃষ্টি বহির্ভূত রাখা সম্ভব হয় নি। মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণনা আছে, শিবিরাজা সামান্য পাপক্ষালনের জন্য কিছুক্ষণের জন্য যখন নরকে যান তখন পুণ্যবানের দেহনির্গত সৌরভে আকৃষ্ট হয়ে পাপীরা সবাই তাঁর সান্নিধ্য চাইতে থাকে এবং নরকত্যাগের সময় উপস্থিত হলে শিবি অস্বীকৃত হয়ে বলেন :

ন ত্বহং কাময়ে রাজ্যং ন স্বর্গং ন পুনর্ভবম্।
কাময়ে দুঃখতপ্তনাং প্রাণিনামার্তিনাশনম্॥

"আমি রাজ্য চাই না, স্বর্গ চাই না, পুনর্জন্ম চাই না—চাই শুধু এই যে দুঃখতপ্ত প্রাণিদের যন্ত্রণার অবসান ঘটুক"। এই শ্লোক মহাত্মা গান্ধীর সবরমতী আশ্রমে প্রতিদিন প্রত্যূষে সকল আশ্রমিক কর্তৃক উচ্চারিত হত। "সর্বে জনাঃ সুখিনো ভবন্তু"—ভারত-মানসের এই মর্মকথা যুগে যুগে শোনা গিয়েছে।

সাধারণ মানুষের জীবনে যে অজস্র বিড়ম্বনা তাকে দূর করার চেষ্টার বদলে স্বীকার করে নিয়ে এবং মৃত্যুর পর স্বর্গরাজ্যে কিম্বা পরজন্মে সেই দুঃখ, লজ্জা, অপমানের ক্ষতিপূরণ হিসাবে শান্তি ও সুখের আশ্বাস দিয়ে ধর্মধ্বজীরা সর্বদেশে মানুষকে সান্ত্বনা দিয়ে এসেছে। পরমকারুণিক পরমেশ্বরের বিধান সত্ত্বেও অন্যায় ও

অনাচার অবলীলাক্রমে ঘটার গূঢ়ার্থ হিসাবে বুঝিয়েছে যে মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতার লীলা হল রহস্যময়, তার গহন তাৎপর্য তো সবাই বুঝবার আশা করতে পারি না! তাই দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখি যে কোম্পানীর আমলে দুঃখী বাঙালীর মনের কথা বলেছিলেন রামপ্রসাদ সেন, তাঁর উপাস্য দেবীকে উদ্দেশ করে।

তিনি সান্ত্বনা পেয়েছিলেন এবং অপরকে দিয়েছিলেন কালী-ভক্তির রসে ডুবে সব কিছু দুঃখকষ্টের কথা ভুলে। বোঝা কঠিন নয়, কেন মার্কস্ বলেছিলেন যে ধর্মের মধ্যে মিলিয়ে রয়েছে দলিত মানুষের দীর্ঘশ্বাস, বলেছিলেন যে ধর্মের আফিম গিলিয়ে মানুষকে ঝিমিয়ে রাখা হয়েছে যুগ যুগ ধরে।

বেদের যুগ থেকে আজকের পূজা-অর্চনা পর্যন্ত "ধনং দেহি", "ধনং দেহি" অবিরত উচ্চারিত হয়ে এসেছে। নির্ধনের জীবনে অশেষ লাঞ্ছনা বলেই এ প্রার্থনা! কল্পক্রমাবদানে বর্ণিত কাহিনী রবীন্দ্রনাথের প্রসাদে অনেকেই জানি: শ্রাবস্তীপুরে দুর্ভিক্ষের হাহাকার যখন জেগেছিল, তখন বুদ্ধ ভক্তদলকে ডাকলেন, আর রত্নাকর শেঠ, সামন্ত জয়সেন, ধর্মপাল প্রভৃতি রাজকরভারে ক্লিষ্ট বলে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করায় অনাথপিণ্ডদের কন্যা ভিক্ষুণী সুপ্রিয়া ভিক্ষা-অন্নে "দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা" মেটাবার ভার নিয়েছিলেন। যে দেশের সম্পদের খ্যাতি বিশ্বব্যাপ্ত হয়ে ক্রমান্বয়ে আক্রমণকারীকে আকৃষ্ট করেছে, সেই ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষের ইতিবৃত্ত আমাদের অযুত-বর্ষব্যাপী যন্ত্রণার সাক্ষ্য দিচ্ছে। "ঐ যে দাঁড়ায়ে নতশির মূক সবে—ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর বেদনার করুণ কাহিনী", তাদের বিষয় রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছিলেন:

নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে
দেবতারে স্মরি'
মানবেরে নাহি দেয় দোষ,
নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনমতে
কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ রেখে দেয় বাঁচাইয়া।

বাংলাদেশের স্বর্ণযুগের কথা শুনি, কিন্তু তখনই ফুল্লরার 'বারোমাস্যা' থেকে পাই দরিদ্র জীবনের সংবাদ—সংবৎসর "অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তা"-তে। তাই আঠারো শতকের বাংলায় স্বদেশী-বিদেশী শোষণের মারাত্মক ত্র্যহস্পর্শ যে বিকট অবস্থা সৃষ্টি করে, তার বর্ণনা পাই রামপ্রসাদ সেনের রচনায়:

কারে দিলে ধন-জন মা, হস্তী অশ্ব রথচয়,
ওগো তারা কি তোর বাপের ঠাকুর
আমি কি তোর কেউ নয়?
কেউ থাকে অট্টালিকায়
মনে করি তেম্‌নি হই,
মাগো আমি কি তোর পাকা ক্ষেতে
দিয়েছিলাম মই?

সরল কবি কিন্তু তার পরের পদেই সান্ত্বনার সন্ধান পেয়েছেন:

দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে,
আমার কপাল বুঝি অম্‌নি অই।
ওমা আমার দশা দেখে বুঝি
শ্যামা হ'লে পাষাণময়ী॥

তবু মানুষ যুগে যুগে অনাচার মানতে অস্বীকৃত হয়েছে। যুগে যুগে শোনা গেছে বিভিন্ন সুরে, বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্ন ভঙ্গিতে, রবীন্দ্রনাথেরই কথা:

যার ভয়ে তুমি ভীত,
সে-অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি দাঁড়াবে তুমি,
তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।

প্রাচীন ভারতের ঋষিকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" —ওঠো, জাগো। উপনিষদে বলা হয়েছে—এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো, গতিবেগকে স্তিমিত কোরো না, পথিক, এগিয়ে চলো। দুঃখের শৃঙ্খল ভাঙতে বেরিয়েছিলেন সিদ্ধার্থ। আর বহু তপশ্চর্যার পর বললেন, পথ আছে মাত্র এক, যদি মুক্তি পেতে হয়, নির্বাণের মধ্যে

সকল গ্লানির অবসান যদি ঘটাতে হয় তো অষ্টমার্গ অনুসরণ করতে হবে, পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহারে সত্যসন্ধ হতে হবে, অন্যায়কে বর্জন করতে হবে, লোভ-জটিল সংসার বন্ধনকে পরিহার করতে হবে। কত মহাজন এলেন-গেলেন। জগতের সর্বদেশে তাঁদের কণ্ঠ উত্তোলিত হল। কিন্তু যে দারিদ্র্যকে মহাভারতকার "পর্যায় মরণ" বলে ধিক্কৃত করেছিলেন, তা অপনীত আজও হল না। "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই"—এই মহিমামণ্ডিত ঘোষণা যে দেশে হয়েছিল, সে দেশে আজও জনজীবনে যন্ত্রণার অবধি নেই। সেজন্যই তো আজ সর্বদেশে এবং ভারতবর্ষেও নানা সুরে নানা ঢঙে আকাশ জুড়ে বাজছে যাকে মহাত্মা কবীর বলেছিলেন "গগন দামামা"। কবীর চেয়েছিলেন সংগ্রাম যা হবে বিনা খড়্গের, যা চলবে অষ্টপ্রহর সাধনার যুদ্ধরূপে। "ধরণী আকাশ চলেছে থরহরি, সকল শূন্য ভরে চলছে গর্জন"—একথা তিনি পাঁচশো বৎসর পূর্বে বলেছিলেন। আজ গর্জনের রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ হল ভিন্ন। বিক্ষুব্ধ মানুষের মিছিল চলেছে নানাপথ বেয়ে—কোথায় এর শান্তি, তা নির্ভর করছে শুভবুদ্ধি ও সংঘশক্তির সমাবেশের উপর। সকল কল্যাণকামীর প্রয়াস যেন সন্নিবিষ্ট হতে পারে, যেন আমরা অধিকারী হই রবীন্দ্রনাথের মতো বলতে (১৯৩০): "আমার চিত্ত আমার দেশের সত্তার সঙ্গে প্রবল বেদনায় সম্মিলিত হয়েছে"। আমাদের মনে যেন সদা জাগরূক থাকে ভারতবর্ষের শাশ্বত প্রার্থনা:

সর্বস্তরতু দুর্গাণি সর্বো ভদ্রানি পশ্যতু।
সর্বস্তদ্বুদ্ধিমাপ্নোতু সর্বঃ সর্বত্র নন্দতু ॥

ধনিকের আবির্ভাব

কার্ল মার্কস্

['ক্যাপিটাল'-এর প্রথম খণ্ড ৩৩শ পরিচ্ছেদটি প্রথম কয়েক লাইন বাদ দিয়ে অনুবাদ করে দেওয়া গেল। প্রথম খণ্ডের শেষ কয়েক পরিচ্ছেদে অর্থবানদের মূলধন কি ভাবে বেড়ে এসেছে, তার এক বিশদ বিবরণ মার্কস্ দিয়েছেন। নির্মম ঘটনাসন্নিবেশের যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা খুবই কম মেলে। বিদেশ লুণ্ঠন করে আর দাসব্যবসায় চালিয়ে ইয়োরোপের ধনিকরা কি ভাবে পুঁজি বাড়িয়েছে, তার পরিচয় এই পরিচ্ছেদে বিশেষ করে পাওয়া যায়। পিউরিটানদের মত যাঁরা ধনসম্পদকে ভক্তের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ মনে করে থাকেন, তাঁদের পক্ষে এ পরিচ্ছেদ পড়াই শক্ত হতে পারে। কিন্তু ধনিকতন্ত্রের যথার্থ পরিচয় পেতে হলে মার্কসের এই বর্ণনা অপরিহার্য।]

মধ্যযুগ থেকে আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি দুই আলাদা ধরনের মূলধন—সুদখোরের আর সওদাগরের মূলধন। বিভিন্ন সামাজিক ও আর্থনীতিক আবেষ্টনে এদের পুষ্টি হয়ে থাকে বটে, কিন্তু শিল্পোৎপাদনে ধনিক-ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্বে এদেরই মূলধন বলে ধরে নেওয়া চলে।

"বর্তমানে সমাজের সমস্ত সম্পদই প্রথমে মূলধনীর কবলে যাচ্ছে। ...জমিদারের খাজনা, মজুরের মজুরী আর ট্যাক্স-দারোগার দাবী মিটিয়ে বছরের যা ফসল তার অধিকাংশই সে নিজের জন্য রাখে। কোন আইন তাকে এই সম্পত্তির অধিকার না দিলেও সে হচ্ছে সমাজের ঐশ্বর্যের প্রধান মালিক।...এই পরিবর্তন ঘটেছে পুঁজির

উপর সুদ আদায় করার ব্যবস্থার ফলে।...আশ্চর্যের বিষয় এই যে ইয়োরোপের সকল স্মৃতিশাস্ত্রকারই আইন করে সুদ বন্ধ করে এ ব্যবস্থাকে আটকাবার চেষ্টা করেছেন।...দেশের সমস্ত সম্পদের উপর মূলধনীর ক্ষমতার অর্থ হচ্ছে সম্পত্তি বিধানের সম্পূর্ণ পরিবর্তন, কিন্তু কোন আইনে বা কোন আইনপরম্পরায় এ পরিবর্তন বহাল হয়েছে?"[১] লেখকের অবশ্য স্মরণ রাখা উচিত ছিল যে আইন করে কখনও বিপ্লব আনা যায় না।

সুদ আর সওদাগরীর ফলে যে মূলধন জমছিল, তা গ্রামে জায়গীরদারী ব্যবস্থা আর সহরে বণিকসঙ্ঘের নিয়মকানুনের চাপে শিল্পোৎপাদনে ব্যবহৃত হতে পারে নি।[২] জায়গীরদারী ব্যবস্থার যখন পতন হল, দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে অনেকেরই যখন বাসোচ্ছেদ হল, জমি বেদখল হল, তখন শিল্পোৎপাদনের পথে যে বাধা ছিল, তাও দূর হল। নতুন কারখানা খোলা হতে লাগল, হয় বন্দরে নয় দেশের মধ্যে এমন জায়গায় যেখানে পুরোনো মিউনিসিপ্যালিটী আর বাণিকসঙ্ঘের প্রভুত্ব খাটতো না। তাই ইংলণ্ডে পুরোনো শহরের সঙ্গে নতুন শিল্পপ্রধান জায়গাগুলির বহুদিন ধরে বিষম ঝগড়া চলেছিল।

আমেরিকায় সোনা রূপার আবিষ্কার, আদিম অধিবাসীদের উচ্ছেদ, বশীকরণ আর খনিগর্ভে জীবন্ত সমাধি, ভারত বিজয় ও লুণ্ঠনের আরম্ভ, ব্যবসার জন্য কৃষ্ণকায়দের শিকার উদ্দেশ্যে আফ্রিকাকে এক রকম ইজারা নেওয়া—এ সবই ছিল ধনিক শিল্পোৎপাদন যুগের গোলাপী উষার পূর্বাভাষ। এই সব মনোরম ব্যাপার ছিল প্রাথমিক ধনসঞ্চয়ের প্রধান প্ররোচক। এর পরই সমস্ত পৃথিবীকে রঙ্গভূমি করে নানা ইয়োরোপীয় জাতির মধ্যে বাণিজ্যযুদ্ধ লেগে যায়। যুদ্ধ আরম্ভ হয় স্পেনের বিরুদ্ধে ওলন্দাজদের বিদ্রোহে; তারই বিরাট বিস্তার দেখা

১ * "দি ন্যাচ্‌রল অ্যাণ্ড্‌ আর্টিফিশ্যল্‌ রাইট্‌স্‌ অফ প্রপার্টি কণ্টাষ্টেড্‌" (লণ্ডন, ১৮৩২), পৃঃ ৯৮-৯৯; "দেন্‌ হজ্‌স্‌কিনের" অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার।

২ * এমন কি, ১৭৯৪ সালেও লীড্‌সের কাপড়ওয়ালারা পার্লামেণ্টে দরখাস্ত করেছিল, যাতে সওদাগররা কারখানা বসাতে না পারে।

যায় ফরাসী বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের সংগ্রামে; আজও জোর করে চীনকে আফিম আমদানী করানোর জন্য যে যুদ্ধ চলছে, তাতে তার চিহ্ন রয়েছে।

স্পেন, পর্তুগাল, হলাণ্ড, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে প্রাথমিক ধনসঞ্চয়ের বিভিন্ন প্রেরণার চিহ্ন মোটের উপর কালানুক্রমিকভাবে লক্ষ্য করা যায়। ইংলণ্ডে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে তার একটা সুব্যবস্থিত রূপ দেখা যায়; সে রূপের উপাদান হচ্ছে উপনিবেশ, সরকারী দেনা, আধুনিক রাজস্বব্যবস্থা, শিল্পসংরক্ষণনীতি। এই সব ব্যাপার—যেমন ধরা যাক, উপনিবেশব্যবস্থা—আংশিকভাবে নির্ভর করে পশুবলের উপর। কিন্তু সর্বদাই রাষ্ট্রশক্তিকে বা সমাজের কেন্দ্রীভূত ও সুবিন্যস্ত শক্তিকে হাপরের মত ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে, যথাসম্ভব অল্প সময়ে শিল্পোৎপাদনের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ধনিক ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়। প্রাচীন সমাজ যখন নতুন সমাজকে জন্ম দেয়, তখন শক্তি হয় ধাত্রী। এ শক্তিই আর্থনীতিক।

খ্রীষ্টানদের উপনিবেশব্যবস্থা সম্বন্ধে খ্রীষ্টধর্মবিশারদ উইলিয়ম হাউইট্ বলেন: "পৃথিবীর সর্বত্র, পরাজিত জাতিদের উপর তথাকথিত খ্রীষ্টানরা যে নৃশংস ও প্রচণ্ড অত্যাচার করেছে, কোন যুগে, কোন হিংস্র, অশিক্ষিত, নির্মম, নির্লজ্জ জাতিও তা করে নি।"[৩] সপ্তদশ শতকে হলাণ্ড ছিল সম্পন্ন জনপদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আর হলাণ্ডের ঔপনিবেশিক শাসনের ইতিহাস হচ্ছে "প্রতারণা, ঘুষ, নরহত্যা আর নীচতার এক অদ্ভুত বিবরণ।"[৪] জাভায় ক্রীতদাস সরবরাহ করার জন্য মানুষ চুরি করা ছিল তাদের এক প্রধান বিশেষত্ব। এই উদ্দেশ্যে মানুষ-চোরদের ভাল করে শিক্ষা দেওয়া হত। এ ব্যবসায় মাতব্বর

৩ *"কলোনাইজেশন অ্যাণ্ড ক্রিশ্চ্যানিটি", লণ্ডন, ১৮৩৮, পৃঃ ৯। ক্রীতদাসের প্রতি ব্যবহার সম্পর্কে শার্ল কঁৎ, "ত্রেতে দ্য লা লেজিস্লাসিয়ঁ," তৃতীয় সংস্করণ, ব্রুসেল, ১৮৩৭, প্রণিধানযোগ্য।

৪ *টমাস ষ্ট্যামফর্ড র‍্যাফ্‌ল্‌স্ (জাভার পূর্বতন ছোটলাট), হিষ্ট্রি অফ্ জাভা অ্যাণ্ড ইটস ডিপেণ্ডেন্সিজ্।" লণ্ডন, ১৮১৭

ছিল চোর, দো-ভাষী আর বিক্রেতা; সেখানকার উপরাজারা ছিল প্রধান বিক্রেতা। দাসবাহী জাহাজ তৈরী হওয়া পর্যন্ত সেলীবস্ দ্বীপের গুপ্ত কারাগৃহে চুরি-করে-আনা যুবকদের আটকে রাখা হত। এক সরকারী বিবরণে দেখা যায়: "এই ম্যাকাসার সহরে অনেক গোপন কারাগার আছে, প্রত্যেকটি অতি ভয়ঙ্কর; বহু হতভাগ্যকে সেখানে পোরা হয়েছে, লোভ আর অত্যাচার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য তারা হয়েছে বলি, জোর করে তাদের বাড়ী থেকে কেড়ে এনে শিকল বেঁধে রাখা হয়েছে।" মালাক্কা অধিকার করার জন্য ওলন্দাজরা সেখানকার পর্তুগীজ শাসনকর্তাকে ঘুষের আশা দিয়ে বশ করেছিল; সে তাদের সহর ছেড়ে দেওয়া মাত্র তারা তাকে বাড়ী চড়াও হয়ে খুন করে, উদ্দেশ্য ছিল তার কৃতঘ্নতার মূল্য ২১,৮৭৫ পাউণ্ড না দেওয়া। তারা যেখানেই পদার্পণ করেছে, সেখানে দেশ উজাড় হয়েছে, জনশূন্য হয়েছে। ১৭৫০ সালে জাভার এক প্রদেশে বাঞ্জুওয়াঙ্গির লোকসংখ্যা ছিল ৮০,০০০-এর বেশী; ১৮১১ সালে মাত্র ১৮,০০০-এ দাঁড়িয়েছিল। মধুর বাণিজ্য!

সকলেই জানে যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষের শাসনক্ষমতা ছাড়া চায়ের কারবার, চীনের সঙ্গে ব্যবসা আর ইয়োরোপ থেকে মাল আমদানী রপ্তানীর একচেটে অধিকার যোগাড় করেছিল। কিন্তু দেশের মধ্যে আর ভারতবর্ষের বন্দর ও কাছাকাছি দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে ব্যবসার একচেটে অধিকার ছিল কোম্পানীর বড় বড় কর্মচারীদের। লবণ, আফিম, সুপারি ও অন্যান্য পণ্যের একচেটে কারবার ছিল এক-রকম সোনার খনি। কর্মচারীরা নিজেরাই দাম স্থির করত আর ইচ্ছামত দুর্ভাগ্য ভারতীয়দের সম্পত্তি লুণ্ঠন করত। স্বয়ং বড়লাট এই গোপন ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকতেন। তাঁর প্রিয়পাত্রেরা এমন সব কণ্ট্রাক্ট যোগাড় করত, যার দৌলতে তারা যেন ভোজবাজিতে ধূলোকে সোনা করতে পারত। ব্যাঙের ছাতার মত রাতারাতি বড় বড় সম্পত্তি গজিয়ে উঠত; একটা শিলিং পর্যন্ত না খাটিয়ে পুঁজি বেড়ে যেত। ওয়ারেন হেষ্টিংসের বিচারকালে এরকম ঝুড়ি ঝুড়ি ঘটনার খোঁজ পাওয়া গেছল। একটা নমুনা দেওয়া যাক। সালিভান নামে

কে একজন আফিমের কন্ট্রাক্ট পেয়েছিল ; পাবার পর সে দেশের এমন এক জায়গায় বদলি হয় যেখান থেকে আফিম যে সব জেলায় উৎপন্ন হত, তা বহুদূর। তাই বুদ্ধিমান সালিভান বিন্-নামা এক ইংরজকে ৪০,০০০ পাউণ্ডে নিজের স্বত্ব বেচে দেয় ; সেই দিনই বিন্ ৬০,০০০ পাউণ্ডে আর একজনকে তা বেচে, আর শেষ পর্যন্ত হাত বদলে যে ক্রেতা কন্ট্রাক্ট সরবরাহ করেছিল, সেও প্রচুর লাভ করেছিল। পার্লামেন্টে যে-সব তালিকা পেশ করা হয়েছিল, তার একটা থেকে জানা যায় যে ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৬ সালের মধ্যে কোম্পানী আর কোম্পানীর কর্মচারীরা ভারতীয়দের কাছ থেকে উপহার হিসাবে ৬০ লক্ষ পাউণ্ড পেয়েছিল। ১৭৬৯ আর ১৭৭০ সালে ইংরেজেরা সমস্ত চাল কিনে রেখে অসম্ভব দামে বেচতে চেয়ে এক দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করেছিল।[৫]

আদিম অধিবাসীদের উপর দারুণ অত্যাচার হয়েছিল প্রধানত ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের মত উপনিবেশে, যেখানে রপ্তানীর জন্য আবাদের ব্যবস্থা হচ্ছিল, আর মেক্সিকো ও ভারতবর্ষের মত সমৃদ্ধ ও জনাকীর্ণ দেশে, যেখানে মহোল্লাসে লুণ্ঠন সুরু হয়ে গেছল। কিন্তু 'আসল' উপনিবেশগুলিতেও প্রাথমিক ধনসঞ্চয়ের খ্রীষ্টীয় প্রকৃতি সুস্পষ্ট দেখা যায়। ১৭০৩ সালে ইংলণ্ডের পিউরিটানরা, যাঁরা ছিলেন প্রটেষ্টাণ্ট-বাদের মিতাচারী ধর্মধুরন্ধর—আইন করেছিলেন যে কোন রেড ইণ্ডিয়ানের মাথার চামড়া আনলে বা তাকে পাকড়াও করে আনতে পারলে ৪০ পাউণ্ড পুরস্কার দেওয়া হবে ; ১৭২০ সালে পুরস্কারের বহর বাড়িয়ে ১০০ পাউণ্ড করা হয় ; ১৭৪৪-এ "মাসাশুসেট্‌স্-বে" থেকে এক জাতিকে বিদ্রোহী ঘোষণা করার পর দরের হার এই রকম স্থির হয় : বারো বছর বা তার বেশী বয়সের রেড ইণ্ডিয়ানের মাথার চামড়ার জন্য ২০০ পাউণ্ড, পুরুষ বন্দীর জন্য ১০৫ পাউণ্ড, স্ত্রীলোক ও শিশু

৫ *১৮৬৬ সালে শুধু উড়িষ্যাতেই দশ লক্ষের অধিক লোক ক্ষুধার জ্বালায় মরতে বাধ্য হয়। তবুও চড়া দামে খাদ্যদ্রব্য বেচে সরকারী ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার চেষ্টা হয়েছিল।

বন্দীর জন্ম ৫০ পাউণ্ড, স্ত্রীলোক বা শিশুর মাথার চামড়ার জন্ম ৫০ পাউণ্ড। কিছুকাল পরে যখন ধর্মাত্মা 'পিল্‌গ্রিম্‌ ফাদার্সের' বংশধররা রাজদ্রোহী হয়ে উঠেছিল, তখন উপনিবেশব্যবস্থা তাদেরই উপর প্রতিহিংসা নেয়। ইংরেজের টাকা ও প্ররোচনায় রেড ইণ্ডিয়ানরা তখন তাদের অনেককে কুঠার দিয়ে হত্যা করেছিল। ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ঘোষণা করেছিল যে ডালকুত্তা লাগানো আর মাথায় চামড়া উঠিয়ে নেওয়া হচ্ছে বিদ্রোহ দমনের "ঈশ্বরনির্দিষ্ট ও স্বাভাবিক উপায়"।

উষ্ণগৃহের মত উপনিবেশ ব্যবস্থার আশ্রয়ে ব্যবসা ও জাহাজী বাণিজ্য বাড়তে লাগল। বিকাশোন্মুখ শিল্পের পক্ষে প্রয়োজন ছিল বাজার; উপনিবেশ ব্যবস্থার ফলে সে বাজার মিলল, আর একচেটে বাজার জোটার পর ব্যবসায়ীর পুঁজি বেড়ে চলল। সোজাসুজি লুঠতরাজ আর খুন খারাপী আর মানুষকে ক্রীতদাস করে ইয়োরোপের বাইরে যে ধনরত্ন অপহরণ করা হল, তা দেশে ফিরে মূলধনে পরিণত হল। উপনিবেশ ব্যাপারে হলাণ্ড দেশই প্রথম অগ্রসর হয়; ১৬৪৮-এ হলাণ্ডের বাণিজ্য সম্পদের পরাকাষ্ঠা হয়েছিল।

"ভারতবর্ষের বাণিজ্য আর ইয়োরোপের দক্ষিণপূর্ব কোণ থেকে উত্তরপশ্চিম পর্যন্ত ব্যবসার একচেটে অধিকার ওলন্দাজদের ছিল। মৎস্য-ব্যবসায়ে, জাহাজী-বাণিজ্যে, শিল্পোৎপাদনে হলাণ্ড ছিল সব দেশের সেরা। ওলন্দাজ প্রজাতন্ত্রের মোট মূলধন বোধ হয় অবশিষ্ট ইয়োরোপের মূলধনের চেয়ে বেশী ছিল।" একথা যিনি বলেছেন, সেই গ্যুলিখ সাহেব কিন্তু বলেন নি যে ১৬৪৮-এ ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় হলাণ্ডের সাধারণ লোক বেশী খাটতে বাধ্য হত, বেশী গরীব অবস্থায় থাকত, আর বেশী অত্যাচার সহ্য করত।

আজকাল শিল্পপ্রাধান্যের অর্থই হচ্ছে ব্যবসায় প্রাধান্য। কিন্তু শিল্পনির্মাণের যুগে ব্যবসায় প্রাধান্যের ফলেই শিল্পপ্রাধান্য পাওয়া যেত। এই কারণেই সেই সময় উপনিবেশব্যবস্থার অতিরিক্ত গুরুত্ব

ছিল। ঐ ব্যবস্থাই এক "বিচিত্র দেবতা" সেজে ইয়োরোপের প্রাচীন দেবতাদের সঙ্গে বেদীর উপর গালে গাল দিয়ে বসেছিল, আর এক শুভদিনে তাদের সকলকে ধাক্কা আর লাথি মেরে ফেলে দিয়েছিল। নতুন দেবতা তখন ঘোষণা করল যে মানুষের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে মোটা মুনাফা যোগাড় করা।

সর্বসাধারণের ধার বা সরকারী দেনার ('National Debt') বন্দোবস্ত মধ্যযুগে প্রথম জেনোয়া ও ভিনিসে আরম্ভ হয়, শিল্পনির্মাণের যুগে সমস্ত ইয়োরোপে ছড়িয়ে পড়ে। নৌবাণিজ্য আর বাণিজ্যযুদ্ধ নিয়ে উপনিবেশব্যবস্থা তাকে তাড়াতাড়ি বাড়াতে থাকে। তাই হলাণ্ডে সরকারী দেনার যথার্থ গোড়াপত্তন হয়। রাষ্ট্র যেরূপই হোক, স্বৈরতন্ত্র, নিয়মতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রনির্বিশেষে সরকারী দেনা হল ধনিক-যুগের লক্ষণ। বর্তমান যুগে জাতীয় সম্পদের মধ্যে একমাত্র সরকারী দেনা জাতির সমষ্টিগত অধিকারে এসেছে।[৬] তাই আধুনিক কালে নিয়ম হয়েছে যে, যে জাতির দেনা বেশী, সে জাতির সমৃদ্ধিও বেশী। ধনিকের মূলমন্ত্র হল সাধারণের নামে ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থা সৃষ্টি। সরকারী দেনা যতই বাড়তে লাগল, ততই সরকারী দেনায় অবিশ্বাস অমার্জনীয় হয়ে দাঁড়াল, পরমপুরুষে অবিশ্বাসের সামিল হল।

পুঁজি সঞ্চয় ব্যাপারে সরকারী দেনা হয়েছিল একটা প্রধান সহায়। অনুর্বর মুদ্রা যেন ঐন্দ্রজালিকের মোহন যষ্টিস্পর্শে সন্তানপ্রজননের শক্তি পেল, শিল্পে বা ধারে টাকা খাটাতে গেলে যে অসুবিধা ও ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তাকে এড়িয়ে মূলধনে পরিণত হল। যারা ঋণদাতা আসলে তারা কিছুই দিল না, কারণ ধার দেওয়া টাকা তারা 'কোম্পানীর কাগজে' ফিরে পেল, সে কাগজ সহজে ভাঙানো চলে, নগদ টাকার সঙ্গে তার তফাৎ কিছু নেই। কিন্তু এ ছাড়া এর ফলে বার্ষিক বৃত্তিভোগী এক শ্রেণীর অলস অর্থবানের সৃষ্টি হল, হরেক রকমের

৬ উইলিয়ম কবেট বলেন যে ইংলণ্ডে সমস্ত সাধারণ প্রতিষ্ঠানের আখ্যা হচ্ছে "রাজকীয়" (Royal); ক্ষতিপূরণের জন্যই বোধ হয় "জাতীয়" (National) দেনার ব্যবস্থা আছে।

দালাল রোজগারের পথ পেল, যৌথ কারবারের পত্তন হল, হুণ্ডির ব্যবসা সুরু হল, টাকার বাজারে জুয়াখেলার ব্যবস্থা হল, আর এখানকার কালে ব্যাঙ্কের রাজত্ব আরম্ভ হল।

দেশের নাম নিয়ে যখন বড় বড় ব্যাঙ্কের জন্ম হয়, তখন তারা ছিল শুধু ধড়িবাজ ব্যবসায়ীদের সমিতি। তারা প্রায় সরকারের সমপর্যায়ে উঠল, আর নিজেদের বিশেষ অধিকার সুপ্রতিষ্ঠ করে সরকারকে টাকা ধার দিতে পারল। ১৬৯৪ সালে ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ড স্থাপনের সময় থেকে শ্রেষ্ঠীকুলের প্রভাব বেড়ে আসছে। সরকারী দেনা যত বাড়ে, ব্যাঙ্কের অবস্থা আর খাতির ততই বাড়তে থাকে। ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ড প্রথমে শতকরা আট টাকা হারে সরকারকে ধার দিয়েছিল; তখনই পার্লামেণ্ট ব্যাঙ্ককে নোট প্রচার করবার অধিকার দেয়। হুণ্ডির উপর বা মাল খরিদের জন্য অগ্রিম টাকা দেওয়া ও সোনা রূপা কেনা প্রভৃতির জন্য এই নোটগুলি কাজে লাগে। শীঘ্রই ব্যাঙ্কের এই নোটেই সরকারকে টাকা ধার দেওয়া হয়, ঐ নোটেই সরকারী দেনার সুদ ফেরৎ পাওয়া যায়। ব্যাঙ্ক যে কেবল এক হাতে কিছু দিয়ে অন্য হাতে অনেক বেশী ফেরত নিল তা নয়, চিরকালের জন্য দেশের মহাজন হয়ে রইল। ক্রমে ব্যাঙ্কেই দেশের সোনা রূপা জমা হল, ব্যবসায়ীদের পরস্পর বিশ্বাস বজায় রাখার কেন্দ্রস্থল হল ব্যাঙ্ক। সমসাময়িকরা, ব্যাঙ্কওয়ালা, মহাজন, দালাল, ঠিকাদার দলের আকস্মিক আবির্ভাবকে কি চোখে দেখেছিল তা বোলিংব্রোক প্রভৃতির লেখা থেকে প্রমাণ হয়।[৭]

সরকারী দেনার সঙ্গে সঙ্গে মূলধন সঞ্চয়ের আর এক উৎস, আন্তর্জাতিক ঋণব্যবস্থার উদ্ভব হয়। হল্যাণ্ডের ধনসম্পদের এক গোপন কারণ ছিল ভিনিসের চৌর্য-পদ্ধতি; ভিনিসের অবনতির যুগে সেখান

৭ * "আজ যদি তাতাররা ইয়োরোপ ভাসিয়ে দেয়, তাহলে তাদের পক্ষে দরকার হবে আমাদের শোনানো যে আমাদের মধ্যে শুধু এক নতুন শ্রেণীর আবির্ভাব হয়েছে।"—মন্তেস্‌কিয়্য, "এস্প্রি ছ লোয়া," তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৩, লণ্ডন ১৭৬৯।

থেকে হল্যাণ্ডে বহু টাকা ধার যায়। হল্যাণ্ড আর ইংলণ্ডের বেলাতেও ঐ ব্যাপার ঘটে। অষ্টাদশ শতকের প্রথমে ওলন্দাজ শিল্পকাররা পশ্চাৎপদ হয়ে পড়েছিল। বাণিজ্য ও শিল্পে হল্যাণ্ড আর প্রধান জনপদ রইল না। তাই ১৭০১ থেকে ১৭৭৬ পর্যন্ত হল্যাণ্ডের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ইংলণ্ড বহু টাকা ঋণ পায়। আজ আবার ইংলণ্ড আর আমেরিকার মধ্যে ঐ ঘটনাপরম্পরা চলেছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে আজ যে মূলধন খাটছে, তার জন্ম সম্বন্ধে প্রমাণ দাখিল করা হয় না; কিন্তু কাল তা ছিল ইংলণ্ডের শিশুদের রক্তে তৈরী টাকা।

সরকারী দেনার সুদ দেশের রাজস্ব থেকে দিতে হয়; তাই আধুনিক রাজস্বব্যবস্থা ঐ দেনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সরকার যখন বিশেষ খরচ মেটাবার জন্য টাকা ধার করে, করদাতারা তখনই তার বোঝা বোঝে না বটে, কিন্তু ধার নেওয়ার ফলে করবৃদ্ধি দরকার হয়ে পড়ে। অন্যদিকে দেনা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কর বেড়ে যায় বলে সরকারকে সর্বদাই অপ্রত্যাশিত খরচের জন্য নতুন দেনা করতে হয়। তাই গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উপর ট্যাক্স বসে, জিনিষ-পত্রের দাম বেড়ে যায়। রাজস্ব ব্যবস্থার স্বভাবই এমন যে ট্যাক্সের হার আপনা-আপনিই বাড়তে বাধ্য। এই ব্যবস্থার প্রথম পত্তন হয় হল্যাণ্ডে; সেখানকার এক প্রধান দেশভক্ত নেতা ডি. উইট, তাঁর "নীতিকথা" পুস্তকে বলেন যে শ্রমিকদের সহজবাধ্য, মিতব্যয়ী ও পরিশ্রমী রাখতে হলে এ ব্যবস্থা সব চেয়ে ভাল। এর ফলে শ্রমিকদের অবস্থা যে হীন হয়ে পড়ে, আর চাষী, মজুর ও নিম্নমধ্যবিত্ত-শ্রেণী যে অধিকার ভ্রষ্ট হয়, সে কথা এখন বলার প্রয়োজন নেই। এ বিষয়ে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা এক মত। শিল্পসংরক্ষণ নীতির দরুণ এ ব্যবস্থা আরও গুরুতর হয়ে পড়ে, গরীবের দুর্দশা বাড়ে।

সরকারী দেনা আর রাজস্ব ব্যবস্থার ফলে জাতির সম্পদ কয়েকজন অর্থবানের মূলধনে পরিণত হয়েছে আর জনসাধারণের স্বত্ব নষ্ট হয়েছে। কিন্তু কবেট, ডব্‌লডে প্রভৃতি এই ব্যাপারে যে এ-যুগে জনসাধারণের দুর্গতির মূল কারণ দেখেছেন, তা যথার্থ নয়।

শিল্পসৃষ্টি, স্বাধীন শ্রমিকের স্বত্বচ্যুতি, জাতীয় সম্পদকে কয়েক-

জনের মূলধনে পরিণত করা, মধ্যযুগের উৎপাদনব্যবস্থা থেকে আধুনিক ব্যবস্থায় পরিবর্তনকে জোর করে সংক্ষিপ্ত করার এক কৃত্রিম উপায় হচ্ছে সংরক্ষণনীতি। এই আবিষ্কার নিয়ে ইউরোপের নানা জাতি নিজেদের ছিন্নভিন্ন করেছে; মোটা মুনাফাওয়ালাদের কাজে একবার এসে লাগবার পর শুধু যে স্বদেশের লোক আমদানী কমা আর রপ্তানী বাড়ার দরুণ ভুগেছে তা নয়; ইংরেজ যেমন আয়ার্লণ্ডে পশম শিল্প তুলে দিয়েছিল, তেমনি সকল পরাধীন দেশে শিল্পকে জোর করে উৎপাটিত করা হয়েছিল। ইউরোপে কলবার্টের দৃষ্টান্তের পর ব্যাপারটা আরও সহজ হয়ে যায়। তখন সরকারী তোষাখানা থেকে শিল্পীর মূলধন আংশিকভাবে আসতে থাকে। মিরাবোর একটা কথা এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করা যায়: "যুদ্ধের পূর্বে স্যাক্সনির শিল্পপ্রাধান্যের কারণ খোঁজার জন্য বেশী দূর যাবার প্রয়োজন নেই; কারণ হচ্ছে ১৮ কোটি মুদ্রার রাজঋণ!"[৮]

আধুনিক শিল্পের শৈশবকালে উপনিবেশব্যবস্থা, সরকারী দেনা, দুর্বহ রাজস্ব, সংরক্ষণনীতি, বাণিজ্যযুদ্ধ প্রভৃতি প্রচণ্ডভাবে বেড়ে উঠে। এক বিরাট নির্দোষসংহার হয় আধুনিক শিল্পের অগ্রদূত। রাজকীয় নৌবাহিনীর নাবিকদের মত কারখানায় মজুরদের জোর করে পাকড়াও করে এনে কাজে লাগানো হয়। এবিষয়ে স্যার এফ. এম. ঈড্‌নের মত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে তাঁর নিজের যুগ পর্যন্ত চাষীদের বে-দখল করার বিভীষিকা সম্বন্ধে তিনি নির্বিকার ছিলেন; ঐ ব্যাপারকে তিনি কৃষিকর্মে ধনিকব্যবস্থা প্রবর্তন এবং "কৃষিভূমি ও পশুচারণ ভূমির, মধ্যে ন্যায্য অনুপাত" রক্ষার পক্ষে "একান্ত প্রয়োজন" মনে করতেন; কিন্তু ধনিক ও শ্রমিকের "প্রকৃত সম্পর্ক"-স্থাপন এবং অর্থলোভে কারখানার জন্য শিশু-অপহরণ ও শিশু-দাস্য সমর্থন করার মত আর্থনীতিক অন্তর্দৃষ্টি তিনি দেখাতে পারেন নি। তিনি বলেছেন: "ব্যবসায় সাফল্যের জন্য গরীব ঘরের শিশু লুঠ করে আনা; পালা করে সারা রাত তাদের

৮ • "দ্য লা মনার্কি প্রুস্যিয়ান," লণ্ডন, ১৭৮৮, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১০১।

কারখানায় খাটানো; যে বিশ্রাম সকলের পক্ষে, আর বিশেষত শিশুদের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন, সে বিশ্রাম কেড়ে নেওয়া; যে অবস্থা থাকলে কুদৃষ্টান্তে লাম্পট্য ও ব্যভিচার বাড়তে বাধ্য, সেই ভাবে বিভিন্ন বয়সের ও স্বভাবের বালক-বালিকাকে একত্র রাখা—এই সব ব্যাপারে ব্যক্তিগত বা সামাজিক কল্যাণ ঘটবে কি না, তা সাধারণের বিবেচনা করা উচিত।"[৯]

জন ফীল্‌ডেনের কথা এখানে উদ্ধৃত করা যায়: "ডার্বি, নটিংহাম, আর বিশেষতঃ ল্যাঙ্কাশায়ার জেলায়, যেখানে জল তোলবার চাকা চালানো যায় এমন নদীর ধারে, বড় বড় কারখানায় নতুন কলকব্জা বসানো হয়। সহর থেকে দূরে এই সমস্ত জায়গায় হঠাৎ হাজার হাজার মজুর দরকার পড়ে। ল্যাঙ্কাশায়ারের লোকসংখ্যা পূর্বে খুব কম ছিল ও জমি অনুর্বর ছিল বলে তখন সেখানে লোকবৃদ্ধি খুব প্রয়োজন হয়ে উঠেছিল। ছোট ছেলেদের হাল্‌কা আঙুলে কাজ ভালো হয় বলে তখনই লণ্ডন, বার্মিংহাম ও অন্যান্য জায়গার অনাথশালা থেকে "শিক্ষানবিশ" যোগাড় করার প্রথা আরম্ভ হয়। সাত থেকে তের চোদ্দ বছরের হাজার হাজার দুর্ভাগ্য বালককে এইভাবে উত্তরে পাঠানো হয়। মালিক তার শিক্ষানবিশদের জামাকাপড় দিত আর কারখানার কাছে এক বাড়ীতে তাদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করত। তাদের তদারক করার জন্য যে সব কর্মচারী ছিল, তারা তাদের যথাসম্ভব খাটিয়ে নিত; জোর করে যতটা কাজ তারা করাতে পারত, সেই অনুপাতে তারা বেতন পেত। এর ফল অবশ্য হত নিষ্ঠুর ব্যবহার।...শিল্পপ্রধান জেলাগুলিতে আর বিশেষতঃ আমার নিজের জেলা, অপরাধী ল্যাঙ্কাশায়ারে নির্দোষ, নির্বান্ধব বালকদের উপর হৃদয়বিদারক, নৃশংস ব্যবহার করা হত। অতিরিক্ত খাটিয়ে তাদের একেবারে মরণের কিনারা পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া হত। তাদের যন্ত্রণা দেওয়া হত নানা ভাবে, চাবুক মেরে, হাতে পায়ে বেড়ি লাগিয়ে। চাবুক মেরে খাটাতে গিয়ে অনেক সময় তাদের না খাইয়ে

৯ * প্রথম খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৪২১।

অস্থিচর্মসার করা হত। এক একবার তারা অত্যাচারের জ্বালায় আত্মহত্যা পর্যন্ত করেছে। ডার্বিশায়ার, নটিংহামশায়ার, ল্যাঙ্কাশায়ারের অদ্ভুত সুন্দর উপত্যকাগুলি লোকচক্ষু থেকে দূরে আছে বটে; কিন্তু কত নিঃসঙ্গ হতভাগ্য সেখানে নির্যাতিত হয়েছে, কত নরহত্যা পর্যন্ত সেখানে ঘটেছে! প্রচুর লাভ সত্ত্বেও মালিকদের বুভুক্ষা তুষ্ট না হয়ে উত্তেজিতই হয়েছিল। কি উপায়ে অজস্র লাভ হতে পারে, সেই চেষ্টায় রাত্রিতে কাজের ব্যবস্থা হয়, অর্থাৎ একদলকে সারাদিন খাটিয়ে আর এক দলকে সারারাত খাটানো হয়। দু'দলেরই বিছানা ছিল এক; রাত্রির দল যে বিছানা ছেড়েছে, সেই বিছানায় দিনের দলকে শুতে হত, তেমনি দিনের দল বিছানা ছাড়লে রাত্রির দল ঢুকত। ল্যাঙ্কাশায়ারে একটা কিম্বদন্তী ছিল যে ঐ বিছানাগুলি কখনও ঠাণ্ডা হতে পারত না।"[১০]

শিল্পোৎপাদনে ধনিকব্যবস্থা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপের জনমত একেবারে নির্লজ্জ ও বিবেকবর্জিত হয়ে পড়ে। ইয়োরোপীয়

১০ * পৃঃ ৫, ৬। কারখানা ব্যবস্থার পূর্বতন কলঙ্ক সম্বন্ধে ডক্টর একিনের পুস্তক (১৭৯৫ পৃঃ ২১৯, গিস্‌বর্ণ, "এনকোয়ারি ইনটু দি ডিউটিজ্ অফ্ ম্যান" (১৭৯৫), দ্বিতীয় খণ্ড, দ্রষ্টব্য। বাষ্পযন্ত্রের কল্যাণে যখন ঝরণা, নদীতট প্রভৃতির বদলে সহরের মধ্যেই কারখানা খোলা সম্ভব হল, তখন "মিতাচারী" মুনাফা-ভক্তদের আর অনাথশালা থেকে "শিক্ষানবিশ" পাকড়াও করার দরকার রইল না। ১৮১৫ সালে পার্লামেণ্ট শিশুদের মঙ্গল উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত আইন আলোচনার সময় অর্থনীতিবিদ্ রিকার্ডোর বিশেষ বন্ধু ফ্রান্সিস হর্ণার বলেন: "এক দেউলিয়ার সম্পত্তির মধ্যে একদল ছেলে বিক্রয়ের যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হয়েছিল, তা এখন প্রসিদ্ধ হয়ে পড়েছে। ছ'বছর আগে আদালতে এক মামলায় দেখা গেছল যে অনেকগুলি ছেলেকে এক মালিক আর এক মালিকের কাছে বিক্রয় করেছিল; কয়েকজন দয়ালু ভদ্রলোক দেখেছিলেন যে ছেলেগুলি একেবারে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িতের মতো। কয়েক বছর আগে লণ্ডনের এক অনাথশালার কর্তৃপক্ষ ল্যাঙ্কাশায়ারের এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে চুক্তি করেছিল যে প্রতি কুড়িজন প্রকৃতিস্থ বালকের সঙ্গে অন্ততঃ একজন হাবাগোবা ধরনের ছেলে পাঠাতে হবে"।

জাতিরা কর্তব্যবুদ্ধি জলাঞ্জলি দিয়ে ধনিকের অর্থবৃদ্ধির ঘৃণিত অপচেষ্টা নিয়েই গর্ব করতে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, গুণালঙ্কার-এ, অ্যাণ্ডারসনের অকপট "অ্যানাল্‌স্ অফ কমার্স" পাঠ করা যেতে পারে। এই বইয়ে ইংরেজদের রাষ্ট্রকৌশলের জয়জয়কার প্রমাণ করার জন্য সগর্বে দেখানো হয়েছে যে ১৭১৫ সালে য়ুট্রেখ্‌টের সন্ধিতে ইংলণ্ড স্পেনের কাছ থেকে আফ্রিকা হতে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ও দক্ষিণ আমেরিকায় কাফ্রি ক্রীতদাস চালান দেবার ব্যবসা কেড়ে নেয়। এর ফলে ইংলণ্ড ১৭৪৩ সাল পর্যন্ত প্রতি বৎসর দক্ষিণ আমেরিকায় ৪৮০০ কাফ্রি ক্রীতদাস সরবরাহ করার অধিকার পায়। ইংরেজদের এই চৌর্য-ব্যবসার উপর এই ভাবে সরকারী ঢাকনা দেওয়া হয়। দাসব্যবসায়ে লিভারপুলের সমৃদ্ধি বাড়তে থাকে। এই ছিল লিভারপুলের প্রাথমিক ধনসঞ্চয়ের উপায়। এখনও লিভারপুলের "সম্ভ্রান্ত" ঐশ্বর্য সম্বন্ধে একিনের পূর্বোদ্ধৃত লেখা থেকে বলা যায় যে "একই সময় দাসব্যবসায় ও লিভারপুলের ব্যবসায়ীদের নির্ভয় সাহস একত্রিত হয়ে তাদের বর্তমান সম্পদ এনে দিয়েছে; এর ফলে জাহাজীদের কাজ বেড়েছে, দেশের শিল্পের চাহিদা খুব বেড়ে গেছে"(৩৩৯ পৃঃ)। ১৭৩০ সালে লিভারপুলে দাসব্যবসায়ের জন্য ৩০ খানি জাহাজ চলত; ১৭৬০ সালে ৭৪ খানি; ১৭৭০ সালে ৯৬; ১৭৯২ সালে ছিল ১৩২।

কার্পাস শিল্প ইংলণ্ডে শিশু-দাস্য প্রবর্তন করেছিল আর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রাচীন কুলপতিশাসিত দাসপ্রথার বদলে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে নির্মম শোষণ-ব্যবস্থা স্থাপনে প্ররোচনা দিয়েছিল। সত্যই ইয়োরোপের মজুরদের ছদ্মবেশী দাসত্বের পাদাধার রূপে আমেরিকায় অমিশ্র দাসত্বের প্রয়োজন ছিল।[১১]

এ সমস্ত ব্যাপার ঘটেছিল যাতে শিল্পোৎপাদনে ধনিকতন্ত্রের

১১ * ১৭৯০ সালে ইংরেজশাসিত ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে একজন স্বাধীন প্রজা থাকলে দশজন দাস থাকত, ফরাসী ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে ছিল একজন স্বাধীন থাকলে চৌদ্দজন দাস, ওলন্দাজ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে ছিল একজন স্বাধীন থাকলে তেইশজন দাস। (হেন্‌রি ব্রুহম, "এনকোয়ারি ইনটু দি কলোনিয়াল পলিসি অফ্ দি ইয়োরোপীয়ান পাওয়ার্স," এডিন্, ১৮০৮, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৭৪)।

"শাশ্বত প্রকৃতিগত ব্যবস্থা"-স্থাপন হতে পারে, যাতে মজুরীর বন্দোবস্তের উপর মজুরের কোন হাত না থাকে, যাতে সমাজের এক প্রান্তে উৎপাদন ও জীবিকার্জনের সামাজিক উপকরণকে মূলধনে, আর অন্য প্রান্তে জনসাধারণকে আধুনিক সমাজব্যবস্থার কৃত্রিম কীর্তি, "স্বাধীন গরীব মজুরে" পরিণত করা হয়।[১২]

ওজিয়ের বলেছিলেন যে টাকা যখন পৃথিবীতে আসে, তখন তার এক গালে জন্ম থেকেই রক্ত চিহ্ন থাকে।[১৩] আমরা বলতে পারি যে মূলধনের যখন আবির্ভাব হয়, তখন তার আপাদমস্তক, প্রতি লোমকূপ থেকে রক্ত আর ক্লেদ ঝরতে থামে।[১৪]

---

১২ * বেতনভোগী শ্রমিকের উদ্ভবের সময় থেকে "গরীব মজুর" এই কথাটি ইংলণ্ডের আইনে দেখা যায়। ভিক্ষুক প্রভৃতি "অলস গরীব," আর পাখা-না-ছেঁড়া পায়রার মত যাদের কিছু জমি বা উপার্জনের উপায় ছিল, তাদের সঙ্গে বৈসাদৃশ্য দেখাবার জন্য ঐ কথা ব্যবহার হত। আইন-বই থেকে ক্রমে তা অ্যাডাম স্মিথ, ঈড্‌ন্ প্রভৃতি অর্থনীতিবিদের লেখায় প্রবেশ করে। যে "জঘন্য রাজনৈতিক বুজরুকিওয়ালা" এডমণ্ড বার্ক "গরীব মজুর" কথাটিকে "জঘন্য রাজনৈতিক বুজরুকি" বলেছিলেন, তাঁর সততার বিচার সহজেই করা যায়। ইংরেজ অভিজাতদের অর্থপুষ্ট এই চাটুকার ফরাসী বিপ্লবের সময় যে অভিনয় করেছিলেন, আমেরিকায় গোলযোগের সময় ঔপনিবেশিকদের টাকা খেয়ে তার বিপরীত চেহারাই দেখিয়েছিলেন। বার্ক হচ্ছেন ইতর বুর্জোয়ার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। "বাণিজ্যের বিধান হচ্ছে প্রকৃতির রীতি, ঈশ্বরের নির্দেশ।" বার্ক যে ঈশ্বর আর প্রকৃতির নির্দেশ অনুসারে সব চেয়ে ভালো বাজারে নিজেকে বেচতেন, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। 'টোরি' পাদরী হলেও টাকার তাঁর লেখায় বার্কের চরিত্র সুন্দর ভাবে এঁকেছেন।

১৩ * মারি ওজিয়ের, "দ্যু ক্রেদি প্যুব্‌লিক" প্যারিস, ১৮৪২।

১৪ * "যথেষ্ট লাভের আশা থাকলে মূলধন হয় অকুতোভয়। শতকরা দশটাকা হারে যে কোন জায়গায় মূলধন খাটানো যাবে; কুড়িটাকা হলে খাটানোর জন্য রীতিমত ঔৎসুক্য থাকবে; পঞ্চাশ হলে কথাই নেই; শতকরা একশো হলো মানুষের কোন আইনকে পদদলিত করতে মূলধন ইতস্তত করবে না; তিনশো পেলে এমন কোন অপরাধ নেই, এমন কোন বিপদ নেই, এমন কি মূলধনীরা প্রাণদণ্ড ভয় সত্ত্বেও টাকার খেলা চালাবে। লাভের জন্য যদি লড়াই ও অন্যান্য হাঙ্গামার দরকার হয় তো মূলধনীরা সে ব্যাপারে উৎসাহ দেবে। এখানে যা বলা হল তার প্রমাণ মিলবে মাশুলচুরি আর দাসব্যবসায়ের ইতিহাসে।" (পি. জে. ডানিং, পৃঃ ৩৫)।

শিল্পে বস্তুনিষ্ঠা

ফ্রেডরিক এঙ্গেল্‌স্‌

মার্গারেট হার্কনেস-কে লেখা চিঠি, তারিখ—এপ্রিল, ১৮৮৮

আপনার লেখা "শহরের মেয়ে" মিস্টার ভিজেটেলির হাত দিয়ে পাঠিয়েছেন বলে বহু ধন্যবাদ।

বইটি আমি পরম আগ্রহে পড়েছি ও পড়ে খুবই আনন্দ পেয়েছি। আমার বন্ধু এবং আপনার অনুবাদক আইখ্‌কফ্‌ ঠিকই বলেছেন যে বইটি হল ছোটখাট একটি শিল্পবস্তু। আপনি শুনে খুসী হবেন তিনি আরও বলেছেন যে সে জন্য তাঁর অনুবাদকে প্রায় অবিকল হতেই হবে, কারণ কিছু বাদ দিলে বা অদল বদলের চেষ্টা করলে মূল রচনার আংশিক মূল্যহানিই শুধু হতে পারে।

আপনার কাহিনীর বস্তুনিষ্ঠ অবৈকল্য ছাড়া আমার কাছে যা খুব ভালো লেগেছে তা হল এই যে আপনি প্রকৃত শিল্পীর সাহস দেখিয়েছেন। 'স্যাল্‌ভেশন আর্মি'-র আপনি বর্ণনা দিয়েছেন, আত্মসন্তুষ্ট ক্ষুদ্রচেতাদের ধারণাকে আপনি ক্ষুরধার আক্রমণের জোরে অলীক প্রমাণ করেছেন—তারা হয়তো আপনার গল্প পড়েই প্রথম শিখবে যে জনসাধারণের মধ্যে 'স্যাল্‌ভেশন আর্মি' এত সমর্থন পায় কেন। কিন্তু কেবল সেজন্য বইটি আমার এত ভালো লাগে নি; সবচেয়ে ভালো লেগেছে এই কারণে যে আপনি সমগ্র বইটির যা হল আসল বনিয়াদ —অর্থাৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক পুরুষের ফাঁদে পড়ে মজুর ঘরের এক মেয়ের পদস্খলনের বহু পুরাতন যে কাহিনী চলে আসছে, সেই কাহিনীকে নিরাভরণ পরিচ্ছদ পরিয়েছেন। লেখকের হাত কাঁচা হলে তিনি আখ্যানবস্তুর তুচ্ছতাকে একগাদা অস্বাভাবিক খুঁটিনাটি আর অলঙ্কারের তলায় ঢাকবার চেষ্টা করতেন, আর চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর মতলব তবু ধরা পড়ে যেত। কিন্তু আপনি অনুভব করেছেন যে

পুরানো গল্পকে বলবার ধরনের সত্যতার জোরে নতুন করে তোলার ক্ষমতা রাখেন বলেই সে গল্প আপনি বলতে পারেন।

আপনার সৃষ্টি মিস্টার গ্রান্টের চরিত্র চমৎকার।

সমালোচনা যদি আমাকে করতে হয় তো আমি শুধু বলব যে আপনার কাহিনীর বস্তুনিষ্ঠা সম্পূর্ণ যথেষ্ট নয়। আমার মতে বস্তুনিষ্ঠা বলতে কেবল খুঁটিনাটির নিখুঁত বর্ণনা বোঝায় না, সঙ্গে সঙ্গে আরও বোঝায় বিশিষ্ট পরিস্থিতিতে প্রতিনিধিমূলক চরিত্রের প্রকৃত প্রতিচ্ছবি। আপনার চরিত্রগুলির বর্ণনা যতদূর আপনি দিয়েছেন, ততদূর পর্যন্ত তারা প্রতিনিধিমূলক বটেই। কিন্তু তাদের পরিবেশ এবং যে পরিস্থিতির মধ্যে থেকে তাদের ভূমিকার উদ্ভব হয়েছে, সেই পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রতিনিধিমূলক বৈশিষ্ট্য সুপরিস্ফুট নয়। "শহরের মেয়ে"-তে শ্রমিক শ্রেণীকে দেখা যায় নিষ্ক্রিয় জনতার রূপে, তারা যেন আত্মনির্ভর হতে কিম্বা হওয়ার চেষ্টা করতে পর্যন্ত অপারগ। জঘন্য দারিদ্র্যের পাঁক থেকে তাদের টেনে তোলার চেষ্টা আসছে বাইরে থেকে আর ওপর থেকে। ১৮০০ কিম্বা ১৮১০ সালে, স্যাঁ-সিমঁ আর রবার্ট ওয়েনের যুগ সম্পর্কে এ সকল বর্ণনা নির্ভুল হতে পারত, কিন্তু যে আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে সংগ্রামী শ্রমিক শ্রেণীর অধিকাংশ অভিযানে যোগদানের গৌরব অনুভব করেছে এবং শ্রমিক-শ্রেণীর মুক্তি শ্রমিক শ্রেণীরই নিজস্ব লক্ষ্য, এই নীতি দ্বারাই যে সর্বদা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, তার পক্ষে ১৮৮৭ সালে ঐ বর্ণনাকে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। চারদিকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর মানুষ যে বৈপ্লবিক কায়দায় সাড়া দিয়েছে, মানুষ হিসাবে নিজেদের অধিকার আদায় করার জন্য সচেতন বা অর্ধচেতন ভাবে যে প্রচণ্ড প্রচেষ্টা তারা করেছে, তা আজ ইতিহাসের বিষয়বস্তু, এবং সেই জন্যই তা বস্তুনিষ্ঠ শিল্পের রাজ্যে নিজের স্থান দাবী করতে পারে।

আপনি নিছক সোশালিস্ট উপন্যাস লেখেন নি বলে, কিম্বা আমরা জার্মানরা যাকে বলি 'টেণ্ডেন্ৎস্ রোমান্' (একটা বিশেষ ঝোঁক নিয়ে লেখা উপন্যাস) লেখেন নি বলে নিন্দা করতে আমি একেবারেই চাই না। আমার উদ্দেশ্য একটুও তেমন নয়। গ্রন্থকারের মতামত যত

বেশী গোপন থাকে, ততই শিল্পবস্তুর মূল্য বাড়ে। যে বস্তুনিষ্ঠার উল্লেখ আমি করেছি তা গ্রন্থকারের মতামত সত্ত্বেও লেখার ভিতরে ফুটে উঠতে পারে। এ-বিষয়ে একটা দৃষ্টান্ত দেখানো যাক্।

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সব ক'জন জোলা-র চেয়ে যে বাল্‌জাক্‌কে আমি বস্তুনিষ্ঠ শিল্পস্রষ্টা হিসাবে ঢের বড়ো বলে মনে করি, সেই বাল্‌জাক্ তাঁর "কমেদি য়্যুমেন"-এ ফ্রান্সের "বনেদী সমাজে"র একটা আশ্চর্য বাস্তব ইতিহাস ফুটিয়ে তুলেছেন। যে অভিজাত সম্প্রদায় ১৮১৫ সালের পর আবার প্রতিষ্ঠা লাভ করে নিজেদের সাধ্যানুসারে প্রাচীন ফরাসী আদব কায়দার আদর্শ ফিরিয়ে আনছিল, সেই সম্প্রদায়ের ওপর আগুয়ান মধ্যশ্রেণী ("বুর্জোয়াজি") ক্রমাগত কেমনভাবে চাপ দিয়ে চলছিল, ১৮১৬ থেকে ১৮৪৮ পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি বছর ধরে কাহিনীর ধরনে তার বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। তাঁর চোখে যে সমাজ ছিল নিখুঁত, তারই শেষ চিহ্নগুলো কেমন করে হঠাৎ-ফেঁপে-ওঠা সৌজন্যরহিত অর্থবানদের আবির্ভাবে মুষড়ে পড়ল, কিম্বা তার নোংরা ছোঁয়াচে নষ্ট হয়ে গেল, এ ঘটনা তিনি বর্ণনা করেছেন। আগেকার "বড়ো ঘরের মেয়ে" যে ধরনে নিজের বিয়ের বন্দোবস্ত করেছিল, তারই সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রেখে এক রকম নিজেকে জাহির করার উপায় হিসাবে দাম্পত্য রেখার বাইরে গিয়ে নীতিবাক্য লঙ্ঘন করত; সেই "বড়ো ঘরের মেয়ের" জায়গায় এল বুর্জোয়া মহিলা যে স্বামী সংগ্রহ করল নগদ টাকা বা দামী পোষাকের খাতিরে। মাঝখানে এই দাবী রেখে তার চারদিকে বাল্‌জাক্ সাজালেন ফরাসী সমাজের একটা সম্পূর্ণ ইতিহাস, যা থেকে আর্থনীতির খুঁটিনাটি ব্যাপারেও (যেমন ধরা যাক, ফরাসী বিপ্লবের পর স্থাবর ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির পুনর্বণ্টন) আমি সে যুগের সব ক'জন পেশাদার ইতিহাস, আর্থনীতি ও সংখ্যাশাস্ত্রবিদদের কাছে শেখা তথ্যের চেয়ে অনেক বেশী শিখতে পেরেছি।

অবশ্য রাজনীতিক্ষেত্রে বাল্‌জাক্ ফরাসী রাজতন্ত্রকেই একমাত্র বৈধ ব্যবস্থা বলে মানতেন; তাঁর বিরাট গ্রন্থে নিয়তই শিষ্ট সমাজের

অকাট্য অবনতি বিষয়ে তিনি বিলাপ করেছেন; যে শ্রেণীর ভবিতব্য ছিল অবলুপ্তি, সেই শ্রেণী ছিল তাঁর সহানুভূতির পাত্র। কিন্তু তা সত্ত্বেও অভিজাত সম্প্রদায়ের যে নরনারীর প্রতি তাঁর মমতা ছিল সব চেয়ে গভীর, তাদেরই সম্পর্কে তাঁর বিদ্রূপ ছিল সব চেয়ে তীক্ষ্ণ, তাঁর শ্লেষ ছিল সব চেয়ে নির্মম। আর যারা তখন (১৮৩০—৩৬) ছিল বাস্তবিকই জনগণের প্রতিনিধি, ক্লোয়াৎর্ সঁ্যা মেরি-র যে রিপাবলিকান্ বীরদের সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক বৈরিতা ছিল সবচেয়ে কঠোর, কেবল তাদের সম্পর্কেই তিনি খোলাখুলি সুখ্যাতি করে গিয়েছেন।

বাল্জাক্ যে নিজেরই শ্রেণীসহানুভূতি ও রাজনৈতিক পক্ষপাতের বিরুদ্ধে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন; তাঁরই প্রিয়পাত্র অভিজাতদের অধঃপতন অনিবার্য বলে যে তিনি দেখেছিলেন এবং সেটাই তাদের উপযুক্ত পরিণাম বলে যে তিনি বর্ণনা করেছিলেন, ভবিষ্যতের প্রকৃত মানুষ যারা তারা যে তখন কোথায়, তা যে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন—একেই আমি মনে করি বস্তুনিষ্ঠার এক বিরাট গৌরবমণ্ডিত নিদর্শন, একেই আমি মনে করি বাল্জাকের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যের অন্যতম।

আপনার স্বপক্ষে আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে লণ্ডনের ঈস্ট্ এণ্ড্ এলাকার শ্রমিকরা বিপক্ষকে প্রতিরোধ ব্যাপারে যত নিষ্ক্রিয়, যত বেশী মন-মরা আর হাল ছেড়ে দিয়ে অদৃষ্টের কাছে হার মানতে যেমন প্রস্তুত, তেমন আর সভ্য জগতের অন্য কোথাও তারা নয়। তাছাড়া আমি কেমন করে জানি যে শ্রমিকদের জীবনের সক্রিয় দিকটার ছবি অন্য এক রচনার জন্য মুলতুবী রেখে এবার তার নিষ্ক্রিয় দিকের ছবি এঁকে সন্তুষ্ট হওয়ার কারণ আপনি খুঁজে পেয়েছেন কি না।

(২)

মিন্না কাউট্স্কিকে লেখা চিঠি, তারিখ—২৬শে নভেম্বর, ১৮৮৫

একটা বিশেষ ঝোঁক নিয়ে লেখা কবিতার বিরোধী আমি একেবারেই নই। ঠিক দান্তে আর সের্ভান্‌ৎ-এর মত 'ট্রাজেডি'-র জন্মদাতা ঈস্কাইলস্ আর 'কমেডি'-র জন্মদাতা, অ্যারিষ্টফেনীস্,

উভয়েই ছিলেন দস্তুরমত একটা বিশেষ ঝোঁক-ওয়ালা কবি। শিলার-এর "Craft and Love" গ্রন্থের প্রধান গুণ হল এই যে সেটা হল জার্মান ভাষায় প্রথম "প্রপাগাণ্ডা"-মূলক নাটক। আজকালকার রুশ আর নরউঈজিয়ানরা চমৎকার উপন্যাস লিখছেন আর সেগুলো সবই কোন একটা বিশেষ ঝোঁক নিয়ে লেখা।

কিন্তু আমি মনে করি যে লেখকের পক্ষপাত বিশেষভাবে বর্ণিত না হয়ে ঘটনা ও ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে আসা উচিত। যে সামাজিক সংঘর্ষের ছবি আঁকা হল তার ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক সমাধান পাঠকের চোখের সামনে জোর করে ঠেলে ধরতে লেখক বাধ্য নন। আর বিশেষ করে আমাদের বর্তমান অবস্থায় উপন্যাসের প্রচলন প্রধানত বুর্জোয়াদের মহলে, অর্থাৎ, যাদের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই তাদের মধ্যে। তাই আমার মনে হয় যে যদি অকপটভাবে সমাজে মানুষের প্রকৃত পরস্পর সম্পর্ক সম্বন্ধে মামুলী বিভ্রান্তিগুলো ভেঙে দেওয়া যায়, যদি বুর্জোয়া পৃথিবীর নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশান্বিত ধারণা চূর্ণ হয়ে পড়ে আর বর্তমান ব্যবস্থার চিরন্তন চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহের আবির্ভাব ঘটে, তা হল সোশালিস্ট-পক্ষপাত-সম্পন্ন উপন্যাসের লেখক কোন সুনির্দিষ্ট সমাধান উপস্থাপিত না করে কিম্বা খোলাখুলি ভাষায় তিনি কোন পক্ষে তা প্রচার না করেও রচনার উদ্দেশ্য যথেষ্ট পরিপূরণ করতে পারেন।

ভারতে ইংরেজ শাসন

[১৮৫২ থেকে ১৮৫৯ সালের মধ্যে "নিউইয়র্ক ট্রিবিউন" পত্রে মার্কসের অনেকগুলো লেখা প্রকাশ হয়। যে দুটি প্রবন্ধের অনুবাদ দেওয়া গেল, সেগুলো ২৫শে জুন, ১৮৫৩, আর ৮ই আগষ্ট, ১৮৫৩ তারিখে প্রকাশ হয়েছিল। ভারতের জাতীয় সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের সাহিত্যিকরা এখন আর উদাসীন থাকতে পারেন না। এই বিষয়ে মার্কসের গভীর অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে আমাদের লেখকদের পরিচিত করে দেওয়াই এই অনুবাদের উদ্দেশ্য।]

॥ এক ॥

হিন্দুস্থান এশিয়ার ইতালী; হিমালয় তার আল্‌পস, বাংলার সমভূমি তার লম্বার্ডি, বিন্ধ্যগিরিশ্রেণী তার অ্যাপেনাইন্‌স, সিংহলদ্বীপ তার সিসিলি। দুই দেশেই আছে শস্যের উর্বর বৈচিত্র্য আর রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার পার্থক্য। দুই দেশই বহুদিন থেকে বিদেশী আক্রমণের চাপে অঙ্গচ্ছেদ সহ্য করে এসেছে। আবার সমাজের দিক থেকে দেখতে গেলে হিন্দুস্থান প্রাচ্যের ইতালী নয়, প্রাচ্যের আয়ারল্যাণ্ড। তাই ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্মানুষ্ঠানে ভোগাসক্তি ও বিষাদের, ইতালী ও আয়ারল্যাণ্ডের অদ্ভুত সংমিশ্রণ দেখা যায়। সে ধর্মানুষ্ঠানে আছে ইন্দ্রিয়বৃত্তির আতিশয্য আর সন্ন্যাসীদের আত্মনিগ্রহ, আছে লিঙ্গ আর জগন্নাথ, আছে যোগী আর দেবদাসী, ভারতবর্ষের সত্যযুগে যাদের আস্থা আছে, তাদের মতে আমি সায় দিই না। আমার স্বপক্ষে স্যার চার্লস উডের মত মুর্শিদ কুলী খাঁর বৃত্তান্ত উদ্ধৃত করার প্রয়োজন নেই। আওরংজেবের রাজত্ব বা উত্তরে মোগল ও দক্ষিণে পর্তুগীজদের আক্রমণকাল, বা মুসলমান আক্রমণের যুগ বা দক্ষিণ ভারতে সপ্তরাজ্যের সময়, কিম্বা খৃষ্টান মতে পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বেও যে যুগে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ভারতের দুঃখ কাহিনীর আরম্ভ বলে প্রচার করেছেন —কোথাও সেই সত্যযুগের সন্ধান মেলে নি।

কিন্তু এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে ইংরেজ রাজত্বে ভারতবর্ষের যে দুর্গতি হয়েছে, তা পূর্বের তুলনায় শুধু বিভিন্ন প্রকৃতির নয়, বহুগুণ তীক্ষ্ণ ও তীব্র ও বটে, এর কারণ কেবল এশিয়ার আর ইয়োরোপের স্বেচ্ছাচার—তন্ত্রের দানবীয় সংযোজন নয়; ঐ সংযোজন ইংরেজ শাসনের বিশেষত্ব নয়, ওলন্দাজ শাসনের অনুকরণ মাত্র। তাই ইংরেজ ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্যকলাপ বোঝাতে গেলে পুরানো ওলন্দাজ ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী সম্বন্ধে জাভার ইংরেজ গভর্নর স্যার ষ্ট্যামফর্ড র‍্যাফলসের কথা হুবহু তুলে দেওয়া চলে :

"ওলন্দাজ কোম্পানীর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল লাভ। তারা প্রজাদের উৎপীড়ন করত ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের কুঠিওয়ালাদের চেয়ে বেশী, কারণ পয়সা দিয়ে কেনা মজুরদের একটু যত্ন না নিলে কুঠিওয়ালাদেরই একটু লোকসান হত। প্রজাদের শেষ আধলা পর্যন্ত ওলন্দাজ কোম্পানী আদায় করত; রাজনীতিকের কূটবুদ্ধি আর ব্যবসাদারের স্বার্থান্ধতা মিলিত হওয়ায় তাদের খামখেয়ালী, অর্ধসভ্য শাসনের ফলাফল অতি ভীষণ হত।"

অবিরাম গৃহবিবাদ, আক্রমণ, পরাজয়, বিপ্লব, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির দরুণ ভারতবর্ষের ইতিহাস আমাদের কাছে জটিল ও সংহারকরূপে দেখা দেয়। কিন্তু এ সমস্ত ঘটনা সমাজের বহিরাবণ স্পর্শ করে গেছে মাত্র, আমূল পরিবর্তন আনে নি। কিন্তু ইংরেজ রাজত্বে ভারতীয় সমাজের আসল কাঠামো একেবারে ভেঙ্গে গেছে, এখনও তা নতুন করে গড়ে ওঠার কোনো চিহ্ন নেই। ভারতবর্ষ তার প্রাচীন জীবন হারিয়ে ফেলেছে, নতুন জীবন পায় নি। ইংরেজ শাসনে হিন্দুস্থান ঐতিহ্যচ্যুত হয়েছে, তার অতীতের সঙ্গে সংস্রব হারিয়েছে। এখনকার ভারতীয় জীবনে তাই শুধু বিষাদ নেই, একটা বিশেষ রকমের অবসাদও মিশে রয়েছে।

এশিয়াতে অতি প্রাচীনকাল হতে মোটামুটি তিনটি সরকারী বিভাগ চলে এসেছে। প্রথম হচ্ছে রাজস্ব বা স্বদেশের লুণ্ঠন; দ্বিতীয় যুদ্ধ বা বিদেশের লুণ্ঠন; আর তৃতীয় হচ্ছে পূর্তকার্য।

খাল কেটে চাষের জমিতে জলসেচন আর জল সরবরাহের ব্যবস্থা

প্রাচ্যদেশে কৃষিকর্মের ভিত্তিস্বরূপ। এর কারণ হচ্ছে, আবহাওয়া আর ভৌগোলিক অবস্থা—বিশেষত, যে বিরাট মরুভূমি সাহারা থেকে আরব, পারস্য, ভারতবর্ষ আর তাতার হয়ে এশিয়ার সর্বোচ্চ আধিত্যকাগুলো পর্যন্ত গেছে। সকলের পক্ষে সমান দরকারী জলের খরচ সম্বন্ধে বিশেষ হিসাব না হলে চলত না। সেইজন্য পাশ্চাত্যে ফ্লাণ্ডার্স আর ইতালিতে অনেকে একত্র হয়ে যৌথ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিল।

প্রাচ্যদেশগুলো এবিষয়ে ছিল পশ্চাৎপদ, আর তাদের আয়তন অতি বিশাল ; তাই স্বেচ্ছাপ্রবুদ্ধ সমবায় প্রায় অসম্ভব বলে সরকারকে এ ব্যাপারে ভার নিতে হয়েছিল। এশিয়ার সকল শাসনব্যবস্থায় ঐ কারণে পূর্তবিভাগ একটা বড় জায়গা আবহমান কাল থেকে নিয়ে এসেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ম প্রচেষ্টার উপর ভূমির উর্বরতা নির্ভর করত; জলসেচন ও জলনির্গম ব্যবস্থায় অবহেলার ফল হত কৃষিকর্মের বিনাশ। একথা মনে না রাখলে আমরা কিছুতেই বুঝতে পারব না যে কেন পালমাইরা, পীট্রা, রেমেন, মিশর, পারস্য ও ভারতবর্ষের বহু প্রদেশে এককালে খুব ভাল রকম চাষাবাদ হলেও পরে তা উষর মরুভূমিতে পরিণত হয়েছিল, একটিমাত্র সর্বনাশী যুদ্ধের ফলে কেন একটি সভ্যতার সম্পূর্ণ বিলোপ হত, একটা দেশ বহুকাল জনশূন্য হয়ে থাকৃতো।

ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পূর্বগামীদের কাছ থেকে রাজস্ব আর যুদ্ধ বিভাগ নিয়েছে বটে, কিন্তু পূর্তকার্যকে সম্পূর্ণই অবহেলা করে এসেছে। ইংরেজদের অবাধ প্রতিযোগিতা-নীতি ভারতবর্ষের কৃষিক্ষেত্রে অচল বলে চাষের দারুণ অবনতি ঘটেছে। কিন্তু এক শাসনে কৃষিকর্ম বিগড়ে গিয়ে অন্য শাসনে তার পুনরুদ্দীপনের দৃষ্টান্ত এশিয়াতে দুর্লভ নয়। তাই শস্যোৎপাদনের প্রতি শাসকদের অবহেলার ফল অত্যন্ত শোচনীয় হলে তার দরুণ ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা পর্যুদস্ত হওয়ার কোন আশঙ্কা ছিল না। কিন্তু ইংরেজ আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি ব্যাপার ভারতবর্ষে প্রবেশ করল, যা সমগ্র এশিয়ার ইতিহাসে একেবারে অভূতপূর্ব। নানা রাজনৈতিক

যুদ্ধবিগ্রহ সত্ত্বেও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাস সমাজ জীবনে বিশেষ পরিবর্তন আনে নি। সে সমাজের খুঁটি ছিল চরকা আর তাঁত। স্মরণাতীত কাল থেকে ইয়োরোপ ভারতীয় তাঁতীদের বোনা কাপড় কিনে এসেছে আর তার বদলে পাঠানো সোনারূপা দিয়ে দেশের স্যাকরারা ভূষণপ্রিয় জনসাধারণের তুষ্টিসাধন করেছে। স্যাকরাকে বাদ দিলে গ্রামের জীবন চলত না। দেশের সর্বনিম্ন শ্রেণীতেও গহনার চলন বেশী ছিল, অন্নবস্ত্রের অভাব সত্ত্বেও গলায় হার, আঙ্গুলে আংটি, হাতে চুড়ি, পায়ে মল ব্যবহার হত খুব। একটু সম্পন্ন পরিবারেই সোনা বা রূপার তৈরি দেবদেবীর মূর্তি দেখা যেত। সেই দেশে ইংরেজ ঢুকে তাঁত ভাঙল, চরকাকে নষ্ট করল। প্রথমে তারা ভারতবর্ষের কার্পাসকে ইয়োরোপের বাজার থেকে তাড়ালো, তারপর পাকানো সুতো পাঠাতে লাগলো। আর শেষে কার্পাসের মাতৃভূমিকেই বিদেশী কাপড়ে ভাসিয়ে দিল। ১৮১৮ থেকে ১৮৩৬ সালের মধ্যে বিলেত থেকে সুতো রপ্তানী ৫,২০০ গুণ বেড়েছিল। ১৮৪২ সালে ভারতবর্ষে দশ লক্ষ গজ বিলাতী কাপড় আমদানী হত কিনা সন্দেহ; অথচ ১৮৩৭ সালে ৬ কোটি ৪০ লক্ষ গজেরও বেশী আমদানী হয়েছিল। ঐ সময়েই ঢাকার লোকসংখ্যা দেড় লক্ষ থেকে বিশ হাজারে নামল। শুধু যে বস্ত্রশিল্পের পীঠস্থানগুলোরই পতন হল তা নয়; ফল হল আরও ভয়াবহ। সারা হিন্দুস্থানে কৃষি ও শিল্পকর্মের মধ্যে যে যোগসূত্র ছিল, তা ইংরেজদের বিজ্ঞান আর বাষ্পযন্ত্র একেবারে ছিন্ন করে দিল।

অন্যান্য প্রাচ্যদেশীয়ের মত ভারতবাসীরা কৃষি বাণিজ্যের প্রধান সহায় পূর্তকার্যের ভার সরকারের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হত। গোটা দেশটিতে ছড়িয়ে গিয়ে ছোট ছোট গ্রামে জড় হত আর কৃষি-শিল্পাদি গৃহকর্মের মত চালাত। অতি প্রাচীনকাল থেকে তাদের বসবাসের এই বন্দোবস্ত চলে এসেছে, আর একেই আমরা "পল্লী-ব্যবস্থা" (Village System) বলে জানি। প্রত্যেক ছোট গ্রামেরই স্বতন্ত্র জীবনধারা ও শাসন শৃংখলা ছিল। বিলাতের

পার্লামেণ্টে পেশ করা একটা পুরানো সরকারী রিপোর্ট থেকে এই ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমরা ধারণা করতে পারব :

ভূগোলের দিক থেকে দেখলে একটা গ্রামে আছে কয়েক শো বা কয়েক হাজার একর চাষের জমি আর পোড়ো জমি। রাষ্ট্রনীতির দিক থেকে দেখলে সেই গ্রামের সঙ্গে একটা সমবায় বা পৌরসংঘের সাদৃশ্য বোঝা যাবে। প্রধান বাসিন্দা বা প্যাটেল গ্রামের সমস্ত ব্যাপারেরই তত্ত্বাবধান করেন, গ্রামবাসীদের বিবাদ নিষ্পত্তি করেন, শান্তিরক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখেন আর খাজনা আদায় করেন ; গ্রামের মুহুরি—চাষবাসের হিসাব-দপ্তর রাখেন ; একজন বা দু'জন ফৌজদারী ব্যাপারে ভার নিয়ে থাকেন আর পথিকদের একগ্রাম থেকে অন্য গ্রামে নিরাপদে পৌঁছে দেন ; একজন গ্রামের চৌহদ্দি স্থির রাখেন. দরকার হলে সে বিষয়ে সাক্ষ্য দেন ; পুকুর, নালা ইত্যাদির তত্ত্বাবধায়ক চাষের জন্য জল বিলির ব্যবস্থা করেন ; ব্রাহ্মণের উপর দেবপূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের ভার থাকে ; গুরুমশায় ছেলেমেয়েদের হাতে-খড়ি দেন ; জ্যোতিষী পাঁজি দেখে শুভ অশুভ দিন স্থির করেন, সাধারণত এই কয়েকজন কর্মচারী গ্রামের কাজ চালিয়ে যান ; তাদের সংখ্যা কোথাও বা বেশী, কোথাও বা কম। স্মরণাতীত কাল থেকে এই রকম সাদাসিদে ভাবে গ্রামের শাসন চলে এসেছে। গ্রামগুলোর চৌহদ্দি নিয়ে অদল-বদল অতি কদাচিৎ হয়েছে। আর যুদ্ধ বা দুর্ভিক্ষ বা মহামারীর আক্রমণে বিধ্বস্ত হলেও গ্রামের জীবন বিশেষ বদলায় নি। একই নাম, পরিমিতি, চিন্তাধারা, গোষ্ঠীবর্গ পর্যন্ত বহুকাল ধরে—নিরবিচ্ছিন্নভাবে রয়েছে। রাষ্ট্রের উত্থান পতন নিয়ে গ্রামবাসীরা ব্যতিব্যস্ত হয়নি ; গ্রামের অস্তিত্ব যতদিন অক্ষুণ্ণ, ততদিন রাষ্ট্রশক্তির পরিবর্তন তাদের বিচলিত করতে পারেনি, গ্রামের অন্তর্ব্যবস্থায় কোন বিকৃতি ঘটেনি। এখনও গ্রামের মোড়ল প্যাটেল ; ঝগড়া নিষ্পত্তি, সাজার ব্যবস্থা আর খাজনা আদায়ের ভার তার হাতে।"

সমাজ ব্যবস্থার এই ছোট অথচ অটল ছাঁচগুলো এখন ভেঙে গেছে বা যাচ্ছে। ইংরেজ সৈনিক আর টেক্স সংগ্রাহকের অত্যাচারের চেয়ে ভারতীয় জীবনে ইংরেজদের বাষ্পযন্ত্র আর অবাধ বাণিজ্যনীতির

(ফ্রী ট্রেড্) প্রাদুর্ভাবই এর কারণ। পল্লী সমাজে প্রত্যেক পরিবার ছিল আত্মনির্ভর, ঘরেই চরকা কাটা, কাপড় বোনা হত, বাড়ীর লোকেই স্বহস্তে চাষাবাদ করত। ইংরেজ আসার ফলে চরকা আর তাঁত বন্ধ হল, ছোট ছোট অর্ধসভ্য সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি ভেঙে গেল, আর এমন এক বিরাট সমাজবিপ্লব আরম্ভ হল যার তুলনা এশিয়ার ইতিহাসে মেলে না।

অসংখ্য নিরীহ, শ্রমশীল, কুলপতিশাসিত পল্লীসমাজ ছিন্নভিন্ন হল, প্রাচীন জীবনধারা ও জীবিকা-নির্ব্বাহের বংশ পরম্পরাগত ব্যবস্থা নষ্ট হল, যন্ত্রণার অবধি রইল না। এ ঘটনায় আমরা দুঃখ পাই নিশ্চয়, কিন্তু আমরা ভুলতে পারি না যে এই নিরীহ পল্লী সমাজগুলোই ছিল প্রাচ্য স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের যথার্থ ভিত্তি। এরা মানুষের মনকে ক্ষুদ্রতম পরিধির মধ্যে অবরুদ্ধ করে রাখত এদের শাসনে মানুষ হত নিষ্ক্রিয়, কুসংস্কার ও প্রাচীন বিধিনিষেধের দাস, নিজের মহিমা ও পৌরুষ সম্বন্ধে উদাসীন। আমরা ভুলতে পারি না যে তাদের ছিল এক প্রকার বর্বরসুলভ অহমিকা; তাদের অনুরাগ ছিল শুধু খানিকটা জমির উপর; সাম্রাজ্যের পতন, অকথ্য অত্যাচার, জনহত্যা তাদের কাছে প্রাকৃতিক ঘটনার মত লাগত, বিচলিত করত না; অথচ তাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি দিয়ে কেউ আক্রমণ করলে তারা ছিল একেবারে অসহায়। আমরা ভুলতে পারি না যে এই নিশ্চল, নিষ্ক্রিয়, নিশ্চেষ্ট, অশ্রদ্ধেয় অস্তিত্বের প্রতিক্রিয়ারূপে উৎকট, লক্ষ্যহীন অনাচারের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল, নরহত্যা পর্যন্ত হিন্দুস্থানের ধর্মানুষ্ঠানে প্রবেশ করেছিল। আমরা ভুলতে পারি না যে এই ক্ষুদ্র সমাজগুলোকে জাতিভেদ ও দাসপ্রথা কুলষিত করে রেখেছিল, সেখানে মানুষ তার পারিপার্শ্বিক প্রতিবন্ধককে পরাভূত করার চেষ্টা না করে বশ্যতা স্বীকার করত। নিয়তিতে অচঞ্চল, অন্ধ বিশ্বাস সামাজিক উদ্যোগ ও উন্নতি-প্রচেষ্টাকে নিষ্পিষ্ট করত, প্রকৃতি পূজার বিধানে মানুষের অধঃপতন সূচিত হত, আর বীরশ্রেষ্ঠ মানুষ নতজানু হয়ে হনুমান ও গোমাতার অর্চনা করত।

এ কথা সত্য যে ইংরেজ সরকার যে উদ্দেশ্য নিয়ে হিন্দুস্থানে এই

সমাজবিপ্লব ঘটিয়েছিল তা নিন্দনীয়, আর তারা প্রাচীন ব্যবস্থাকে একেবারে উচ্ছেদ করেছিল। কিন্তু সেই আলোচনা এখন অপ্রাসঙ্গিক। প্রশ্ন হচ্ছে এই : এশিয়ার সমাজ ব্যবস্থায় আমূল বিপ্লব না এলে সমগ্র মানবজাতির পক্ষে অভীষ্ট সাধন সম্ভব কিনা? যদি না হয়, তবে শত অপরাধ সত্ত্বেও সেই বিপ্লবে ইংলণ্ড অজ্ঞাতসারেই ইতিহাসের হাতিয়ার হয়ে কাজ করেছে।

তাই এই প্রাচীন সমাজধারার বিনাশদৃশ্য আমাদের যতই মনঃপীড়ার কারণ হোক্ না কেন, শুধু ইতিহাসের একটা ঘটনা হিসাবে তাকে দেখলে আমরা গ্যয়েটের কথায় বলতে পারি : "এই যে কষ্ট অমোদের কষ্টের আকাংখাকেই বাড়িয়ে চলে, তাতে কি আমাদের ক্লিষ্ট হওয়া উচিৎ? তৈমুরের শাসন কি অসংখ্য মানুষকে গ্রাস করে নি?"

দুই

ভারতে ইংরেজ আধিপত্য কেমন করে স্থাপিত হল? মোগল সম্রাটের সার্বভৌমত্ব মোগল সুবাদাররা ভেঙ্গে দিল, সুবাদারদের ক্ষমতা মারহাট্টারা নষ্ট করল, আফগানারা মারহাট্টা শক্তিকে পরাভূত করল, আর যখন সকলে সকলের সঙ্গে সংগ্রামে ব্যাপ্ত, তখন ইংরেজ জোর করে ঢুকে সকলকে পরাস্ত করল। ভারতবর্ষে ছিল হিন্দু মুসলমানের ভেদ, জাতিভেদ, বর্ণভেদ; সমাজের মধ্যে পরস্পর বিপ্রকর্ষণ ও স্বভাবজ অনাত্মীয়ভাব ব্যাপক হওয়াতে এক প্রকার ভারসাম্যের সৃষ্টি হয়েছিল, আর তাই ছিল সমাজের ভিত্তি। এরূপ দেশ ও সমাজের পরাভব কি পূর্ব্বনির্দিষ্টই ছিল না? হিন্দুস্থানের অতীত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হলেও আমরা কি স্থূল অথচ অবিবাদ্য এই কথাটি জানতাম না যে ইংরেজ ভারতের অর্থে পুষ্ট ভারতীয় সিপাহীর সাহায্যেই ভারতবর্ষকে পদানত রেখেছে? বিদেশী কবলে যাওয়া ভারতবর্ষের পক্ষে ছিল অবশ্যম্ভাবী; ভারতবর্ষের ইতিহাস হচ্ছে বারবার পরাজয়ের ইতিহাস। ভারতীয় সমাজের কোন ইতিহাস নেই—অন্তত সে ইতিহাস আমাদের অজানা। আমরা যাকে ভারতের

ইতিহাস বলি, তা হচ্ছে সদাসহিষ্ণু, সহজবাধ্য, পরিবর্তনবিমুখ সমাজের উপর বহু আক্রমণকারী যে আধিপত্য বিস্তার করেছিল, তার বর্ণনা মাত্র।

ভারতে ইংরেজের কাজ ছিল দু'রকমের—এশিয়ার সনাতন সমাজ-ব্যবস্থা ধ্বংস করা, আর সেখানে পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের ভিত্তিস্থাপন করা।

আরব, তুর্কী, তাতার, মোগল প্রভৃতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করার পর শীঘ্রই হিন্দুভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিল; ইতিহাসের ধারা অনুযায়ী বর্বর বিজেতারা সভ্য বিজিতের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছিল। ভারতবিজেতাদের মধ্যে ইংরেজই প্রথম সভ্যতায় অধিক অগ্রসর বলে হিন্দুসংস্কৃতির বশ্যতা মানেনি। বরং ইংরেজ এসে দেশের সমাজকে ভেঙেছে, শিল্পকে নির্মূল করেছে, সমাজের যা কিছু মহৎ ও শ্রেষ্ঠ ছিল তার বৈশিষ্ট্য নষ্ট করেছে। তাদের ভারত শাসনের ইতিহাসে এখনও শুধু ধ্বংসেরই বর্ণনা আছে, ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে পুনর্গঠন চেষ্টা প্রকাশ হতে পারে নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও পুনর্গঠন আরম্ভ হয়ে গেছে বলা যায়।

ভারতের পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রথম প্রয়োজন ছিল মোগল সাম্রাজ্যের চেয়ে সুদূরবিস্তারী ও সুসংহত রাষ্ট্রিক ঐক্য। ইংরেজের অস্ত্র ভারতবর্ষের উপর সে ঐক্য চাপিয়েছে, আর তা এখন বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফের কল্যাণে দৃঢ় ও স্থায়ী হবে। স্বরাজ অর্জনে আর বিদেশী আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষায় যাদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন, সেই ভারতীয় সৈন্যদলকে ইংরেজ গড়ছে, অস্ত্রশিক্ষা দিচ্ছে। যে স্বাধীন সংবাদপত্র এশিয়াতে এই প্রথম প্রবর্তিত হয়েছে আর যা এখনও প্রধানত ফিরিঙ্গীদের করায়ত্ত তা হচ্ছে জাতির পুনর্গঠনে এক অভিনব শক্তি। এশিয়ার ভূস্বত্ব সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা ছিল না, কিন্তু জমিদারী ও রায়তওয়ারী ব্যবস্থা জঘন্য হলেও ভূস্বামিত্বের দুই প্রকারভেদ তার অন্তর্ভুক্ত। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইংরেজ কর্তৃপক্ষ অল্প কয়েকজন ভারতীয়কে কলকাতায় শিক্ষা দিচ্ছে বলে ইয়োরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী আর দেশশাসন ব্যবস্থায় সুদক্ষ এক নতুন শ্রেণীর সৃষ্টি হচ্ছে।

বাষ্পযানের কল্যাণে ভারতবর্ষ ও ইয়োরোপের যোগাযোগ দ্রুত ও নিয়মিত হয়েছে, দক্ষিণ-পূর্বে বিরাট মহাসাগরের বন্দরগুলির সঙ্গে দেশের সকল প্রধান বন্দরের নিকট সম্বন্ধ ঘটেছে, ভারতবর্ষের পঙ্গুতার যে প্রধান কারণ ছিল বিদেশের সংস্রববর্জন, তা থেকে দেশ উদ্ধার পেয়েছে। এখন আর সেদিন সুদূরপরাহত নয়, যখন রেল আর জাহাজে মিলে, ভারতবর্ষ থেকে ইংলণ্ডের দূরত্ব সময়ের মাপে আটদিন মাত্র করে দেবে, আর যে দেশের অতীত গৌরবকাহিনী বিশ্ববিশ্রুত ছিল, সে দেশ পাশ্চাত্য জগতেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

ভারতবর্ষের প্রগতি সম্বন্ধে বিলাতের শাসক সম্প্রদায় এ যাবৎ বিশেষ মাথা ঘামায় নি। সেখানকার অভিজাত শ্রেণী চেয়েছিল দেশটাকে ঘটা করে জয় করতে, পুঁজিদাররা চেয়েছিল লুট করতে, আর কারখানার মালিকরা চেয়েছিল সস্তায় নিজেদের মাল বেচার সুবিধা যোগাড় করতে, কিন্তু এখন অবস্থা বদলেছে। মালিকরা বুঝছে যে তাদের নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখতে হলে ভারতবর্ষেই কিছু শিল্প উৎপাদন দরকার, আর সেজন্য দেশের মধ্যে জলসেচ ব্যবস্থা ও যাতায়াতের রাস্তা নির্মাণ একেবারেই অপরিহার্য। তাই দেখি যে তারা মোটা মুনাফা রেখে সমস্ত দেশে রেললাইন পাততে চায়, পাতবেও। এর ফল হবে একেবারে কল্পনাতীত। সকলেই জানে যে দেশের নানা উৎপন্ন দ্রব্য স্থানান্তরে পাঠানো ও বিক্রির ব্যবস্থার অভাবে ভারতবর্ষের উৎপাদনী শক্তি পঙ্গু হয়ে রয়েছে। প্রচুর শস্যোৎপাদন সত্ত্বেও নিদারুণ দৈন্য ভারতবর্ষের চেয়ে কোন দেশের বেশী নেই, আর এর একটা প্রধান কারণ হচ্ছে বিনিময়ব্যবস্থার অভাব। ১৮৪৮ সালে ইংরেজদের হাউস অফ কমন্‌সে প্রমাণ হয়েছিল যে যখন পুনায় ২ মণ ৭ সের শস্যের দাম ছিল ৬৪ থেকে ৭০ শিলিং, আর খাদ্যাভাবে রাস্তা-ঘাটে লোক মরছিল, তখন খান্দেশে ঐ ২ মণ ৭ সেরের বাজারদর ছিল ৬ থেকে ৮ শিলিং ; কিন্তু মেটে রাস্তায় চলাফেরা প্রায় অসম্ভব ছিল বলে খান্দেশ থেকে সরবরাহ আসতে পারে নি।"

রেলের প্রবর্তনে সহজে চাষের উন্নতি হতে পারে যদি যেখানে বাঁধের জন্য জমি দরকার সেখানে জলাশয়ের ব্যবস্থা করা হয় আর

বারাবর রেললাইনের পাশাপাশি সরু নালা কেটে জল নির্গমনের বন্দোবস্ত থাকে। এই উপায়ে প্রাচ্যদেশে কৃষিকর্মের পক্ষে যা একান্ত প্রয়োজন সেই জলসেচন প্রণালী বিস্তৃত হতে পারে আর জলাভাবের দরুণ প্রায়ই যে দুর্ভিক্ষ লেগে থাকে তার নিবারণ হয়। এদিক থেকে রেলপথের উপকারিতা যে কত তা আমরা বুঝি যখন দেখি যে, যে সমস্ত জেলায় জলসেচন ব্যবস্থা নেই তাদের তুলনায় যেখানে সে ব্যবস্থা আছে সেখানে খাজনা আদায় হয় তিনগুণ, ব্যবসা দশ-বারো গুণ বাড়ে আর মুনাফা থাকে বারো বা পনের গুণ।

এছাড়া রেলের দরুণ সমরবিভাগে খরচ কমবে। গড় উইলিয়মের কর্ণেল ওয়ারেণ হাউস অফ কমন্সের সিলেক্ট্ কমিটিতে বলেছিলেন —"দেশের যে সব দূর প্রান্ত থেকে খবর আসতে এখন কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহ লাগে, সেখান থেকে কয়েক ঘণ্টাতে খবর এলে কেন্দ্র থেকে সে সব জায়গায় সৈন্য, মালপত্র ও কর্তৃপক্ষের হুকুম পালনে অতি অল্প সময় লাগবে এবং তা'তে প্রভূত উপকার হবে। এখন দূরে কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় পল্টন রাখা চলে না, তখন তা চলবে; রোগের উৎপাত কমবে, বহুলোকের প্রাণ বাঁচবে। পল্টনের ভাণ্ডারে অতিরিক্ত মাল রাখার দরকার থাকবে না, জিনিসপত্র পচবে না বা আবহাওয়ার দরুণ নষ্ট হবে না। সৈনিকেরা আগের চেয়ে কর্মঠ হলে তাদের সংখ্যা সেই অনুপাতে কমানো চলবে।"

আমরা জানি যে ভারতীয় পল্লী সমাজের শাসন ব্যবস্থা নষ্ট হয়েছে, তাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি উৎপাটিত হয়েছে, কিন্তু তাদের যে বৈশিষ্ট্য ছিল একেবারে অপকৃষ্ট, এখনও তা জীবন্ত রয়েছে। সেই বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই, যে তা সমাজকে পরিবর্তন-বিমুখ অসংশ্লিষ্ট অণু-পরমাণুতে ভাগ করে দেয়। ভাল রাস্তার অভাব ভারতবর্ষের এই গ্রাম্য স্বাতন্ত্র্যের অন্যতম কারণ। আবার রাস্তার অভাবে সেই স্বাতন্ত্র্য পুরণ হয়ে এসেছে; এক গ্রামের সঙ্গে অন্য গ্রামের সংশ্রব প্রায় ছিল না, সভ্য জীবনের উপকরণ, সামাজিক উন্নতির চেষ্টা বা ইচ্ছা পর্যন্ত ছিল না। ইংরেজ গ্রামের এই স্বাভিমানী জড়তাকে ভেঙ্গে দিয়েছে, এখন রেল আসার ফলে দেশের লোকের পক্ষে স্থান থেকে স্থানান্তরে যাতায়াত

আর অপরিচিতদের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপন সহজ হবে। তা ছাড়া "রেল চলার একটা ফল এই হবে যে গ্রামে গ্রামে বিদেশী শিল্পীদের কৌশল ও উপকরণাদি সম্বন্ধে খবর ছড়িয়ে পড়বে, সে রকম উপকরণ সংগ্রহ সম্ভব হবে, যারা পুরুষানুক্রমে গ্রামের শিল্পী ছিল তাদের নৈপুণ্যের পরীক্ষা হবে, ত্রুটি সংশোধন হবে" (চ্যাপমান, "দি কট্‌ন্‌ এণ্ড্‌ কমার্স অফ্‌ ইণ্ডিয়া")। আমি জানি যে বিলাতের কারখানার মালিকরা সস্তায় তুলো ও অন্যান্য কাঁচামাল যোগাড় করার উদ্দেশ্যেই ভারতবর্ষে রেলপথ বিস্তার করতে চেয়েছে, কিন্তু যে দেশে লোহা আর কয়লার খনি আছে, সে দেশের যান ব্যবস্থায় একবার যন্ত্রের প্রবর্তন হলে সেখানে আর যন্ত্র নির্মাণকে প্রতিরোধ করা যায় না। একটা বিরাট দেশে রেলপথের শাখা-প্রশাখা বজায় রাখতে গেলে রোজকে রোজ যা দরকার, তা সরবরাহের জন্য কারখানা চাই। এর ফলে যে সব শিল্পীর সঙ্গে রেলের কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নেই, তাদের চাহিদা মেটাবার জন্য কলকব্জার প্রচলন বাড়বে। তাই রেল-পথের ব্যবস্থা সত্যই ভারতবর্ষে আধুনিক কলকারখানার অগ্রদূত হবে। যখন ইংরেজ কর্তৃপক্ষীয়রা স্বীকার করেছেন যে ভারতবাসীরা এই নতুন ধরনের কাজে নিজেদের বেশ খাপ খাইয়ে নিচ্ছে আর কলকব্জা সম্বন্ধে যা জানা দরকার তা বেশ বোঝে, তখন আর এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কলকাতার টাঁকশালে ও অন্যান্য জায়গায় ভারতীয়েরা বহু বৎসর ধরে যে নৈপুণ্য দেখিয়েছে, তা থেকে এ কথার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যাবে। ইস্‌ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একদেশদর্শিতা দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হলেও মিষ্টার ক্যাম্বেল স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে "ভারতীয় জনসাধারণের কর্মক্ষমতা বিপুল, মূলধন সঞ্চয় করার যোগ্যতা যথেষ্ট, গণিত-বিজ্ঞানে নৈপুণ্য অসমান্য", যে পুরুষানুক্রমিক কর্মভেদ ছিল জাতিভেদের ভিত্তি, রেল পথ বিস্তারের ফলে আধুনিক শিল্পের প্রবর্তন হওয়ায় তা নষ্ট হবে, ভারতের প্রগতি ও গণশক্তির পথে যে চরম অন্তরায় ছিল তা অপসৃত হবে। অবশ্য ইংরেজ বুর্জোয়াশ্রেণী যা করতে বাধ্য হতে পারে, তাতে গণসাধারণের দাসত্বমোচন বা সামাজিক অবস্থার উন্নতিও হবে না। সেজন্য শুধু

দেশের উৎপাদনী শক্তির সংবর্ধন নয়, সে শক্তিকে গণসাধারণের করায়ত্ত করা প্রয়োজন। ইংরেজ শাসনে এই উভয় ব্যবস্থার বাস্তব ভিত্তি নিশ্চয় স্থাপিত হবে। কিন্তু কোথাও কি বুর্জোয়াশ্রেণী এর বেশী কিছু করেছে? তারা কি কখনও মানুষকে রক্ত আর পঙ্কিলতা আর দুঃখ-দুর্দশার মধ্য দিয়ে না টেনে সমাজের উন্নতি সাধন করতে পেরেছে?

যতদিন বিলাতের শ্রমিকরা শাসকশ্রেণীকে নিষ্কাসিত না করে, কিম্বা ভারতীয় জনসাধারণ আত্মশক্তিবলে ইংরেজের শাসনশৃঙ্খল চূর্ণ না করে, ততদিন ইংরেজ বুর্জোয়ারা ভারতবর্ষের সমাজক্ষেত্রে যে যে নতুন বীজ বপন করেছে তার ফল ভারতবাসী পাবে না। তবু আমরা নিশ্চিন্ত মনে সেদিনের প্রতীক্ষা করতে পারি যখন শীঘ্রই হোক্ বা বিলম্বেই হোক্, সেই বিশাল চিত্তাকর্ষক দেশের পুনর্জীবন আসবে, যে দেশের শান্ত অধিবাসীরা প্রিন্স সল্‌টিকভের ভাষায় "ইতালিয়ানদের চেয়ে মার্জিত ও নিপুণ," যারা বশ্যতা স্বীকার করলেও নিজেদের সৌম্য আভিজাত্য হারায় নি, যারা স্বাভাবিক শৈথিল্য সত্বেও যুদ্ধে অসাধারণ বীর্য দেখিয়ে ইংরেজ নায়কদের আশ্চর্য করেছে, যাদের দেশ হচ্ছে আমাদের ভাষা, আমাদের ধর্মের উৎস, যাদের জাঠদের মধ্যে প্রাচীন জার্মাণ ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রাচীন গ্রীকের মূর্তি আমরা দেখতে পাই।"

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই আলোচনার উপসংহারে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই।

বুর্জোয়া সভ্যতার যে নিগূঢ় কাপট্য ও স্বভাবজ বর্বরতা স্বদেশে ভদ্রবেশ ধারণের চেষ্টা করে, বিদেশে আধিপত্য বিস্তারের সময় তা আমাদের চোখের সামনে নগ্ন, অনাবৃতরূপে দেখা দেয়। বুর্জোয়াশ্রেণী হচ্ছে ব্যক্তিস্বত্বের সংরক্ষক; কিন্তু বাংলা, মাদ্রাজ আর বোম্বাইয়ে ভূ-সম্পত্তি নিয়ে তারা যে বিপ্লব ঘটিয়েছে, সে রকম কি কোন বিপ্লবী দেশ পেরেছে? ভারতবর্ষে তাদের দৌরাত্ম্য যখন শুধু ঘুষে সন্তুষ্ট হয় নি, তখন কি তস্কর চূড়ামণি ক্লাইভের ভাষাতেই, তারা নিদারুণ অত্যাচার আরম্ভ করে নি; যখন ইয়োরোপে তারা সরকারী দেনার

(National debt) অলঙ্ঘ্য পবিত্রতা সম্বন্ধে শতমুখ, তখন তারাই কি ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভাণ্ডারে ভারতীয় রাজাদের গচ্ছিত টাকা বাজেয়াপ্ত করে নি? "আমাদের পূত ধর্মের" সংরক্ষণের অজুহাতে যখন তারা ফরাসী বিপ্লবীদের সঙ্গে সংগ্রাম করছিল, এখন কি তারাই ভারতবর্ষে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার বন্ধ করে নি, উড়িষ্যা আর বাংলার নানা মন্দিরে যাত্রীদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের ব্যবসা ফাঁদে নি? জগন্নাথ মন্দিরে ভ্রষ্টাচারের সুবিধা নিয়ে লাভের চেষ্টা দেখে নি? এরাই হচ্ছে "স্বত্ব, সমাজশৃঙ্খলা, পারিবারিক শুচিতা ও ধর্মের" অভিভাবক!

ভারতবর্ষ প্রায় ইয়োরোপের মত বিশাল। সেখানে বিলাতী শিল্পব্যবস্থার দারুণ ফল প্রত্যক্ষ করে আমরা বিক্ষুব্ধ হই। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে ঐ ফলাফল হচ্ছে বর্তমান উৎপাদন পদ্ধতির অচ্ছেদ্য পরিণাম। পুঁজিদারদের আধিপত্যের উপর সে পদ্ধতি নির্ভর করছে। মূলধনকে স্বতন্ত্র শক্তিরূপে রাখতে হলে তাকে কেন্দ্রস্থ করা প্রয়োজন। সভ্যজগতের প্রতি শহরে আর্থনীতিক বিধি অনুসারে শিল্প বাণিজ্য চলেছে; সেই বিধি সমস্ত পৃথিবী দখল করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হলে তার সংহারমূর্তি আমাদের চোখে পড়ে। কিন্তু ইতিহাসের এই বুর্জোয়াযুগে নতুন জীবনের বনিয়াদ পাতা হবে—একদিকে পরস্পরনির্ভরতা ও যাতায়াতের সুবিধার দরুণ নানা জাতির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন, আর একদিকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রকৃতির প্রতিরোধ দূর করে উৎপাদনীশক্তি বর্ধন। ভূ-গর্ভীয় বিপ্লব যেমন পৃথিবীর বহিরাকারকে সৃষ্টি করেছে, তেমনি বুর্জোয়া শিল্প-বাণিজ্য নতুন সমাজের বাস্তব ভিত্তি স্থাপন করবে। যখন এক বিরাট সমাজ বিপ্লব বুর্জোয়াযুগের ফলাফলকে, শিল্পবাণিজ্যের আধুনিক ব্যবস্থাকে পৃথিবীর জনসাধারণের করায়ত্ত করবে, তখন যে হিন্দুদেবতা নিহতের খর্পর বিনা সুধাপানেও অস্বীকৃত হত, তার সঙ্গে মানব-সভ্যতার সাদৃশ্য দূর হবে।